

কলকাতা

দুর্গা



অর্থনীতিতে এবারের নোবেল বিজয়ী
অমর্ত্য সেনকে নিয়ে
পুরস্কার অমর্ত্য সেন বিশেষ সংখ্যা
প্রকাশিত হচ্ছে



তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
কলকাতা পৌরসভা

সম্পাদকীয়

এ বছর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্থশততম
জন্মবার্ষিকী। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঊষা যশে
আত্মীয়তাবাদের উদ্বেগ তাঁর হাতেই ঝটোছে। যদিও
অনেক বছরের শিকার হয়েছেন তবু ক্ষুদ্রভার, ধীনভার
উর্ধে উঠে তিনি দেশসেবাকেই তাঁর জীবনের চরম
লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

স্বায়ত্তশাসিত কলকাতার মূল কাঠামোর পত্তন
সুরেন্দ্রনাথের হাতেই ঝটোছিল। সেই সুরেন্দ্রনাথকে
আরো ব্যাপকভাবে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করতে ও
নতুনভাবে বুকের আবোন্তে হৃদয়ান করার লক্ষ্যে,
এবং একইসঙ্গে আমাদের শৌরসংহার তাঁর সুদীর্ঘ ও
নিবিড় বোসের কথা স্মরণ রেখে আমরা এবারের
সংখ্যাটি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা হিসেবে
প্রকাশ করছি।

এই সংখ্যার প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি আমাদের
ইতিহাস চেতনার যদি নতুন কোনও সুর বোস করে
তবে জীবন আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে।

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

জন্ম : ১০.১১.১৮৪৮ বুরা : ৬.৮.১৯২৬

তারলতা কলকাতা। পিতা ব্যাভাননা জন্মের দুর্গাচরণ।
ডক্টর কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করে বিলাত যাত্রা
করেন। তাঁর সঙ্গী ছিলেন বিহারীলাল গুপ্ত ও
হেমচন্দ্র বসু। তাঁরা তিনজনেই আই সি.এস পরীক্ষার
(১৮৬৯) পাশ করেন। কিন্তু প্রকৃত বরস নিয়ে বোলবোল দেখা
দেওয়ার সুরেন্দ্রনাথকে আটকে দেওয়া হয়। তিনি আমলজের
জাদুয় বেন এবং আদাসজের নির্দেশে পরীক্ষার্থীরাই বলে
প্রাসিকাত্তর হন। ১৮৭১ খ্রি. তিনি আই সি.এস হতে ফেলে
কেনেন এবং গ্রীষ্মক অ্যাপিন্টমেন্ট প্রাপ্তি হন। কিন্তু
একজন আসামীকে ফেরারী প্রাসিকাত্তর করার ট্রাট দেখিয়ে
তাকে ১৮৭০ খ্রি. পদদ্বার করা হয়। সম্ভবত এই পদদ্বার
কল্যাণ বসেই ঘটছিল। ১৮৭৬ খ্রি. বিদ্যালয়ের প্রধানর তাঁকে
মেট্রোপলিটান স্কুলে ইংরেজি অধ্যাপকের পদে নিয়োগ
করেন। এখানে থেকে সিটি কলেজ ও গ্রী চার্চ কলেজে অধ্যাপনা
করার পর ১৮৮২ খ্রি. তিনি নিজ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা
শুরু করেন। এই বিদ্যালয়টি পরে সিন্ধ কলেজ (বর্তমান
সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) নামে খ্যাত হয়। সুরেন্দ্রনাথ ব্যালার
নিবেদনাত্মিক ও আবেগ-নিবেদনমূলক রচনীতির একজন
প্রধান পুরোধা। ১৮৭৬-৯১ খ্রি. পর্যন্ত কলকাতা কংগ্রেসবনের
সদস্য, ১৮৮৫ খ্রি. থেকে উত্তর ব্যারাকপুর ডিসট্রিক্টালিটির
সেয়ারম্যান এবং পর পর ১ বছর (১৮৯৩-১৯০১) বর্ষীয়
ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। ১৯০৩ খ্রি. কের্ণী শাসন
পরিষদের সদস্য হন। ১৯২০ খ্রি. মজায়েট রান্ননীতিক
সুরেন্দ্রনাথ করাক্য দলের প্রার্থী (ডা. বিধানচন্দ্র রায়) কাছে
নির্বাচনে পরাজিত হন ও রান্ননীতি থেকে অবসর নেন। ১৮৭৬
খ্রি. আনন্দমোহন বসু প্রতিষ্ঠিত স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনে তিনি
বক্তৃতা করতেন। 'The Life of Mazzini', 'The Rise of
the Sikh Power in the Punjab', 'Indian Unity',
'Study of History', 'High English Education' ইত্যাদি
বিষয়ে তাঁর সে-সময়ের বক্তৃতা উল্লেখযোগ্য। 'মাসিনী'র
প্রার্থী ব্যাখ্যার সময়ে তিনি বৈপ্লবিক পন্থার পরিবাতে
নিরন্তরিত্ব পন্থা গ্রহণের জন্য বলতেন। তিনি বক্তৃতার
লোভাধে মনোহর করে রাখতেন। রান্ননীতিকেরে তাঁর প্রথম
আবেদন সিডলি সার্ভিস পরীক্ষার ছাত্রের বংশীয়া বাক্যে।
লর্ড লিটনের সংবাদপত্র-সংক্রান্ত আইনের বিরুদ্ধেও তিনি
আবেদন করেন। সাংবাদিকতায় প্রথমে 'হিন্দু প্রায়টিউ'
পত্রিকার সাংবাদিকতার কল্য করেন। ১৮৭৯ খ্রি. 'ফেলী'
পত্রিকার প্রাসিকাবা নিয়ে সম্পাদনা শুরু করেন। এই পত্রিকার
১৮৮০ খ্রি. এক প্রবন্ধে আমলজ অবধাননার জন্য তাঁর

কল্যাণ হয়। ১৮৮৫ খ্রি. ভারতের জাতীয়
কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্যোগী সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের পুন
অধিবেশনে (১৯০২) সভাপতিত্ব করেন। ১৮৭৬ খ্রি.
আনন্দমোহন বসুর সঙ্গে 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা
করেন। এই প্রতিষ্ঠানই কংগ্রেসের পূর্বসূরী। একটি ভারতীয়
প্রতিনিধিদলক সরকার গঠনের জন্য ১৮৯০ খ্রি. জাতীয়
কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিলাতে প্রতিনিধি দল প্রেরিত হয়। এই
দলে সুরেন্দ্রনাথ অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন। ইংরেজী ভাষার
একজন প্রসিদ্ধ বক্তারূপে তিনি সেখানে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৯৭
খ্রি. এডেলবী কথিগনে শাস্ত্র বিতে বিলাত যান। বক্তৃতার
বোধের জন্য তাঁরই নেতৃত্বে তুঙ্গল আন্দোলন সূচী হয় (১৯০৫)
এবং শেষেরূপে নেতাজীরা তিনি প্রকৃত খ্যাতি অর্জন করেন।
এই উপলক্ষে তাঁর নামের সঙ্গে যিগিয়ে তাঁকে 'সারেরভার-নট'
সুরেন্দ্রনাথ' বলা হয়। ১৯০৬ খ্রি. বহির্দেশে রাষ্ট্রীয় সমিতির
অধিবেশনে যোগ দিয়ে শেতাখান্দা পরিচালনার অভিযোগে
সুরেন্দ্রনাথ ব্রেন্ডার ও অর্থাগ্রেপ্তারিত হন। ১৯০৯ খ্রি. পুনরায়
সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরূপে ইংল্যান্ডে গ্রেস সম্মেলনে যোগ
দেন। ১৯১২ খ্রি. বক্তৃতার বোধ হওয়ায় (অবশ্য বসের কিছু
অংশ আসন্ন ও বিচারে দৃঢ় হয়) তিনি Settled Fact-কে
Unsettled করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। তিনি ব্রজবরই
নিচোখীন আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর পঞ্চাল বহুরের
রান্ননৈতিক জীবনে ব্রিটিশ ন্যায়বিচারে আস্থা-কলনও পিছিল
হয়নি। তাঁর লর্ড কার্জনের সঙ্গে বিরোধ কললেও নিজ প্রতিষ্ঠিত
কলেজের নাম পরবর্তী এক লাট সাহেব রিপনের নামেই
রাখেন। তিনি মজায়েট রান্ননীতি ভাণ করে গুণের সঙ্গে
অগ্রসর হতে পারেননি বলেই শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাক্য দলের
ডল সদস্যের কাছে পরাজিত হতে হয়েছিল। রাষ্ট্রীয়
অলংকার অর্জোদনের পক্ষে কংগ্রেস যখন অগ্রসর হয় তখন
তিনি ইংরেজ-প্রবর্তিত শাসন-সংক্রান্ত সমর্থন এবং গ্রহণ গ্রহণ
করে (১৯২১), অনেকের নিন্দাত্মক হন। ইংরেজ সরকারের
'সার' উপাধি তিনি গ্রহণ করেন। ভারত ও ইংল্যান্ডের আর্থিক
সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য আত্ম কথিগনে তিনি আয়ত্বিত
প্রতিনিধিরূপে যোগ দিয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার অনেক
আগেই কংগ্রেসের বা স্বাধীনতার বিতাগে ছিলেন (১৯২১)।
কর্তৃক প্রতিষ্ঠার জন্য তিনিই প্রধান উদ্যোগী ছিলেন (১৯২১)।
সুরেন্দ্রনাথের প্রত্যবেই ব্যালার জাতীয় অবধাননার বিরুদ্ধে
সর্বভারতীয় এক প্রতিকা সম্ভব হয়। তাঁর রচিত 'A Nation in
Making' গ্রন্থটি ভারতীয় রান্ননীতির ইতিহাসের একটি মূল্যবান
দলিল।

ব্যারাকপুরের ঋষি

মহাত্মা গান্ধী

ব্যারাকপুরে স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির বাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমি শুনেছিলাম, উনি অসুস্থ এবং বার্ধক্য তাঁর ইম্পাত কঠিন চেহারায় ছাপ ফেলেছে। সেইজন্য আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম এবং শ্রদ্ধা জানানোর জন্য আগ্রহী ছিলাম। যদিও তিনি আমার কিছু কিছু কার্যকলাপ সমর্থন করেননি তবু নতুন বাংলার রূপকার এবং ভারতীয় স্বাধীনতাতে বাগ্মিতা ও পাণ্ডিত্যের জন্য ভারতীয় 'নেস্টার' হিসেবে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্র কমেনি। আমার সেই সমর্থকার কথা মনে আছে যখন শিক্ষিত ভারতবর্ষ তাঁর মুখে ভাষা পেতে। সেইজন্য ব্যারাকপুরের তীর্থদর্শনের জন্য আমি আনন্দের সঙ্গেই রওনা হলাম। স্যার সুরেন্দ্র-র গন্ধার তীরের বাড়িটা বিশাল এবং চারিদিকে সুন্দর পরিবেশ। বাড়িটির চারিপাশে শাদা, কোলাহল শূন্য। এই সুন্দর পরিবেশ দেখলে যে কেউ সহজেই বুঝতে পারবেন প্রত্যেক দিন ডিঙের কলকাতায় দিনভোর পরিভ্রমের পর কেন তিনি এখানে ফিরে আসতেন এবং কি পরিমাণ পরিতৃপ্তি লাভ করতেন। আমি ভেবেছিলাম উনি অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন এবং চারিদিকে ঘড়-আর্তি হচ্ছে। উল্টে দেখলাম, আমাকে দেখে একজন মেরুদণ্ড সোজা মানুষ তাঁর আসন ছেড়ে উঠে আমায় আন্তরিকতার সঙ্গে আপ্যায়ন করলেন। তিনি আমার সঙ্গে উত্তরণের মত প্রাণোচ্ছলভাবে কথা বলতে লাগলেন। আমার সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন যে তাঁর স্মৃতি এখনও সবুজই আছে। তাঁর ছোটবেলার ছবি যে এখনও তাঁর মনে স্পষ্ট হয়ে আছে সেকথাও বললেন। এই সময়ে সদ্য তাঁর স্মৃতিকথা বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই বইটা তিনি গত ৯ বছর ধরে লিখেছেন। তিনি আমার গর্বের সঙ্গে সমস্ত পাণ্ডুলিপিটির প্রতিটি পাতা দেখালেন। পরিত্যক্ত বসিষ্ঠ অকম্পিত হাতের লেখায় স্রীতিবদ্ধভাবে পাণ্ডুলিপিটি তৈরি হয়েছে। স্যার সুরেন্দ্রনাথের বর্তমানে বয়স ৭৭ বছর। কিন্তু তাঁর অনেকটা পণ্ডিত মালব্যক্তির মত আত্মবিশ্বাস আছে। তিনি বলেছিলেন, আমি ৯১ বছর পর্যন্ত বাঁচব এবং আশা করি তখনও বর্তমান সময়ের মতই কর্মোদ্যম বজায় রাখতে পারব। আমি যখন তাঁকে প্রশ্ন করলাম, বর্তমানে কি বিষয়ে পড়াশোনা করছেন তিনি উত্তরে বললেন, তাঁর স্মৃতিকথাটির এক বছরের মতোই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হবে, তিনি এখন সমস্ত বইটা ঠিক করার কাজ করছেন। চারপাশের সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে তাঁর প্রাণবন্ত কৌতুহল ছিল। তিনি আমার কাছ থেকে কথা আদায় করে নিলেন যে বাংলা থেকে ফিরে যাবার আগে আরও একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করব। তিনি বললেন, যদি আপনি ব্যারাকপুরে আসার সময় না পান, আমিই আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাব। আমি বললাম, আপনাকে কষ্ট দেব না, আমি অবশ্যই সময় করে আসব। স্যার সুরেন্দ্রনাথের প্রাণশক্তির উৎস ছিল তাঁর নিয়মিত অভ্যাসের প্রতি অবিচল ধাকা। কোন কিছুই তাঁকে কলকাতায় রাত কাটাতে বাধ্য করতে পারত না। আমি বলতে পারি, তিনি কখনই ব্যারাকপুরে আসার শেষ রেলগাড়ি ধরতে বাধ্য হননি। এই নিয়মানুবর্তিতা, তিনি ছয়ত বলছেন, ভারতবর্ষ-সেবা'র মত পরিশ্রমসাহ্য কাজে খুবই প্রয়োজনীয়।

[৫৭ উত্তর, ১৪ মে, ১৯২৫, পৃ. ১০১-১০]

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি : মুকুটহীন রাজা

দ্বীরেন মুখোপাধ্যায়

আমার সপ্নেই হয়, আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে আমরা কি সচেতন? কারণ তথ্য সংগ্রহ আজও খুব সুস্পষ্ট নয়। সেইজন্যই বোধহয় সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মত একজন মানুষকে আমরা প্রায় ভুলে গিয়েছি। এ বছর তাঁর সার্বশত জন্মবার্ষিকী। বৈষ্ণবোৎসবের আগে জন্ম নেওয়া এই মহাপুরুষকে আজ বেশজুড়ে স্মরণ করা প্রয়োজন। অশেষী যুগে তাঁকে বাংলার মুকুটহীন নরপতি বলা হত। কিন্তু এখানেও দেখছি সুরেন্দ্রনাথকে স্মরণ করার বিষয়ে অলীচতা, আগ্রহের অভাব। হয়তো এর শিথিলের কারণ হিসেবে বলা যায় উপযুক্ত তথ্য আমাদের জানা নেই বা স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস জানার উৎসুকা আমাদের সেই পরিমাণে নেই। বর্তমানে আমাদের রাজনীতিতে শুধুমাত্র দুর্নীতি, বৈকল্য আসেনি, সঙ্গে এসেছে চোঁটনার অভাব। অতীতের জ্ঞান আহরণ করেই সমাজ পরিবর্তনের পট্টা অর্জন করা যায়। এই আগ্রহী ক্রমশ কমে আসছে।

টাইন হলে সুরেন্দ্রনাথের সার্বশত জন্মদিবসে আজকে এই আলোচনা সভা। প্রথমেই বলি, এই সভাপূহ যখন নির্মিত হয়েছিল তখন আমাদের মতো কিছু লোক এখানে যন্ত্রের সাহায্যে বক্তৃতা করবেন সেটা তাদের কল্পনায় ছিল না। এই সভাপূহ প্রকৃতপক্ষে যোগ্য ছিল সুরেন্দ্রনাথের মতো কৃষ্ণকটুসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য। আমিও এখানে ১৯৪১ সালে নভেম্বর মাসে বক্তৃতার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু এ সভাপূহ আমাদের মতো নিষ্কণ্ঠ মানুষদের জন্য নয়। তাঁদের জন্য, যাঁদের বলা চলে যাবে একেবারে যোগজনের পর যোজন পর্যন্ত। সে দুইই চলে গেছে। সেই যুগকে ফিরে পাবার কোনও আশা নেই। সুরেন্দ্রনাথকে এখানে কোনও সভায় বলতে আমি সন্দিগ্ধ। ইন্সটিটিউটটি ইনসিটিউটে এক সভায় তাঁর বক্তৃতা আমি শুনেছি। অল্প স্বল্প সেটা আমার স্মরণে আছে।

আমার পিতা তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। বিশেষ করে বেঙ্গলি সংবাদপত্র পরিচালনায়। তখন বেঙ্গলির অফিস ছিল, এখন দেখানো বসুমতী তার ঠিক সামনে একটা তিনতলা বাড়িতে। সুরেন কীভাবেই বাইরে গিয়েছিল সেটা কবু লিখতে উঠে যাবেন—সেটা আমি ছোটবেলায় বলিডিয়ে দেখেছি। অন্য



অনেক সুবাদেও সামান্য হলেও তাঁর সংস্পর্শে আসতে পেরেছি। কিন্তু সেইজন্য তাঁকে স্মরণ করছি না, স্মরণ করছি তারতর্ক্যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে তাঁর অবদানের জন্য। সংগ্রাম বলতে লজ্জা করে। কারণ আমাদের এই সংগ্রাম তো প্রকৃতপক্ষে সফল হয়নি, সার্থক হয়নি। আমাদের স্বাধীনতা আজও পর্যন্ত ব্যাক্তবে পরিণত হয়নি। সুরেন্দ্রনাথ তদানীন্তনকালের সংগ্রামের সঙ্গে সংগতি বেধে যেন শুষ্ক জনপথে বেশজোলের বন্যা প্রবাহিত করার কাজে নেমেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল অশূর বাঘীরা। এই জন্যই তাঁকে আমরা স্মরণ করি। স্মরণ করি আমাদের দেশের স্বাধীনতার একজন পথিকৃৎ হিসেবে। স্বাধীন স্বাচল্যপান বিধবে কলকাতা কংগ্রেসের সংকল্প যে আইন—সেটা তাঁর অনেক কীর্তির মধ্যে একটা প্রধান কীর্তি।

অনেকে মনে করতেন পাণ্ডেন সুব্রেন বাঁহুয়াব মত লোককে শ্রমণ করা আচ্ছন্ন অবাঞ্ছিত। আচ্ছন্ন বাচ্ছনীতি এখানে চলেছে এমনভাবে যে, তিনি যে ধর্মের বাচ্ছনীতি করেছিলেন সেটাকে শ্রমণ করে তাঁকে অভিবাদন করা সম্ভব নয়। এটা সত্য। কিন্তু তাঁরা যে বাচ্ছনীতি করেছিলেন ১০০ বছর আগে কয়েক খোঁজানো সুব্রেননাথের একটা বড় ভূমিকা ছিল। তাই তাঁকে দেশপুঞ্জা সুব্রেননাথ, বাইগুজ সুব্রেননাথ, Father of Indian Nationalism বলেও ডাকা হয়।

বামোদন বাঘ থেকে আকৃষ্ট হয়ে যে পরম্পরায় ঘড়া দিয়ে চলে এসেছেন বাঁবা, তাঁদের সঙ্গে সুব্রেননাথের নামও একসঙ্গে উজ্জয়িত হয়েছিল। তাঁর বাচ্ছনীতি অনেক সময় ছিল ভিত্তিহীন শ্রীতি—সে বিষয়ে কোনও সম্ভেদ নেই। বহীশ্রমণ কিশোর বয়সে শুরু হয়ে বলেছিলেন, আবেশন-নিবেশনের বাসা বহির্ষ যে মত দিবে। ইংরেজের কাছে দরখাস্ত করে তিনি আবেশন ও নিবেশনের বাচ্ছনীতি করেছিলেন নিশ্চয়ই। কিন্তু তাঁকে অবাঞ্ছিত বসি কেমন করে। কারণ তাঁর সমগ্র ইটালিও জাতীয় নতবা, জার্মানির জাতীয় নতবা তখনও পর্যন্ত পবিত্রপুত্রকে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বলা যেতে পারে, জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস বহির্ষিহীন পর্যন্ত তখনও আরম্ভ হয়নি। সুতরাং ভারতবর্ষের মত একটা স্বাধীনতার দেশে, ইংরেজ শাসনের ন্যায়ের বিরুদ্ধে যে লড়াই তাঁরা করেছেন তার চেহারা অন্যাক্ষ্য হতে বাধ্য। আচ্ছন্ন জোব দিয়ে দেখে যদি শুধুমাত্র নিশাধি কবি ত্যাগের তুল্য হবে। ইতিহাসের কবির কাছে সেই ধর্মের নিশা করতে বাধ্য না। আমরাও কি শেখি? আমরা কি ভিত্তি করে বাচ্ছনীতি অর্জন করিনি? প্রকৃত সত্যায় কবলে হতেও বেশ জাগ হত না। আমরাও এখন পানিনি তখন সুব্রেন বাঁহুয়া আমাদেব থেকে ভাল কাগজার জাচ্ছেন। করেননি—এই কথা বলে তাঁকে নিশা করার প্রবৃত্তি ঘেমে আমাদেব না হয়। আমরা শ্রমণ করবো সেইসব দিনের কথা। এই সত্যকেই কংগ্রেসের ৩য় অধিবেশন করেছে। ১৮৮৬ সাল। সভাপতি শামাভাই মৌর্যি, অধ্যক্ষনা সমিতির সভাপতি মহাপতিত রাজা রাজেন্দ্রলাল বিন্দ্র। কিশোর বহীশ্রমণের বয়স তখন পঁচিশ। তিনি সভার এসে গাইলেন বাচ্ছপ্রসঙ্গী সূত্র লেখা গান—আমরা হিন্দুধর্ম আর ধাতের ভয়ে। সুব্রেননাথ বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক বসেছিলেন—শোনা যাচ্ছে, দুর্দাসিয়া কংগ্রেসে যোগ দেননি। কবীটা ঠিক নয়, এই অবিশেষণেই একশোজন দুর্দাসিও বন্দোপাধ্যায়ের রয়েছে। তিনি তখন একথা বলতে শেখিয়েছিলেন। কারণ তিনি “সারোভার—নট” বা মাথা নত করবেন না এটাই ধ্যাননা ছিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এখন তিনি যখনও করলেন, হতী হলেন, তখন তাঁকে অনেক রাসাখালি, নিশা তখনও হল। তিনি কর্পণাত করেননি। ঐ হতী অবস্থায় পান করছেন ক্যালকাটা থিওলিসিগ্যাল স্কুল। তিনি দেখিয়েছেন প্রকৃত

স্বাধীনতার কাকে বলে। এখন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস হলেন মেঘর, সুবাবী হলেন তেজপতি মেঘর। সুভাষচন্দ্র বসু, তাঁকে করা হলো চীক এম্বিকিউটি অফিসার। তিনি যে আই সি এস পবিত্রায়ণ করেছিলেন সেই আই সি এস এ তাঁর চাইতেও দল বহুতরব সিনিয়র এডার্সন বলে একজন ইংরেজ তাঁর নিচে কাজ করতেন। দেশবন্ধু আবদুল বসিফ খান বলে মোদাখালিও একজন কংগ্রেস নেতাকে তেজপতি চীক এম্বিকিউটিও এফিসার হিসেবে বসিয়েছিলেন। এইসব ঘটনা তখন হতেও শেখিয়েছিল সুব্রেননাথ যে আইন করেছিলেন তাঁর জন্য।

সুব্রেননাথ অনেকদিন আগে থেকে ১৮৭৬ সালে থেকে সারা ভারতবর্ষ চরে বেড়িয়েছেন, তখন আমাদেবের বাচ্ছনীতি অত্যন্ত মনোনির্ভর করেই অর্থাৎ ইংরেজ জাতির ধর্মোই নিষেধ। ইংরেজিতে অসুস্থ বয়স যে তিনি ছিলেন তাতে কোন সম্ভেদ নেই। কলকাতা থেকে পেশোয়ার এবং ওই বিকে মাত্রাক থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ভারতবর্ষ বকুতা করে তিনি প্রকৃতপক্ষে সে দিনের যে বাচ্ছনীতি তাঁকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন।

মত বিনন, তিনি ছিলেন কিছু পবিত্রায়ণ ভারতপ্রেমী। সেইজন্য সাদেহবা তাঁকে জাহাজে করে সেলে কবিবিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। আমানারা দেশেরে আগেকার দিনে বকুলাটনের বড় বড় স্টাফু আছে, শুধু বিশপের মননা স্টাফু। বিশপের প্রতি তত্তিতে সুব্রেননাথ তাঁর নামে কলেক্ট হালন করেছিলেন এবং সেখানে পড়ালেন। ইতিহাস পড়ালেন ইংরেজিতে। তাঁর বিভিন্ন বকুতা দেখে মাঝে তিনি দেশের লোককে কানারনে জাতীয়তাবাদ, ব্যারিবন্ডী, মাংসিনীনের কথা। বরষের কাগজ বার করলেন দেখলি। সাহেব কাজ নরিস, সে দুকুয় দিল একটা মামলায় যে, হিন্দুধর্মের শাসনায় নিলাব কথা তোলা হচ্ছে। শাসনায় নিলাকে নিয়ে এসো, সাত্তী হিসেবে আমবা কেটে। গরুণ করে উঠলেন সুব্রেননাথ বেঙ্গলি কাগজে—‘এটা কি? হাইকোর্টের কাজ বলে কি তিনি বা খুলি তাই বলবেন?’ আমলত অধ্যয়নায় যায়ে সুব্রেননাথের তিন মামলার জেল হলো। সেই ঘটনের বিরুদ্ধে আমলতে নিড়েছিলেন দুকক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ডেবে দেখুন, সুব্রেননাথের ঘড়া একজন মানুষের তিন মামলার জেল, বাচ্ছবংশীয় হোসে, সারা দেশের পুঞ্জীয় লোক। তখনকার দিনে জেলে যাওয়া সহজ ছিল না।

তিনি জেলে গেলেন এবং চেষ্টা করলেন সারা ভারতবর্ষকে একত্র করার। তখন ইতিহাস লিখ হয়েছিল। উনি ইতিহাস জায়েসিবেশন করেছিলেন। আমদায়োদন বাসুও সঙ্গে গিলে ১৮৭৬ সালে। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হল বোম্বাইয়ে, যেখানে হট্টাক, কলকাতা। তাঁরা সুব্রেন বাঁহুয়াকে ডেমন পাঠা দেননি। এবান থেকে বেছলেন কর্পুখারী দেবী, বাবী মানসিনীয়া বোখাল এবং কমতায়ান মেতা উমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, বলতেন বোনারি, উনি সাহেব। সুব্রেন

বাঁহুথাকে তারা জেঁকেনি। সুবেন্দ্রনাথের ঘন ঘনি ছোট হাত, তা হলে বাংলাতে একটা পারা ফেঁচা চক্কড়েন, উনি সেটা কমলেন না। ১৮৮৫-র আগে ইন্ডিয়ান লিগের অন্যতম নেতা হয়েছি। কিন্তু উনি কংগ্রেসের সঙ্গে ছিলেন ওর কংগ্রেসের অধিবেশন এখানে কমলেন, তখনও উনি কংগ্রেসে একমণ্ডিত হয়েছেন, বুঝার সভাপতি হয়েছেন, ইচ্ছে করলে আরও হতে পারতেন।

দ্বন্দ্বীয়ার সময়ে বাংলা যখন বর্জন করে উঠেছিল, মোশালকুম গোখলের মত মানুষ, তিনি সভাপতি হিসেবে বক্তৃতা করে গেছেন বলেছিলেন, *My lord, Bengal is glowing in arrogance, please answer*। তখন বাংলা ছিল ভারতবর্ষের অগ্রদূত। দ্বন্দ্বী আন্দোলন—আমাদের জাতীয় আন্দোলনের প্রথম পরিচ্ছেদ। সেই দ্বন্দ্বী আন্দোলনে তিনি ছিলেন বাংলার মুকুটমীন রাজা, শুধু বাংলা নয় ভারতবর্ষের মুকুটমীন রাজা। ১৯০৫ বাংলা প্রাদেশিক সম্মেলন হচ্ছে বহির্দেশে। সেখানে সভাপতিত্ব করছেন সুবেন্দ্রনাথ, যেমন কুপেন্দ্রনাথ বসু। এরা সবাই, সে সুদের বিচারে কংগ্রেসের নরমণ্টী। কিন্তু সেখানে বম্বে মাত্রম উচ্চারণ করা যাচ্ছে না এই ছিল সরকারি নির্দেশ। তা অব্যাহত করে যে মিছিল হয়েছিল তার ওপর পুলিশী আক্রমণ করেছিল ব্রিটিশ সরকার। যাতে মনোরঞ্জন গুহাচর্য্য, চিত্তরঞ্জন গুহাচর্য্যতা আহত হয়েছিলেন। তখন কুপেন্দ্রনাথ বসু মত নরমণ্টী নেতা পর্যন্ত বলেছিলেন—*This is the beginning of the end of the British rule.*

আমি যেসেই সুবেন্দ্রনাথের বক্তৃতা থেকে মনে হয়েছি, ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে তাঁর ছিল অসন্তুষ্ট মাত্রা। তিনি বলতেন, ইংরেজ আমাদের আন্তে আন্তে স্বাধীন করে দেবে। ওই কিভাবে কিভাবে এক একটা শাসন সংস্কার করবে আর তারপরে আমরা ইচ্ছা একদিন জেগে উঠে ফেঁচা, আমরা স্বাধীন হয়ে পেরি। প্রায় তাই হয়েছে, আমাদের দেশের লোক যখনই মুক্ত হয়েছে, লক্ষ লক্ষ গ্রাম থেকে দালা-হামায়া। কিন্তু প্রকৃত রাজনৈতিক বিপ্লব ঘনি ঘটতো তা হলে আমরা শোভাযাত্রা যে অভিশাপ, সেই অভিশাপেরই যে কলকল তার যখনই বুঝতে হত না। কিন্তু তার জন্য সুবেন্দ্রনাথকে দায়ী করে লাভ নেই, শেষ আমাদের। আমরা তখন এভাবে এসে দেশের প্রকৃত কিছু সমস্যার সমাধান করতে পারিনি। সুবেন্দ্রনাথের কাছে যে সব সমস্যার সমাধান করে দিয়ে গিয়েছিলেন, তাও নয়। তাঁর মধ্যে একটা ডেজেন্ডা ছিল, সেটা সে সুবেন্দ্রনাথকে আমাদের কাছে পরম আনন্দীয়, পরম দ্বন্দ্বী এ বিষয়ে কোন সমস্যা নেই। আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি তাঁর মনে কোন পরজাতি ছিল না। কোনও মানুষ নির্মূল মানুষ হন না, তিনিও নির্মূল মানুষ ছিলেন না। কিন্তু কোন মুক্ততা ছিল না। কারণ আমি জানি তিনি স্বপ্নে বহী, তখন কংগ্রেসের একজন নেতা অপরায়ণ বিধে হয় তো পুলিশের হাতে বরা পড়বার মত অবস্থায়



পড়েছিলেন। আমার বাবার কাছে এসেছিলেন, যাতে সুবেন্দ্রনাথের স্বত্বক্ষেপে তিনি বেঁচে যান। সত্যিই তিনি পুলিশের হাতে বরা পড়েনি। অথচ সেই কংগ্রেসীকে কার থেকে কত খালাসাল তিনি পেয়েছিলেন, দীর্ঘজীবের প্রকৃতি কত কি নাম তারা নিয়েছিল।

তাঁকে যেসেই দু-একবার। বক্তৃতা শুনেছি প্রথম ইলেকশনে ডালডলার। তাঁর তাই ডালডল জিওডেন্দ্রনাথ বানার্জি বঁকিরেছিলেন। তাঁর হয়ে তিনি প্রচার করতে এসেছিলেন। তাঁকে বিফল হতে হয়েছিল, তাঁর মিটিং জেয়ে গিয়েছিল তখনকার কংগ্রেসীরা' যাঁরা স্বরাজ্য পার্টির পক্ষে কাজ করছিলেন। সে সময়ে আমি উপস্থিত থেকেছি।

তাঁর শ্রুতিগুরু করা এবং তাঁকে শ্রুতিগুরু করার কথা নিয়ে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারলে তবেই কাজের কাজ হবে। সুবেন্দ্রনাথ যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন তা আশ্চর্য্য। যখনই অনুভব থেকে যাবে কতকাল হয়ে তা আমরা জানি না। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস জানার চেডনা ঘনি থাকে তবেই আমরা সুবেন্দ্রনাথের কৃষিকা সম্বন্ধে প্রকৃত আলোচনা করতে পারব। বাইবেলে কথা আছে—আমরা ঘনি ভুলে গাই আমাদের পূর্বপুরুষের কথা, তবে উত্তরপুরুষের কথাও ভুলতে পারব না। তাহলে হবে ভবিষ্যতের কথা, আমাদের সমাজ-সংস্কৃতির কথা, তারা যে ভুলতে পারেন তবে সে ভুলে যেমন বাসবোধ্য হতে পারে।

(সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১০০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কলকাতার টাউন হল ১৯৮৮ সালের ১১ই নভেম্বর প্রদত্ত ভাষণ থেকে।)

সুরেন্দ্রনাথ ও পৌর-প্রশাসনের নূতন দিগন্ত

কেশব চৌধুরী

কলকাতাবাসী জার্মান পার্কে মণ্ডারমান, উত্তোলিত বক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি নির্দেশে তারপরও সুরেন্দ্রনাথের মূর্তির সর্বে পরিচিত। মূর্তিটিকে নানাভাবে ঢাকা যায়। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উত্থানে ঔপনিবেশিক শাসনের অন্যান্য-অধিরূপের বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিবাদী ভূমি সোজা হয়ে দাঁড়ায়। লর্ড কার্জনকে 'জরমান'-নিষেধিত, কলকাতা কর্পোরেশনের স্বাধিকার হানতকারী ম্যাজিস্ট্রেট বিরুদ্ধে তিনি গণ্ডে উঠেছিলেন। প্রথম বহুভঙ্গ বিদ্রোহী অধ্যক্ষসমূহের তাঁর বক্তৃতাগুলি আজও ছাড়াই তথা ভারতবাসীর গর্বে। সুরেন্দ্রনাথের মূর্তির অব্যক্ত ভাবন কী চ্যালেঞ্জের প্রবর্ত বাণীর নিরন্তর প্রকাশ, নাকি ম্যাজিস্ট্রেট বিরুদ্ধে 'সারভেন্ডার-নট' ব্যানার্জির বাস্তবতার পশ্চিম প্রতিবাদ?

প্রায়-প্রায় উত্তর খোঁজার চেয়ে বেশি জটিল আর সুরেন্দ্রনাথের জীবনগুলির ঘরোয়া উপলব্ধি করে বর্তমান ও ভবিষ্যৎয়ের ব্যাপ্তি ও ভারতবাসীর কাছে নূতন ভাবনা-চিত্তের সঞ্চারিত তাঁরই জীবনব্যাপী অনুসারী কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটান। এই গাঢ়ত্ব পানিত হলে জার্মান পার্কের মূর্তিটিকে অনুভব করার বাস্তবতার অর্থবহ হয়ে উঠবে।

জাতীয় রাজনীতিতে সুরেন্দ্রনাথের প্রতিবাদী ভূমিকা অবশ্য সাম্রাজ্যবাদী, জাতীয়তাবাদী ও নব্য জাতীয়তাবাদী ইতিহাস লিখনে বিবিধভাবে বিস্তারিত হয়ে থাকে। প্রথমত ইতিহাস লিখনে একজন ভূমিকা সৃষ্টির অনুকূল বাতাবরণ রচনার সব কৃতিত্ব ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর মুষ্টিতে সমন্বিত হয়েছে। জাতীয়তাবাদী ও নব্য জাতীয়তাবাদী ইতিহাস লিখনে সুরেন্দ্রনাথসহ অন্যান্য নরমহতী, উপানিষিতিক নেতৃবৃন্দের রাজনীতিক চিন্তা-ভাবনা ও কর্মকাণ্ডকে ঔপনিবেশিক শাসন-পোষকের বিরুদ্ধে প্রবৃত্ত একটি প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে। অনুভবসমূহেই বলা হয়ে থাকে যে, নরমহতী জাতীয়তাবাদী রাজনীতিও এই প্রতিক্রিয়ায় সিরবতী ধারণ করে। এক কথায়, সুরেন্দ্রনাথ-নরমহতীর নরম পন্থার প্রতিবাদ এবং ভিলক-অরহিদের চরম পন্থার প্রতিরোধ উভয়েই ঔপনিবেশিক শাসনের প্রেক্ষিতে প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিবেচিত। অর্থাৎ, ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষে জনতান্ত্রিক কাগজ, প্রশাসনিক ঐক্য, মানবজীবনী কার্যক্রম, ইত্যাদি শিক্ষা ও সংস্করণের স্বাধীনতা প্রদান করে যে বিশাল প্রাণবল্যবাহী নরম হিসাবে



আবির্ভূত হুরছিল তারই প্রতিক্রিয়া হিসাবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী কার্যক্রম বিকাশলাভ করেছে। ব্রিটিশ শাসন নাকি ভারতীয় জীবনের নানা ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছিল জর্জ, আর সুরেন্দ্রনাথ, নরমহতী, গোবিন্দ এবং ভিলক, অরহি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ নাকি মুসিয়েছিলেন প্রতিবাদ!

প্রিন্স-প্রতিপ্রিন্স বা জর্জ-প্রতিজর্জ তত্ত্ব ইতিহাসিকদের যোগে কতটা টেকে সে বিষয়ে ঐকমত্য এখনও গড়ে উঠেছে বলা যায় না।

স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি

স্যার উনিশ শতাব্দী জুড়ে, এমনকি ভারতীয় বাস্তবীতিতে পাণ্ডুর আবির্ভাবের পূর্ববর্তী দু-দশক পর্যন্ত, রামমোহন থেকে শুরু করে সুব্রহ্মনাথ ও অন্যান্য বিকল্প নরমহতী জাতীয়তাবাদী নেতাদের ব্রিটিশ শাসনের ছায়া উপানিষিতিক গণতন্ত্রের বিকাশ, আর্থ-সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের প্রসঙ্গে সচেতন উদ্যোগ গ্রহণের সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। বেহাউ, বিল, পেন্ডার, শেইন, হার্ড, জারউইন, প্রাডল্টন, হার্ড

প্রতিনিয়ত তাদেরা উঁচা আকর্ষণ শান করে তুলে দিতোঁর্বেছিলেন। ব্রিটিশ মহাবিশ্ব প্রেমীরা স্বতীয়, বহুশল জীবনে তাঁদের জীবনানন্দ হয়ে উঠিতেন। ব্রিটিশ সংসদীয় ইতিহাসে তাঁরা ঐকনিবেশিত পদ্ধতের ঐতিহাসিকি দ্বয় ককর জনা কর্তৃপক্ষের বদলেবে অর্জিত বেশ কয়েকনে, প্রাথনা জনাতেন এবং প্রকোচননত প্রতিবল কয়েকনে।

সুয়েড্রনাথের উদ্যোগী জাতীয়তাবাদী নেত্রাঃ অঙ্গনসম্পন্ন, নিরোহিত্রিক সংসদীয় পদ্ধতিতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে পন্যতনবৎ উত্থাপনে পবিত্রলনাঃ কয়ে ভারতীয় প্রকৃতঃ বান্দনীতিক অসহা উপলব্ধিবে পরিচয় দিয়েছিলেন। উত্থাপনে যোগদানে সুয়েড আলোচনীর্ষি এনে দেবার ব্যর্থ প্রতিপ্রতিটিতে তাঁরা জাতিতে প্রবর্তিত জীবননি, নিজেবাও কান্যদগুণের পন্যতঃ ধাবিত জননি। সুয়েড্রনাথ নলই হলেছিলেন, ‘অনবসম্পন্ন’ হলেবে আমরা বিশ্বাস করি যে, পবিত্রতঃ ও উচ্চতঃ উদ্দেশ্যগুলি সাধনেব জনা ইংলান্ডেবেব সঠকে জাত্যেব সংযোগে ভাবয়ে কৃপার লনে।’

সুয়েড্রনাথ প্রমুখ নেতৃত্বের দ্বারা ভারতবর্ষে শাসন-কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বকে বৈধ হলে স্বীকার করে এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণা গড়ে তুলে স্বাধীনতা দিতে আনুসঙ্গিকভাবেই সুপ্রশাসিত ঘটিয়েছিলেন। স্বাভিজীবনীতা, আত্মনির্ভরতা, জাতীয় শিষ্টাচার ইত্যাদিতে শিষ্টাচারের প্রবর্তন, উচ্চশ্রীত্বল, ধর্ম-নিরপেক্ষতা, পন্যত্রিত্ব স্বাধীন স্বাধীনশাসন, জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের কর্মসূচি প্রকাশন এবং সর্বজনীন নিষ্কাশন করে তাঁরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে পন্যত্রিত্ব ধারণ-ধারণায় সমৃদ্ধ করেন। বি আর নন্দা সঠিক বলেছেন, ‘তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ পথের দায়িত্বটি পর্বত জাতিতে পৌঁছে দিয়েছিলেন।’

সুয়েড্রনাথের রাজনীতির চরম লক্ষ্য জনমানুষ ধাতঃ ভারতবর্ষে জনা জেনিটিনে শাসনব্যবস্থা পড়ে তোলার দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি কংগ্রেসের অন্যান্য নরসম্পন্ন নেত্রাদের দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বারা থেকেই সম্পূর্ণ নিরোহিত্রিক উপায়ে স্বাধীনশাসন অর্জনের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। সর্বকরি যেভাবে ‘শ্যার’ তাঁর নামেব অংশে তুলে হাজেছিল হটে, কিন্তু স্বদেশপ্রেমের তীব্র প্রেরণার তিনি জাতির জন্য তাঁর কর্মজীবনে উৎসর্গ করেছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগেই তিনি কলকাতায় বিভিন্ন প্রদেশে শাখাসহ ইউনিয়ন আয়োজিতেন প্রতিষ্ঠা করেন। সমাজবাদী রাজনীতিতে তিনি ভারতীয় ধর্ম-শাওরা নিয়ে নিরোহিত্রিক উপায়ে সংগ্রামে প্রতী হাজেছিলেন। সেঃ পন্যত্রিত্বের আইনসভার অভ্যন্তরে ও বাইরে তিনি লর্ড কার্জনের নির্দেশে প্রতিষ্ঠিত প্রতিনিষিদ্ধকূল পন্যত্রিত্বের কন্যেবকালী কলকাতা পৌরসভা ছিলার বিরুদ্ধে ১৮৮৮ ও ১৮৯১ সালে এমন নিরোহিত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলেন যা পন্যত্রিত্বের সর্বকাল-প্রসিদ্ধ বে-কেনও দেশেই বিচার ও প্রকৃত অর্জন করতে সক্ষম। স্যার সুয়েড্রনাথ দ্বারা বি বা রাষ্ট্রপতি সুয়েড্রনাথ অঙ্গনসম্পন্ন এই নিরোহিত্রিক বিদ্যে বিষয় নঃ। স্বাধীন স্বাধীনশাসন সংগ্রামে বিদ্যে ব্রিটিশ জন্মতঃ সুয়েড্রনাথের জীবন-অনন্ত ও কর্মজীবন অঙ্গন এককভাবে প্রাধান্য প্রেরেবে কলা লার। স্বর্গ-হিটের সংগ্রামের কূল লার তাঁকে নিষিদ্ধ করেছিল।

তিনি বাংলা ওবা ভারতবর্ষে স্বাধীন স্বাধীনশাসনের পন্যত্রিত্বিত্রপে পবিত্রতঃ স্বীকৃতি শাসন করেছিলেন। ‘রাষ্ট্রপতি’ অভিধাঃ সুবিশ্বজনমতের পরিচিতি দৃষ্টান্ত জাতির প্রকৃতপথে অভিধাঃ।

ম্যাকেলি আইন ও ‘সারেরতার-নট ব্যানার্জি’

বিশব-পবিত্র ব্রিটিশ ভারতঃ স্বাধীন স্বাধীনশাসনের অঙ্গণটি পন্যত্রিত্বের মধ্যগতির সমুদ্র ছিল। লর্ড ডারজিলের কলকাতা ছিল, কিন্তু তিনি বৈশ্বলিক সম্পর্কের সঙ্গে অবিভক্তভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন। লর্ড এলগিন ছিলেন কলিকতা, আবেগবিহীন প্রাজেটস্টার্টীয় শাসনকর্তা, আর লাললাল ডায়ের ও কার্জন দোস্ত হকিমজী। এদের দ্বারা পড়ে শাসনকর্ত্তে সর্বত্র, কুর্ততঃ পৌরসভা থেকে ভারতঃ-সর্বত্র পর্বত, পন্যত্রিত্ব, তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও প্রত্যাহারপীল পর্বতে সঠিকবিনতি হিসাবকল্পের পরামর্শ প্রদানে মীতি পুঁথি হতে হতে, শাসনকর্ত্তে ভারতীয়দের অঙ্গণপ্রদানের পন্যত্রিত্ব অভিধাঃ কুর্ত হতে হতে। সিপ্‌সের আমলে অর্জিত স্বাধীন স্বাধীনশাসনের পন্যত্রিত্ব তাঁরা টান লক করা যায়। কেনও কেনও ক্ষেত্রে পন্যত্রিত্ব পন্যত্রে হলে বেওয়া হয়। বিচার পন্যত্রিত্বের শেষ লক থেকে বর্তমান পন্যত্রিত্ব প্রাথমিকের কন্যেবকালীতে স্বাধীন স্বাধীনশাসন ঘটিয়া ও অঙ্গণটি লার কর্ত্তে হতে।

অঙ্গণের কিছু সেই, ১৮৮৮ সালে কলকাতা কর্পোরেশনের পৌর-শাসনের ‘সার্বভৌম’ অভিধাঃ স্বয়ং কলার দুর্ভাগ্যবিশিষ্ট একটি বিল আইনসভায় উপস্থাপিত করা হয়। ১৮৮৩ ও ১৮৭৬ সালের আইন দুটিতে স্বীকৃত মীতি অঙ্গণ পরিবর্তনের সুশাসিত করা হয়। কর্পোরেশনের কর্মতা ও কলকাতাকে তিনি কর্তৃপক্ষের দ্বারা স্বয়ং কলার প্রত্যয় সঠিকবিনতি হতে-কর্ণাধেনে, জেনারেল করিটি ও চেয়ারম্যান। কেন হঠাৎ এই পরিবর্তনের জন্য দ্বারা দ্বারা ?

সর্বকাল-পক্ষেব দুর্ভাগ্য ছিল এঙ্গন :

১। বিচারসি কমিশন ১৮৮৬ সালের মেইকেল বোর্ড ও ডঃ ব্যাকসের রিপোর্ট অনুযায়ী কলকাতার অঙ্গণনা সাহায্য খবরা এমন এক শোচনীয় পর্বতে পৌঁছেছে যে, অঙ্গণের যোগ্যপন্যত্ব ব্যবস্থা পুঁথি না হলে প্রদেশে হতে প্রায় হত্যাশীল্যেবে বেবা বিতে পড়ে। এঙ্গন অঙ্গণের সর্বকাতের বক্তব্য পক্ষার এই, নগরের প্রশাসনিক ব্যবস্থার শাসন বিতরণের কর্মতা অবিভক্ত না হলে অর্জিতই কলকাতা বন্যের দ্বারাবে আবদানি-প্রণয়ি বক্ত হবার উপলব্ধ হতে, কেন না পন্যত্ব পন্যত্রিত্বের ইঙ্গিতের ইঙ্গিতা-নির্ভর সাধারণতঃগুলির পর প্রকৃত ‘কোরোয়াটাইন’ ও অনুপ্রাণ স্ববস্থানি কলকাতার বিরুদ্ধে প্রাঃ কর্ত্তে আন্তর্জাতিক সম্রাট্যের কলিগার কলিগির কর্ত্তে হত।

২। কলকাতা কর্পোরেশনের করিটি-ব্যবস্থা শাসন বিতরণের ক্রমবর্ধমান পৌরসভার কাল হিসাবে ক্রমান্বিত ১৮৮৮ সালে

বিলের উপাখ্যাত ভিত্তি মনে করতেন, যত কমিটির বোঁড়া ছিল জনসিত জাহানের ৬১ বছর বয়স। ওই দ্বারা এমন আশ্পন্ন ছিল, কারণ-অবাকার যত কমিটি এগে কমিটিগুলিতে যত ইচ্ছা সন্যাস সন্যাস করা করে। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, ট্রামওয়ে কমিটিতে ৪৮ ও অডিটরস ডিবি কমিটিতে ৩০ জন সদস্য ছিলেন। কমিটিগুলিতে ঢেঁকোর জন্য শৌচিনিতাসের মধ্যে হত্যাগুলি বেগে তে। শেষপর্যন্ত তিনি যে যে কমিটিতে সন্যাস হতে জাহানের তাই হত—তথ্যাত। এমন কমিটি কমিটি ছিল যেগুলি দাম দামেই অসহ্য হতে পারত।

৪। কলকাতা কর্পোরেশনের প্রশাসনিক ব্যবস্থা কার্যত ইউরোপিয় ব্যবস্থারই মতো পৌর-শাসনে আদ্যোপহাস্য পথ গ্রহণ করে নিচ্ছে। কলকাতার মিশ্র জনসংখ্যায় এর পরিণাম ভয়ঙ্কর হতে পারত। ব্যবসা-কৃষিজ কলকাতা হ্যাগ কয়েক সম্পন্নিত দুলা হুস শায়ে, উকিলেরা মজেল হাজারেন, বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র ছুটিয়ে না এবং কলকাতা একশালের ব্যারিস্টার, হাজারের বা কমরনয়গুলির মতো দুস্তায্য হয়ে উঠবে। পরিসংখ্যান উদ্ধৃত করে রিসিউ দেখান যে, কলকাতা কর্পোরেশন 'হিন্দু অকশন-ভাণ্ডার' কৃষিকাজ হায়ে। নথিভুক্ত নির্বাচকের মধ্যে ৭০.০% ছিলেন হিন্দু, মোট জনসংখ্যার ৬৯% হায়ে ও তাঁরা ৯৯.০% নির্বাচনী ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। দুলামনহায়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ পর্যায়ে হিন্দুর ছিল ১০.০%, ২৯% ও ৯% ইউরোপিয়দের ক্ষেত্রে নির্বাচনী ক্ষমতা ১২.০% ছিল। ১৮৭৬ ও ১৮৮৮ সালের কলকাতা কর্পোরেশন আইন অনুযায়ী বর্তমান কর্পোরেশন গঠিত হায়ে হিন্দুর মিশ্রণ

সংস্কারবিভাগে কাজে যোগেছে। আর, জেনারেল কমিটিতে ১৮৮২ সালে যখন, ১৮৯০ সালেও যখন, হিন্দুদের সংস্কারবিভাগে ৬৬.৬৬ ছিল।

৪। কলকাতা কণ্ঠশিল্পের অধিক সংখ্যক শৈলীশিল্পীর সমাবেশে
বাজার সফল পরিবেশ জন্ম করে থাকে। কলকাতার কাজ না করে
কেবল সমালোচক ও তত্ত্বাবধানই উৎসাহ দেওয়া।
শৈলীশিল্পীদের মধ্যে নিমিত্তীন, দেশবাসী একটি শ্রেণীর
অভির্ভাব ঘটেছে। নির্ভরতা বোধ ও কমিটি বোধ তেজের শক্তির
সুযোগ গ্রহণ করে এই শ্রেণীর সাম্মিত্তিবোধে শৈলীশিল্পীদের
সকল বিভাগে নিজেদের স্থানসিদ্ধিতে অংশ নেবে। বিশেষ
করে শৈলী কাজ আসনের ক্ষেত্রে হো কথাই ছিল না। আসন
কর, গিটারকর, অম্বাচর ও কর বর্গিক শিল্পে অনুভবশীল
সম্পত্তি মালিকদের যোগসাজসে এরা কণ্ঠশিল্পকে প্ররোচিত
করে নিজস্বের আবেশ প্রসিদ্ধি। এই কারণে শৈলী শিল্পীদের
সময় প্রত্যাহার চলত, আসনভূতা ফেরা শিল্প, এমনকী উৎসাহ
আসন-পদাশ্রয়।

উপরোক্ত 'প্রতিশ্রুতি' দ্বাৰা কৰা নতুন কৰ্ণপেশনেৰে গঠন কৰা ১৯৮৮ সালৰে কলকাতা শৈৱ বিল গঢ়া কৰা হয়। সরকার লক্ষ্য হিচাপে কৰা হয় বিলটিৰ বিভিন্ন উদ্দেশ্য: বৈশিষ্ট্যৰ প্ৰশাসক পৰিচালনাৰ সকল ক্ষমতা এক ব্যক্তিৰ হস্তে অৰ্পণ এবং ইউৰোপীয় ব্যৱসায়িকৰ স্বার্থ ৰক্ষাৰ জন্য, কৰ্ণপেশনেৰে বৰ্ষাপাতকৃত প্ৰতিশ্রুতিবিধৰে ব্যৱহাৰ কৰা। বিলটি আইনে প্ৰশাসকিত হওঁ দেখা দিয়ে, সরকার মনোনীত মোহৰাৱান ছাফট প্ৰশাসনেৰে দখলিহাৰাৰ বৰ্ষনেৰে কৰা কৰ্ণপেশনেৰে ও মোহৰাৱানৰ মৰা

"FATHER OF THE NEW MUNICIPAL ACT"



"We have sought to establish in this great city the essential principles of democracy, the Government of the people, by the people and for the people. We have broadened the franchise, we have enfranchised the womanhood of Calcutta, we have relaxed the fetters of Government control, we have provided for sanitary conditions, which, I hope, will improve the health, promote the happiness and add to our civic amenities."

SURENDRANATH BANERJEA,
In the Bengal Legislative Council inaugurating
The New Calcutta Municipal Act.

যোদ্ধার হিসেবে একটি কার্যকরী কমিটি নতুন গঠনভিত্তে গঠনের ব্যবস্থা করে। তৎকালীন বাংলার লেঃ গভর্নর স্যার আলেকজান্ডার ম্যাকলিথ বিলাস ছিল, প্রগতি, বিচার ও সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধুই ঘোড়ার ডাকটাই সমসাময়িক সত্য সম্পর্কিত হতে পারে, বাকি সৃষ্টি তার কট্টর দায়িত্ব থাকই সৃষ্টির উপরে সঞ্চার হতে পারে। ১৮৯১ সালের অর্গানাইজেশন আইন (ম্যাকলিথ আইন নামে পরিচিত) অর্গানাইজেশনের কর্মসূচির পক্ষ বিস্তারিত অঙ্গভূত করে যে পদ্ধতিতে ছেদন করে।

জেনারেল কমিটিতে ইইংরেজি বার্ষিক বক্তব্য প্রচার জেনারেল হিসেবে সরকার পক্ষ থেকে বলা হয় যে, জাতিগত প্রতিনিধিত্বের প্রকার নেই কলকাতায়, প্রত্যেক জন ব্যতীতে প্রতিনিধিত্ব। তিনটি বিশেষ বার্ষিক প্রতিনিধিত্ব কলকাতার শাসন ব্যবস্থায় একান্ত জরুরি। বৃন্দা-বালিকা সৃষ্টি করেছে কলকাতা; সরকার কলকাতাতে সারা ভারতের প্রায়শী বিনিময়ে এবং সারা দুনিয়ার কাছে সুন্দর, স্বচ্ছ ও প্রগতিশীল নগর শাসনব্যবস্থা প্রচার করা দায়িত্বশীল, আর দরবেশে বড়ি ও ছবি দায়িত্ব এবং অন্যান্য অনেক কলকাতাবাসী ধর্ম শৈশবাসনের স্বচ্ছ ন্যায়ভূত লোক। কাজেই, জেনারেল কমিটিতে সমসাময়িক প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য প্রতিটি বার্ষিক-শেষের অধিকার দান করা উচিত।

অর্গানাইজেশনের সূচনাসংখ্যা ১৮৭৬ সালে প্রচলিত আইনে যেমন ছিল, ১৮৮১ সালের বিশেষ ডেমন লিখা হয়। কিন্তু ইংরেজ এসে পৌঁছিত হয় লর্ড কার্জনের 'পরবেশন'—অর্গানাইজেশন আইনের নানা অসঙ্গতি ও ঠিক-বিচারিত দূর করার প্রকৃতি উপায় সমসাময়িক ৭৫ থেকে কমিয়ে ৫০ করা। ১৮৯১ সালের আইনে এই উপায় গৃহীত হয়। লর্ড কার্জন, ডায়রিস ও এলিসন প্রমুখ আবেদন প্রত্যাখ্যাত লেঃ গভর্নরের আলোচনায় গৃহীত সমসাময়িক এভাবে কার্জনের কর্মসূচি এক পোঁচার পবিত্রিত হতে পারে।

এই 'প্রতিনিধিত্বশীল ও পল্লীগামী' আইনের বিস্তৃত সূত্রসমূহ অধ্যাপনায় লেঃ স্যার স্যার কার্জনের অধীনে ও বাইরে এমন প্রতিনিধি অধ্যয়ন হতে তোলে। যা ভারতের শৈশব-অধ্যয়নের ইতিহাসে পৌরস্বের স্থান অধিকার করে আছে। সূত্রসমূহের এই প্রতিনিধি বৃত্তিকা তত্ত্বাবধায়ী অবস্থায় প্রত্যেক করে প্রচার বক্তব্য বিদ্যেগোষ্ঠী অধ্যয়নের সময়। ঐতিহাসিক দৃষ্ট থেকে স্থানীয় পরবর্তীকাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময়কালের সূত্রসমূহের অত্যন্ত বিস্তৃত পরিচালিত, প্রচারণা ও সমন্বয়সময় অল্প ব্যবস্থার পরবর্তীকাল অন্য জেনারেল বিদ্যেগোষ্ঠী রেখা আইনসভা অঙ্গভূত করেছেন করে আদার স্থান হয় না।

১৮৯১ সালের আইন প্রণীত হলে সূত্রসমূহের নেতৃত্ব কলকাতা অর্গানাইজেশন ২৮ জন নির্বাচিত সদস্য সমন্বিত করেন। বেঙ্গল ন্যায়ালয় প্রচার অবস্থায় ও ইউনিয়ন অধ্যয়নসময় প্রতিকূলতায় হতে গড়ে। ১৮৯৮ সালের ৩১ অক্টোবর থেকে ১৮৯৯

সালের ১৫ মার্চ পর্যন্ত নয়াগী জনসভা ও চারটি ওয়ার্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়। টাইল হলের ঘনত্ব জনসভার পৃথক প্রায়শচিত্তে গরীব আলস্য প্রকাশ করা হয় যে, এক পড়াশীল এক-চতুর্থাংশ সমন্বয়সময় অল্প জনপ্রতিনিধিত্বের নীতিতে মূল্য কুটনায়িত্ব অর্গানাইজেশনের পক্ষ বিস্তারিত উপর কলকাতার প্রতিনিধিত্বের নিয়ন্ত্রণ ও জেনারেল কমিটির কার্যক্রমে প্রচারে তদারকি করা তিনটি করে। এতে হলে স্থানীয় প্রায়শচিত্তের নীতিতে প্রতিনিধিত্বের জন্য অনিবার্য হতে উঠবে। 'জন কোম্পানির সমস্ত পক্ষ' কলকাতার শৈশবাসনের আত্মপ্রকাশ করে, স্থানীয় প্রায়শচিত্তের পরিধিতে এর অঙ্গভূতিই প্রত্যক্ষপ্রকাশ হবে। কলকাতা অর্গানাইজেশন বক্তব্যপ্রকাশ হতে। 'ডি নেচার ডিওরাম'-এ সিনেমা-বর্ণিত এশিওরিয়ানদের তদারকির হতে অবস্থা হবে শৈশবাসনের। এই তদারকির হতে কলকাতার শৈশবিত্বের সম্পর্কে বলা হবে—উদ্যম বিলুপ্তি করেছিলেন বটে, কিন্তু তারপরই নিয়ন্ত্রণ হতে পড়েছিলেন। সূত্রসমূহ অকাত্য দৃষ্টিকোণ বিস্তার করে এতদন বক্তব্য প্রত্যাগ প্রণয়ী হয়েছিলেন যে, ১৮৯১ সালের আইন শৈশবাসনের সমস্ত কর্তৃত্ব কলকাতার প্রতিনিধিত্বের হাত থেকে হিমিয়ে নিয়ে ইইংরেজি বর্ণিত সম্প্রদায় ও সরকারের প্রতিনিধিত্বের কাছে হস্তান্তরিত করা হবে। বাস্তবিক সূত্র তিনি বলেছিলেন, স্থানীয় প্রায়শচিত্তের নামে এই প্রহসন অবিলম্বে বন্ধ করে কলকাতা অর্গানাইজেশনের সরকার নির্বাচিত ও পরিচালিত একটি 'বোর্ড' বা বিস্তারিত পরিচালিত করা প্রয়োজন।

১৮৯১ সালের আইনের সম্প্রদায় সরকারে সতল দৃষ্টিকোণ সূত্রসমূহের বেঙ্গল বৈষয়, নিপুণতা ও ব্যক্তিগত প্রায়শচিত্তে জরুরি করেছিলেন তা আশঙ্ক্য বিস্তারিত ও প্রকৃত উদ্ভব করে।

সূত্রসমূহের আইনসভার সর্বপ্রথম প্রোগ্রাম সফলভাবে প্রায়শচিত্তের অর্গানাইজেশন আইন পরিষদের সরকারি বক্তব্যকে অসার প্রতিপালন করেন। অর্গানাইজেশন কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাবলীর পৃথকপৃথক বিবেচনায় নিয়ে তিনি যেমন প্রায়শচিত্তে অকৃত্য হতে পৌরসভা প্রোগ্রাম সফল সমন্বয় অকোমিতা করতে অর্থ ব্যয় করেছেন এবং কার্জনের প্রায়শচিত্তের উপযোগী ব্যবস্থা গ্রহণ তার পর থেকে। বলা যে: গভর্নরের উচিত উদ্ভব করে তিনি সরকারি বক্তব্যের অনুকূল হওয়া সম্পর্কে টেনে আনেন। লেঃ গভর্নর বলেছিলেন, কিন্ত বঙ্গের মুখিতে গৃহীত প্রচারণা প্রোগ্রাম পুনরাবিস্তার বন্ধ করতে সক্ষম হবে।

খণ্ডিত, সূত্রসমূহের অর্গানাইজেশনের কার্যক্রমে বক্তব্যের পর্যালোচনা করে যেমন যে, কলকাতা ও অলাপ-অলাপসময় বঙ্গ সময় ব্যয় করলেও অর্গানাইজেশন প্রচারণাযোগ্য কর্মসূচি সম্পাদন সক্ষম হয়েছিল। ১৮৯১ সালের আইন পক্ষ হবার পূর্ববর্তী বঙ্গসরকারের গৃহীত তারত সরকারের প্রতিনিধিত্বগুলি একের পর এক উদ্ধৃত করে তিনি অর্গানাইজেশনের কার্যক্রম সম্পর্কে সরকারের সমন্বয় দীক্ষিতের চিত্রটি উপস্থাপন করেন। অর্গানাইজেশন সম্পর্কে 'কলকাতা পূর্ণ ও বিস্তারিত প্রায়শচিত্ত' অঙ্গভূতি তিনি প্রায়শচিত্তে সর্বদা

স্বাধীন দেশের হাউসিং, কলকাতা কর্পোরেশন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ সাহায্য নেব। হাউসিং ও চোরাচান্দা মিঃ গী-র অধিষ্ঠিত এবং কর্পোরেশনের সভার গৃহীত সিদ্ধান্ত ও ব্যক্তি আলাপ-আলোচনার সময়ের পরিসংখ্যান ব্যবহার করে ৭০নং অর্ডার। হাউসিং মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদত্ত যে, সভার পৃথিবীর আইনসভাগুলির মাত্রার অধিকতর অধিকৃত ব্রিটিশ পল্লিগ্রামকেও অনুসরণ অবস্থান থেকে দূরে নয় বলে জনগণকে স্বাধীনতাশ্রমের অধিকতর প্রতিষ্ঠিত করার নীতি থেকে সবার আসা উচিত নয়। হাউসিং মন্ত্রণালয় অধিকৃত হলেও যেহেতু বসেছিলেন যে, নেতৃবৃন্দের পৌরনিগমসমূহ সাধারণত কর্পোরেশনের সভার বক্তব্য রাখতেন, অন্যদ্বারা পল্লিগ্রাম প্রভৃতির ভূমিকা গ্রহণে অগ্রসর হতেন। মিঃ গী, কর্পোরেশন সম্পর্কে অতিক্রমণ ও বিচারিত জনত্বের অধিকতর সম্পূর্ণ জিওগ্রাফিক্যাল বস্তুক্য করেন। কোয়ার্টার্স হিসাবে তাঁর অধিকৃত থেকে তিনি এমন কোনও ঘটনা ঘটন করতে পারেন না, যেখানে বক্তা বলার জন্যই বলতেন, তাঁর বক্তব্য বিষয়ে নতুন আলোচনাসম্পাদিত করছেন না। ১৮৯৪-৯৫ ও ১৮৯৫-৯৬ সালে কর্পোরেশনের সভার আলোচিত বিষয়ের মোট সংখ্যা, বর ও দীর্ঘ আলোচনার সংখ্যা, সভাপ্রতিষ্ঠিত উপনিধির গড়, সীমিত আলোচনার পৌরনিগমের সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ তথ্য নিয়ে সুবক্তব্যাদি সম্ভবতঃইতঃপূর্বে অতিক্রমণ ও সময়ের অপর্যায়ের সম্পর্কিত অপর্যায় থেকে কর্পোরেশনকে দূর করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলা যায়।

তৃতীয়ত, কলকাতা কর্পোরেশনের সমস্যাসংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে অত্যন্ত অধিক বলে ভারত সরকারের বক্তব্যকে সুবক্তব্যে ইংল্যান্ডের সরকারী অধিকৃতার নথির তুলনায় তির্যক প্রমাণ করেন। ইংল্যান্ডের বিখ্যাত শহরগুলির জনসংখ্যা ও পৌরনিগমের সংখ্যার নিম্নলিখিত তালিকা আইনসভার ভাষনে বিস্তৃত থাকে :

শহরের নাম	জনসংখ্যা	পৌরনিগমের সংখ্যা
গ্রান্ডসো	৭০৫,০৫২	৭৮
এলিংবার্ণ	২৭৬,০১৪	৪১
থানসেটসি	৫২১,০৬১	১০৪
বার্থিংহাম	৪০১,২৪১	৭২
লিডস	৬৩২,৫১২	৬৪
লিডস	৪৪৭,২৭৮	৬৪
লিডস	৪০২,৪৪৯	৬৪

উপরোক্ত গ্রাম সব শহরগুলির জনসংখ্যার তুলনায় কলকাতার জনসংখ্যা অধিকতর (৬৪০,০০০) এবং নিঃসন্দেহে অনেক বেশি দ্রুতগতির। কাজেই কর্পোরেশনে নির্বাচিত

প্রতিনিধিদের সংখ্যা আইনের ক্রমিক ব্যয়গত গ্রাম করা অনতিক্রমত বলে তিনি বক্তব্য করেন। ১৮৭৬ সালে সে: পল্লির স্বাধীনতার টেম্পল এই সংখ্যা গ্রামে সক্ষম হননি, বলা তিনি কলকাতার বসবাসকারী বিভিন্ন জাতিগত জন: আসন সংখ্যা নির্ধারিত করার পদ্ধতি ছিলেন। ১৮৮৮ সালে কলকাতা ট্রেন্স আঙ্গলিগেটেশনের মিঃ আবদুল্লাহ নির্বাচিত সমস্যার সংখ্যা অর্ধেক করার পরোক্ষভাবে প্রস্তাব জানায় তখন প্রাথমিক সরকারের ব্যবস্থাপনা বিভাগের সেক্রেটারি মিঃ কোলম্যান মেসেজ দিয়েছিলেন বলে বলেন এই পরোক্ষভাবে গৃহীত হলে নির্বাচন ও প্রতিনিধিত্বের উভয় নীতিবই সংকোচন ঘটবে। এই কারণে, ১৮৮৮ সালে উদ্ভূত কলকাতা পৌরসভার মিল কর্পোরেশনের সমস্যাসংখ্যার কোনরূপ গ্রাম সুশাসিত করেন। সুবক্তব্য গ্রহণ হোলেন, অতীতকে নস্যাৎ করা, অতীত থেকে শিক্ষাগ্রহণ ব্যবহার করা কি সম্ভব? আর, যদি তা করতেই হয়, তবে কৃত্রিমভাবে শুদ্ধায় নির্বাচিত সমস্যাসংখ্যার ক্ষেত্রেই প্রবৃত্তি হবে কেন?

পঞ্চমত, কর্পোরেশনে 'বিশু প্রাচীন' বর ওভর ইউরোপীয় প্রতিনিধির বৃদ্ধির প্রত্যাহাৎ তিনি তালিমিত বিশেষজ্ঞসমূহ অর্থাৎ কাব্যক্রম আখ্যা যেন। তিনি ১৮৮৮ সালের আইনের সঠিক বয়সটি বয়সটি বয়স করে গ্রহণ করতে উপস্থিত করেন যে, ইউরোপীয়দের সংখ্যক হলে অন্যদ্বারা ১৬ জন পৌরনিগম নির্বাচন করতে পারতেন, কিন্তু তাঁরা মনঃমনে নির্বাচিত করতেন। ইউরোপীয় নির্বাচন ক্ষেত্র থেকে সর্বত্র ইউরোপীয় নির্বাচিত হতেন না। ১৮৮৮ সালের আইন বিশু ভোটারদের ক্ষেত্রে ৬% প্রতিনিধি বৃদ্ধির সুযোগ দিয়েছিল, যুক্তরাজ্যের ক্ষেত্রে ২৮% এবং ইউরোপীয়দের ক্ষেত্রে ২০%। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইউরোপীয় প্রতিনিধির বয়সসংখ্যক না হলে সরকার মনঃমনেই গ্রহণ করে ওই ব্যক্তি অন্যদ্বারা পূর্ণ করার অধিকারী ছিল। সুবক্তব্য সঠিক হলেছিলেন, ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয়দের কাছে কর্মজীবন হয়ে পড়ত চুক্তির সমস্যা; কর্মব্যর্থ, প্রীতমাত্রা নির্বাহ বা নির্বাসনের প্রকার পোনার সমস্যা। এক কারণে, ভারতে ইউরোপীয়দের অস্থায়ী প্রীতমাত্রার নথি ছিলেন। বর্তমানে বাক্য-বাক্যে কর্মের ইউরোপীয়দের পক্ষে কলকাতার নগর-প্রশাসন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যে পর মিল অংশগ্রহণের দায়িত্বভার অর্জন করা সম্ভব ছিল না।

সপ্তমত, উল্লেখ যে, সুবক্তব্য গ্রহণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন যে, বহু হলে অনুসরণে বর্তিত ১৮৯৯ সালের প্রস্তাবিত কলকাতা পৌরসভার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের সনদে সরকারী ওকালতি তত্ত্বাবধি গ্রহণ প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু পাহা দেহতার উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি দেখান যে, ভারতীয় প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিচালিত বয়ে কর্পোরেশন প্রধান শাসনবিভাগীয় কর্মকর্তা (কমিশনার) ও কার্যনির্বাহী সংস্থা (স্টাফি কন্সিট) উভয়কেই প্রতিনিমিত 'নিয়ন্ত্রণ' সমালোচনা, ওকালতি ও পরিচালনার অধীন রাখার অধিকারী ছিল। কমিশনার কর্পোরেশনের সমস্যাসংখ্যা গ্রহণ করতে পারতেন না, স্টাফি কন্সিটেও তিনি সভা হতে পারতেন না। অর্থাৎ, তিনি কোনভাবেই কর্পোরেশন বা স্টাফি কন্সিট

প্রতিষ্ঠান অবৈধ, বর্জ্যতা, সর্বাঙ্গ সাম্প্রদায়িক স্বার্থের প্রণোদনা এই সমাপ্তি এই বেশি কখনও প্রত্যক্ষ করেনি। প্রায় সকল মুসলমান সমাজ স্বতন্ত্র নির্বাচনগুলীর মাধ্যমে মুসলমান প্রতিনিধি নির্বাচনের পক্ষে অতিমাত্র প্রকাশ করেন। আইনসভার বাইরে বিভিন্ন মুসলমান সমাজ ও প্রতিষ্ঠানগুলিও অনুরণ অতিমাত্র প্রকাশ করে। বিশ্রা নির্বাচনগুলী ও স্বতন্ত্র মুসলমান নির্বাচনগুলীর প্রদে আইনসভার পরিমিতি এতদ প্রকারে যে, বিশ্রা নির্বাচনগুলী সমর্থন সহকারি প্রত্যক্ষ গণভিত্তি দ্বারা সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়। মিলিগতভাবে সুপ্রভাবনা, বিশ্রা-নির্বাচনগুলীর সমর্থক হলেও বাস্তব পরিস্থিতি সামান্য দিগে ল্যাংকোড জেমসের প্রত্যক্ষ অনুদানী নয় বংস্বরের জন্য মুসলমান প্রতিনিধি নির্বাচনের স্বতন্ত্র নির্বাচনগুলীর ব্যবস্থা বিবিধক কল্পে সম্ভব হয়। বলাবৎসা, এতদ সম্ভাবি তিনি ঐশ্বর্যগত কারণেই ঘিয়েছিলেন।

জোটেরদেব ঘোষাতার মাসকারি ১৯২০ সালের আইন কিছুটা সহজ, সরল করা হয়। তেটীর সংখ্যক বৃদ্ধি ছটে। পৌর নির্বাচনে পূর্বতন আইনের বিধানে একবারটি তাঁর সম্পত্তির দ্বারা অনুযায়ী একই ওয়ার্ডে সর্বাধিক এগারোটি ভোটার অধিকার লাভ করতে পারতেন। ভোটগুলি তিনি একই প্রার্থী বা বিভিন্ন প্রার্থীর ক্ষেত্রে কটন করতে পারতেন। এতদ ব্যবস্থা ১৯২০ সালের আইনে প্রসূত হয়।

১৯২০ সালের আইনে গণতান্ত্রিক নীতির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়—কলকাতা পৌরসভার ১৮৯৯ সালের আইন-নির্ধারিত সারসংহৃত স্ব স্ব ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব স্বাধীন তিনটি কর্তৃপক্ষের (কর্পোরেশন, জোয়েন্স কমিটি ও চেয়ারম্যান) সহায়তায় ছিলো। ১৮৭৬ সাল থেকে ১৮৯৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত প্রচলিত ব্যবস্থা সুপ্রভাবনা পুনরায় প্রবর্তন করেন, অর্থাৎ কলকাতার পৌর সভার কাজকর্মের পূর্ণ ক্ষমতা-৩৬ পরিষদ কর্পোরেশনের হস্তে লাভ হয়।

১৯২০ সালের আইন আরও একটি মৌল পরিবর্তন সাধন করে। পূর্বতন আইনে চেয়ারম্যান কর্পোরেশন ও অন্যান্য কমিটিগুলির সভার সভাপতিত্ব করতেন, স্মীকারের হাতে দায়-দায়িত্ব পালন করতেন এবং কর্পোরেশনের সুশাসন হিসাবে কার্য করতেন। অতঃপর, কলকাতা পৌরসভার প্রধান কর্তৃত্বক্ষেত্রেও দায়-দায়িত্ব পালন করতেন। বিবেচনীয়করণ কমিশনের সুশাসনের সঙ্গে ঐক্যভুক্ত শোষণ করে সুপ্রভাবনা প্রবর্তক দায়-দায়িত্ব পালনের জন্য যেতর পর সৃষ্টি করেন, আর শোষণ দায়-দায়িত্ব পালনের জন্য টীক এগ্রিকাল্টিউর অফিসার। চেয়ারম্যানের পর বিলুপ্ত হয়।

কলকাতা কর্পোরেশনের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কেনও কোনও ক্ষেত্রে সামান্য শিথিল করতে সুপ্রভাবনা সক্ষম হয়।

১৯২০ সালের আইন জেনারেলের ঘোষণাসম্পন্ন নারীর ভোটার ও নির্বাচনপ্রার্থী হবার অধিকার স্বীকার করে। নারীর

“সুরেন্দ্রনাথ শাসন
বিভাগের বহু সহকারী ও
আইনসভার সদস্যদের
অনেকের বিরোধিতা সত্ত্বেও
নারীর ভোটাধিকার
আইনসিদ্ধ করতে
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।”

জোটবিধানে সর্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্ব তখন ব্যাপ্ত ও প্রকাশ ছিল না। কিন্তু সুপ্রভাবনা শাসন বিভাগের বহু সহকারী ও আইনসভার সদস্যদের অনেকের বিরোধিতা সত্ত্বেও নারীর ভোটাধিকার আইনসিদ্ধ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি হলেছিলেন, “প্রাগতিশীল সমতার দায়িত্ব প্রতীকর হলে থাকে না, কল্যাণকর প্রগতিশীল নীতির প্রেরণাত্মকই তা জাতীয় সাধনে অবদান রাখে।”

১৯২০ সালের আইন কর্পোরেশনের কর্তৃত্ব ও কাজকর্ম বিবেচনীয়কৃত করার আইনকর্তা ব্যবস্থা রচনা করে। এই আইনে এতদ নির্ধারিত থাকে যে, কর্পোরেশন প্রয়োজনবোধে তিনটি কমিটিগুলিকে নিজস্ব অতিপ্রায় অনুযায়ী কর্তৃত্ব ও কাজকর্ম প্রদর্শন করতে পারবে। এতদ আইনকর্তা স্বীকৃতি বিবেচনীয়করণের দ্বারা উদ্ধৃত করে।

১৯২০ সালের আইন জনকল্যাণকর কমিটিগুলির কর্তৃত্ব কর্পোরেশনের হাতে সমর্পণ করে। পরিষদগুলির বাদুহের জন্য বিনামূল্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করার অধিকার কর্পোরেশনকে দেওয়া হয়। এতদ জল সরবরাহের ব্যয়ভার কর্পোরেশনকে তহবিল থেকে বহন করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

গণতন্ত্রের লক্ষ্যপ্রান্ত ১৯২০ সালের আইন দীর্ঘকাল কলকাতা থেকে। ওই আইন কলকাতাবাসীর জন্য গণতান্ত্রিক একটি পৌর-প্রশাসনব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি বহন করে এনেছিল। ব্যবস্থা

উত্তর ছাত্রই প্রশাসন উৎকর্ষ লাভ করে এমন নয়, প্রশাসন জে পরিচালনা করে মানুষ। মানুষের হাতে মানুষের নেতৃত্ব সুতরাং ধ্যানধারণী আইন প্রণয়নে কর্পোরেশন বেশ কিছুকাল বন্ধুতার পরিচয় দেয়। কর্পোরেশন জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানের পরিচয় দেয়, জনস্বাধীনতার কাজকর্ম গতিবেগ লাভ করে। কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য থেকে জাতীয়, আন্তর্জাতিক নানা ঘটনার মধ্যে সমস্যাভাজন কর্পোরেশন পৌরশক্তিরূপে ব্যবস্থাসম্মত গাভীরূপে নিজের হয়ে পড়ে। বৃহৎবা এম চরণে পৌঁছা যে, তৎকালীন মেয়রের অনুসরণে স্থানীয়তার পরের কদমই কর্পোরেশন খাটল হয়ে যায় এম চরণের বিশ্বাসের নেতৃত্বে কলকাতা কর্পোরেশন অনুসন্ধান কমিশন বসানো হয়। এই কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে রচিত ১৯৪১ সালের কলকাতা পৌরসভা আইন। একশতক বাবে একটি সম্মোহন আইনের মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্ক সকল কলকাতাবাসী নাগরিকদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়।

চুক্তির নবর সন্নিধান সাপোন আইন পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত হবার আগে রচিত হলেও বামপন্থি পরিচালিত সরকারের বর্তমান কলকাতা পৌরসভা আইনী কেন্দ্রীয় আইনের অনুসারী হয়েছে বলা যায়। এই আইনী পার্লামেন্টীয় শাসনব্যবস্থার বাঁচে ঘের-ইন-কার্ডিনাল সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রতিষ্ঠান-গণতান্ত্রিক ভরসামোহন বিক থেকে এই আইনী আন্দোলনীয় বিবর্তিত হতে পারে। গণতান্ত্রিকদের যে প্রতিমা সুয়েড্রনাথ তুল করেছিলেন তা আর সত্যক পরিণতি লাভ করেছে।

কিন্তু একথা কি বলা যায় কর্পোরেশনের প্রশাসন আদর্শবাহিনী হয় উঠেছে? এই প্রশ্নের উত্তর আরও ভতরগুলি প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভরশীল। যেমন, কলকাতা কর্পোরেশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কতটা পরিস্ফুট? সরকার, কর্পোরেশন ও রাজনীতির দলের আদ্যাত্ম্য ওইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রতিস্থাপ কার্যকরীভাবে কতটা ত্রিভাষীল? কলকাতাবাসীর পৌর কাজকর্মে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আদ্যাত্ম্য বার-বামিত্ব কর্পোরেশনের আছে কি? পৌর পরিষেবার ঐকিক সাধে ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে বলতে দিগিয়েবে সাহিল করা হয়েছে কি? কলকাতা রহনবলের সময়ত জালা ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ উদ্দেশ্য-সাকক সংযোগগুলির সম্পর্ক কিভাবে নির্ধারিত হয়েছে? অথ সাংহোনের ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের অধিকার কতটা পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ?

প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার নয় এই নিয়ন্ত্রণের সেই। তবে উত্তর খোঁজার সময় কার্যসের একটি উক্তি মনে রাখা বরফরঃ প্রত্যেক গ্রন্থকই পূর্ব-গ্রন্থকগুলির বুজসেজে তরী বোকা বহন করতে কথা হয়। ঐশ্বর্যকেনিক বুজের কিছু বোকা সুয়েড্রনাথ বহন করেছিলেন। আদ্যাত্ম্য করণী না কি ?

সমালোচনার অনুবীকণে সুয়েড্রনাথ

আদ্যর্ক মনে ছলেও সত্য যে, কার্যকরী তত্ত্ব না চিন্তা-ভ্রমনার সময়ে সুয়েড্রনাথের কেন্দ্রসং পরিচিতি ঘটেনি। এটাই অব্য

হাতাবিক ছিল। ডিফ্রিবিং ইল্যোডে ভারতীয় ছাত্রদের পরিচিতি প্রদিক অনুবর্তিত অকলে পৌঁছতে পারত না। লন্ডনে সুয়েড্রনাথ ও তাঁর বন্ধুবর্গের চলাফেরা ঘোটাঘুটি ওয়েল্ট মিনিষ্টার অকলে শীঘ্রকই ছিল। ব্রিটিশ সরকারে শীঘ্রক-উদ্ভাস প্রত্যেক করার সুযোগ সুযোগগুলির হয়ে ছিল, ছিল না। শীঘ্রকই হয়ে পড়া ভেলের স্বেদে মলিন গ্রন্থিদের শব্দে অকলে অকলয়ের রূপ লণেরে অধিকার। ব্রিটিশ শ্রমিকদের বাসস্থানের স্বেদে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, মনিকেন্দ্রীয় পোষণে জরুরিত তামের মর্দভব অবস্থা ও অকলদুর্ভা সঙ্কট সমাক জ্ঞান উৎসব ছিল না। দার্তস এবেলসের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাবাদ, এমন কী সাংঘাধী ইসতেহাও, তাঁর পরিসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ব্রিটিশ শাসকবর্গী সমাজতান্ত্রিক কোনও চিন্তাকৌই ভাবেও প্রবেশে হাতপত্র নিত না। কলকাতার ইন্দিরিয়াল লাইব্রেরি থেকে বিদ্যমানের 'সোশালিজম'-এর মতো বই পর্যন্ত সহিয়ে ফেলা হয়। এজন পরিমিতিতে সুয়েড্রনাথ প্রদুখ বুদ্ধিভীতিসের সাক সমাজতন্ত্রের তত্ত্ববাদের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সম্ভব ছিল না।

এরূপ পরিচিতির অকল সুয়েড্রনাথকে দায়ী ও সরকারের নয়রনীতির স্বেদী চরিত্র সম্পকে স্বেদুহুধী হতে দেখবিন। তিনি ইল্যোডের শহরগুলির ছাত্রত শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষে নিযুক্ত ছিলেন। বংশে ইল্যোডের দুর্ভাষা স্বেদী নাগরিকদের বিস্তারে ও নয়রের প্রশাসনিক ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণে নিঃসর্থেই প্রগতিশীল কুখিতা পাশনে করেছিল। এই স্বেদী বিশাল শহরগুলির বর্গা, গ্রামীণ জনসংখ্যার তুলনায় ন্যূনত্ব বৃদ্ধির বামুদর এম গ্রামীণ জীবনের নিযুক্তিতা থেকে উল্লভযোগ্য পরিচাল জনসংখ্যার সুখিতা। একমিকে যেমন এই স্বেদী গ্রামগুলিতে শহরগুলির উপর নির্ভরশীল হয়ে তুলেছিল, অন্যমিকে তেমন বর্গ ও আদ্য-বর্গের শেপগুলিকে সত্য শেপগুলির উপর, কৃষক জাতিগুলিকে দুর্ভাষা, জাতিগুলির উপর এম গ্রামকে প্রতীচের উপর নির্ভরশীল হয়ে দিগেছিল। এই স্বেদী ইল্যোডের নয়র প্রশাসনকে দুর্ভাষা উপরনীতিক লগতন্ত্রে রীতিপদ্ধতিতে সংহাণিত করেছিল। এরূপ রীতি-পদ্ধতিতে ভারতবর্ষের নয়রগুলিতে প্রশাসনিক ব্যবস্থার গণতন্ত্রীকরণ সুয়েড্রনাথ কাহা মনে করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সময় উপলভি ছিল না যে, উপনিবেশগুলিতে ইল্যোডের দুর্ভাষা স্বেদী বংশে পলিত প্রগতিশীল কুখিতা পাশনে উন্মূখ ছিল না। এ গ্রামে গ্রাম হিসাবে উল্লভ করা যায় যে, ভারতের বাসিন্দা লাভ পর্যন্ত নয়র-প্রশাসনিক ব্যবস্থা জনবলের ক্ষেত্রে প্রধান লজা ছিল ডিফ্রিওঁটার ভারতীয় প্রতিনিমিত্ত পাশনে বিনিময়ে পৌরসভা ও স্থানীয় ব্যক্ততশাসনমূলক অ্যানো প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে যথোদুত কর্তব্যস্থানের ব্যবস্থা করা। কেন্দ্রীয় ও প্রাপনিক সরকারগুলির আর্থিক গতিব্ধের তার লাভব করার উদ্দেশ্যে তত্তাবধিতে বিকেন্দ্রীকৃত স্থানীয় শাসন ও ভারতীয় প্রতিনিমিত্তে বনোহরী মুখোশ পরে ভারতীয় নেতৃত্বক ও জনগণকে সম্বোধিত করতে সক্ষম ছিল। এমন কী, লর্ড রিপনের ১৮৮২ সালের

প্রতিবেশন ও তদনুসারী ১৮৮৪ সালের বর্ষীয় শৌর আইন (আই ৫, ১৮৮৪) এতদনুসারেই একটি উন্নততর সংস্থাপন হিসাবে বিবেচ্য। অথচ লর্ড রিপনের কার্যক্রমকে সুপ্রসন্নতা প্রদূষ ভারতীয় উদারনীতিক নেতৃবৃন্দ ‘শৌরসভ্যতার কুলাঙ্গা’ যেনা পঠন আসোয় রচিত’ হিসাবে বিবেচনা করতেন। ১৮৮৪ সালের আইন শৌরসভ্যতার সঞ্জন, কালক্রম ও বন-বহির্ভূত ক্ষেত্রে কতগুলো মৌল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। এই আইনে সর্বপ্রথম নিম্নিঃ ভাষ্যটির ভিত্তিতে শ্রমসভ্যতা গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। জনসংখ্যা অন্তত তিন হাজার, জনবসতির বনত প্রতি বর্গমাইল ন্যূনতম ১০০০ এবং পূর্ববর্ত পৃষ্ঠদেশের মোট তিন-চতুর্থাংশ অন্তত অ-কৃষিকর্মিত পেশা বা বৃত্তিতে নিয়োজিত থাকলে সফটিক শহর শৌরসভ্যতা গঠনের অধিকার লাভ করত। শৌরসভ্যতার সকল সদস্য নির্বাচিত হতেন। সম্পত্তি ক্রয়ের পান্যপানি জল, অশ্বাশুচি ও রাস্তাঘাট, নব্বা ইত্যাদি পরিচ্ছন্ন-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য তিন প্রত্যয়ের ন্যূনতম কর প্রযোজিত হয়। শৌরসভ্যগুলির কার্যক্রমের পরিধি নিম্নোক্ত দায়-দায়িত্ব সমূহের মধ্যে বিস্তৃত করা হয়—ট্রান্সপোর্ট নির্মাণ, পার্ক স্থাপন, পল্লী-স্বাস্থ্যসেবারগুলির রক্ষাব্যবস্থা, গ্রন্থাগার স্থাপন, গণপ্রয়োজনমূলক সেবা-কর্মের ব্যবস্থা, অগ্নি-নির্বাপক সংস্থা গঠন এবং শৌর আইন অধ্যায়ের অধ্যায় বিজয়ের জন্য বিজ্ঞানসম্মত প্রতিষ্ঠা। ১৮৮৪ সাল পূর্ববর্তী কলেজের-মোহাম্মদ ব্যবস্থা ন্যূনতম আইনের বিধানে অনুমোদিত হলেও সরকারি নিয়ন্ত্রণের ঠাসে শৌর বাহিনীভার কঠোরকর্তারী ব্যবস্থি ন্যূনতম বার্ষিক-উপহারের সম্মোহনে ন্যূনতম করা হয়। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ্য, পাণ্ডিত্যের আলতা, জনসংখ্যার বা বিবর্তিত শৌর সভ্যতার কাল পরিধি শৌরসভ্যতার যে-কেনও প্রত্যয় রপায়ন জেলা হাজিরেট কর্তৃক প্রদত্ত করে যেওনা এবং অযোগ্যতা, কর্মতার অপপ্রভাষ বা কর্তব্য কর্ম সম্পাদনে গাফিলতির অন্তর্ভুক্ত সফটিক শৌরসভ্যতার বিবর্তনের সরকারি কর্মতা। শৌরসভ্যতা নির্বাচনের যোগ্যতার ভাষ্যকর্তী কর্তৃকভার করা হয়।

রিপনের উদার নীতির নামান্বিত ঔপনিবেশিক আয়লাত ১৮৮৪ সালের আইনের পন্যতে সরকারি নিয়ন্ত্রণের কাস পুঙ্খবিত্ত প্রাচ্যেত সক্ষম হয়েছিল। দীর্ঘ অধিকারভার ভিত্তিতে সুপ্রসন্নতা ব্যবস্থাপনার ওই আইনের পন্যতে বিজ্ঞানী বার্ষিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ১৯২০ সালে তিনি বাফের ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞানের প্রথম ভারতীয় ব্রী হিসাবে ১৮৮৪ সালের আইনের বিরুদ্ধে একটি বিল রচনা করেন। আসন্ন প্রাচ্য ভারতে যে, বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এমন ব্যবস্থার বিজ্ঞান রচনা করে যায় বলে—বিলটি সন্মুখের দূষ প্রত্যয়ে পড়ে। প্রায় একশতক শহর ওই বিল স্ব-কসত্তা ওই কাউন্সিলের অনুমোদন লাভ করে বেঙ্গল বিটিনিশিয়াল আইন, ১৯০২ বা আইন ১০, ১৯০২ নামে পরিচিতি লাভ করে।

ঔপনিবেশিক শাসনের কালক্রমের ভিত্তি ওই আইন পন্যতে বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক সূচনা না করলেও সেই আইনে এমনই বৈশিষ্ট্য

“তিনি ডোটাধিকারের সম্প্রসারণ ঘটান, ম্যট্রিকুলেশন পান, পেন্সনরদাতা বা নাইসেগদারী হলেই হল—সবাই ডোট দিতে পারবেন। নারীর ডোটাধিকার প্রবর্তনের তিনিই পথিক্ত।”

হিল যে, একাদিক্রমে হ-লক হয়ে ওই আইন বাংলায় শৌরসভ্যতার পরিচালিত কথায় সম্প্রদায় হিসাবে কর্তব্যী হয়েছিল। নব্বাই-এর পন্যতে কোয়ার্টার বায়ট্ট সক্ষম হতে শৌরসভ্য আইন ওই আইনটির স্থানান্তরিত হবার আগে ন্যূনতম বার্ষিক সুপ্রসন্নতার বদান ওল্লভপূর্ণ পরিবর্তন বিস্তৃত হয় ১৯০০ ও ১৯১০ সালে। ওই বদানের বৈশিষ্ট্যগুলি সুপ্রসন্নতার বদানীয় বায়ট্টসনের দান-বার্ষিক প্রতিফলনে সহজতা করে।

প্রথমত, উপলব্ধতা অর্জনের সঙ্গে পন্যতীকরণের প্রতিফলক সম্পর্কমূলক করে তোলায় তিনি বিজ্ঞানী ছিলেন। প্রাচ্যের শৌরসভ্যগুলির ক্ষেত্রে তিনি তিন-চতুর্থাংশ সদস্যদের নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন, অন্যান্য শৌরসভ্যগুলির ক্ষেত্রে দুই-তৃতীয়াংশের কিছু বেশি।

বিজ্ঞানত, তিনি ডোটাধিকারের সম্প্রসারণ ঘটান, ম্যট্রিকুলেশন পান, পেন্সনরদাতা বা নাইসেগদারী হলেই হল—সবাই ডোট দিতে পারবেন। নারীর ডোটাধিকার প্রবর্তনের তিনিই পথিক্ত।

তৃতীয়ত, ঔপনিবেশিক শাসনের বেড়াফাল সত্ত্বেও তিনি শৌরসভ্যগুলির উপর নিয়ন্ত্রণের বিশুদ্ধতা ও বৈজ্ঞানিকভাৱ অধসন হাট্বে নারীত্ববীল প্রাথমিক সহকর্মের প্রত্যয় ও সম্মোহনমূলক কার্যক্রম প্রদানের পন্যনির্দেশ বিবেচনিলেন। বিজ্ঞানী

**“সুরেন্দ্রনাথ দামিডুলী
নগর স্বাস্থ্যশাসন প্রতিষ্ঠার
প্রক্রিয়াটির সফল পরিণতি
সরকার ও পৌরসভার
সার্থক যৌথ উদ্যোগের
উপর নির্ভরশীল করে
তুলতে প্রয়াসী
হয়েছিলেন।”**

কমিউনিস্টের নিয়ন্ত্রণ কখনও হয় নি। পরিচালিত তিনি অব্যাহত
তারতম্য অনুভবী কার্য সম্পাদনে গর্ব পৌরসভার সচিব
বিলম্বিত অধিবেশন, নিষ্কৃতি কোনও পৌরসভা সভ্য কার্য
ভেঙে নিজে নতুন নির্বাচনের অংশ নান ও বর্তমান পৌর
প্রশাসনের পরিচালিত কর্মনির্বাহী বিচার প্রশাসন স্থাপন সরকারি
নিয়ন্ত্রণ কখনও অগ্রসৃত করেন। ১৯৩৫ সুরেন্দ্রনাথ দামিডুলী
নগর স্বাস্থ্যশাসন প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াটির সফল পরিণতি সরকার ও
পৌরসভার সার্থক যৌথ উদ্যোগের উপর নির্ভরশীল করে তুলতে
প্রয়াসী হয়েছিলেন।

চলুপত, পৌরসভার ব্যবহার সংগ্রহে তিনি দ্বিতী হয়েছিলেন।
যদিও পর অগ্রোপিত হয় তিনি হিসাবের ব্যবস্থা করেন।
সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে তিনি সরকার-মনোনীত মূল্য
নির্ধারণকর্তা হস্তক্ষেপের তালিকা থেকে নির্বাচিত পক্ষপাতশীল
বহিষ্কৃত হস্তক্ষেপ উপর সর্ম্পক করেন। নির্বাচিত সম্পত্তি করেন
অর্থোপেক্ষতার অভিযোগ জনমানের জন্য তিনি পৌরসভার
সেবার্যন, একজন পৌরপতি ও সরকার মানসিত একজন
হস্তক্ষেপ নিয়ে গঠিত একটি কমিটি গঠনের বিধান নিশ্চিত
করেন।

শতাব্দে, তিনি প্রাথমিক সরকারের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত
করার পরিচালিত বিবেচনাক্রমে নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী
ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র রাস্তাঘাট, নান্দা-বর্ধা, অটালিকা, বটি
ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, আলো ও শব্দ সরবরাহের
ব্যবস্থা-বাহিন্য ও ক্ষমতার সম্প্রসারণ নয়, যোগ ও মহামারীর
সংক্রমণ যোগ, পৌর স্বাস্থ্যের নিয়ন্ত্রণ, জল-বৃত্তের নিয়ন্ত্রণকরণ,
বাহ্য-সমস্ত খাদ্য, ঔষধ ও পুষ্টি সরবরাহ, কলাইখাদ্য স্থাপন
ইত্যাদি সম্পর্কিত বহুবিধ ক্ষমতা পৌরসভাগুলিকে প্রত্যাশের
ব্যবস্থা করেন। পৌরসভাগুলির উচ্চিক কার্যকর তালিকা থেকে
পৌর আলমত ও পল্ল্যোদ্যোগ উচিত্য করার সর্বশেষ স্থাপনের
ব্যবস্থার ক্রিয়াকর্ম বিদ্যুত করেন।

যুগ, যাবারি সময় এবং কলকাতা মহানগরের পৌর-স্বত্ব
সংগঠিত করতে সুরেন্দ্রনাথ, বিদ্যোতী নেতা হিসাবে যেমন দ্বিতী
হিসাবেরও ভেতন, একটি মহান গণতান্ত্রিক আন্দোলন দ্বারা অনুপ্রাণিত
হয়েছিলেন। তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের গণতন্ত্রের আদ্যমূল্য
করে তুলতে প্রচেষ্টা হয়েছিলেন। তিনি যখন করেন
বিজ্ঞান-মনস্কতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির দ্বিতী
স্বত্বভার বিচারে পৌরসভার অনুষ্ঠিত সভাগুলির তৃতী। তিনি
কর্পোরেশনের সর্বোচ্চ পৌর চেতনার প্রসূতি সনন এবং সুর
জাতীয়তাবাদের আশ্রয়স্থল করে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিলেন।
গণতন্ত্রের প্রতি যাত্রাভিত্তিক অনুপ্রাণ সুরেন্দ্রনাথকে যথোপযুক্ত
প্রশাসনিক সতর্কতা অবলম্বনে উৎসাহ জোড়ানি। ১৯২৩
সালের কলকাতা কর্পোরেশন আইন নগর-সংস্কার বাস্তব
ক্ষমতা, আইন বিজ্ঞানী ডো বট্টেই, প্রশাসনিকও, কর্পোরেশনের
হাতে ন্যস্ত হয়। ওই আইনের দ্বারা-উপকারগুলি পর্যালোচনা
করলে বিশেষ অতিকৃত হতে হয় এই ভেবে যে, গণতন্ত্র পুষ্কার
জগত প্রভার তীব্রতায় ব্যস্তের সূচী নগর শাসনব্যবস্থার ভিত্তি
জগত অনুমূল্য তৃতী প্রস্থান বার্ষ হয়েই। সম্পত্তির
মূল্য-নির্ধারণ, পৌর নির্বাচন ইত্যাদি করেকটি বিষয় হাতা
সর্বক্ষেত্রে কর্পোরেশনের প্রধান কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা (চীফ
এক্সিকিউটিভ অফিসার) কর্পোরেশনের মূল্যশালী থাকতে বাধ্য
হতেন। কর্পোরেশন ক্ষমতা যখন করলে তিনি ক্ষমতাবান হতে
পারতেন, অন্যথায় হুঁটো জগতায়। আসলে ১৯২৩ সালের আইন
নগরের শাসনব্যবস্থার কার্যনির্বাহী সম্পূর্ণ ন্যস্ত হয়েছিল
কর্পোরেশনের উপর, চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার কার্যত
কর্পোরেশনের অগ্রসর কর্মসূচিতে পর্যবেক্ষিত হয়েছিলেন। তাঁর
ক্ষমতা ছিল না, কার্যই বাস্তবও ছিল না। এরূপ পরিণতিতে
পৌরপতিরা মিছকরাই বৈশিষ্ট্য প্রকাশনিক কার্যকর্ম কার্য
নিয়ন্ত্রণকারি গতিস্থ প্রস্থ করেতে থাকেন। পৌর কর্মসূচির
মিষ্টি ও পদোন্নতিতে তাঁরা হস্তক্ষেপ করেন। কমিটিগুলিকে
ক্ষমতা প্রত্যাশের অধিকার থাকলেও কার্যপ্রাধান্য ক্রম হস্তের
ওই যানের পরিণাম সৃষ্টি হত। কর্পোরেশন ও কমিটিগুলির
সভা কার্যত ‘কবার বোর্ড ও বিল্ডিংস অ্যান্ড’ হতে গঠিত হত।
ইংল্যান্ডে সত্যায়িত প্রকল জগত কমিটি নির্ভর স্থানীয়

স্বাধীনতাসংগ্রামের সাক্ষরতার চ্যাবিকাঠি। এইজন্য জনগণের অত্যাধিক সুযোগ্যতায়ের জনসভায় অংশগ্রহণের ও প্রতিনিধিত্ব করার সক্ষমতা প্রদান কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা ও কর্মিদের মাধ্যমে পরিচালিত কর্মকর্তা সনকসংগ্রামের আদর্শ ১৯২০ সালের আইনে প্রচাণিত হইল। কার্যত যে—শাসনপ্রণালী কায়দার বদল করেছিল তা নূরুৎ, কম্বাটাইন শাসনকর্তা ও বণ্ডিদের বিকল্প শাসন বিচাণীয় কম্বাটাইন কর্মিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ছিল।

সুযোগ্যতায়ের আদর্শ পদ্ধতিগত বিকল্পে জনসভায় শৌর্য নির্বাচন পরিচালনার মাধ্যমে অংশগ্রহণের মাতে ন্যস্ত করেনি। এই আইনের বিধান ছিল যে, ভোটার তালিকা প্রদানে, প্রকাশ, নির্বাচন পরিচালনা ইত্যাদি সবকিছু সনকসংগ্রাম প্রণীত নিয়মকানুনের নির্দেশে অনুষ্ঠিত হবে। পূর্বতন জনসভায় কর্মচারীদের আইনপ্রণালী এই আইনে চিহ্নিত এলিভেইটড অফিসের উপর নির্বাচন-সংক্রান্ত মাধ্যমে পরিচালিত হইত। যা হলেও প্রতিটি শৌর্য নির্বাচনে এই অফিসারকে প্রকাশ নির্বাচন অধিকর্তা হিসাবে মনোনীত করা হত এবং নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মচারী নিয়োগের কম্বাটাইন দান করা হত। ভোটার তালিকা সম্পর্কে অভিযোগ শুনাগিয়ে ওই তালিকায় নূরুৎ ভোটার অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে শাসনের জন্য নিযুক্ত কর্মকর্তা ওই অধিকর্তাই মনোনীত করতেন। উক্ত ক্ষেত্রেই কম্বাটাইন ও প্রচাণালী শৌর্যনিয়ন্ত্রণ প্রকাশ কার্যনির্বাহী অধিকর্তার মাধ্যমে সুযোগ্যতায়ের নির্বাচনী পদ্ধতিতে কুচিগত করে ফেলতেন। হলে প্রতিটি নির্বাচনে তাঁরা নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিতে একইরকম কলংক পরিচিতি সুযোগ শৌর্যনিয়ন্ত্রণ আদর্শ নিশ্চিত করতে পারতেন। এমন হী এমনকি ঘটনাও ঘটেছে হলে অভিযোগ আছে যে বিকল্প প্রাণীকে বিকল্প হলে যোগ্য করা হইবে।

গণতন্ত্রের প্রতি ঐকান্তিক অগ্রহ সত্ত্বেও সুযোগ্যতায়ের ১৯২০ সালের আইনে আট শতাংশের বেশি জনসভায়কারীকে কর্মচারীদের ভোটার তালিকায় সন্নিবেশিত করতে পারেননি। এই আইনের মেডান উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বতন কলংক ওই অনুপাত বর্ধিতহইল চার শতাংশ। সর্বাধ নির্বাচনকর্মকারী সুযোগ ব্যবহার করে প্রচাণালী শৌর্যনিয়ন্ত্রণ ও তাঁদের গোষ্ঠীগুলি নিয়ন্ত্রণের অধিকর্তার মাধ্যমে অত্যাধিক মাতে সক্ষম হইছিলেন।

সমকালীন ব্রিটেনের নগর শাসনব্যবস্থার গণতান্ত্রিক কলংক অনুসরণে প্রতি ১৯২০ সালের কর্মচারীদের আইন জনসভায় নগর প্রাণীনিয়ন্ত্রণ সনক যথোপযুক্ত মাধ্যমে চালায় সক্ষম হইছিল কলংক দায় না। ওই আইনে প্রতিবুল প্রচাণতন্ত্রে প্রকাশনতন্ত্রের কর্মকর্তা ও উক্ত কর্মচারীর মাধ্যমে উৎসাহিত প্রকাশনিক মাধ্যমকর্তা হইলেন ছিল না।

সুযোগ্যতায়ের উত্তরাধিকার

গত কলংক অগ্রহ-নির্দেশ কলংক শৌর্যসংগ্রাম আইন ১৯১১ সালে বিলম্বিত হয়। কলংককারী নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি পরবর্তী হইতে ওঠেন। ভারতীয় কলংককারী প্রতিনিবন্ধ কর্মচারীদের

“আইনসভার প্রীতিপদ্ধতি ব্যবহারে, পরিণীলিত চিন্তা-মননের সৃষ্টি প্রয়োগে, আত্মপ্রত্যয় ও অকাট্য মুক্তির যুগল সম্মিলনে যোদ্ধার নির্মম অগ্রচালনায় অনন্য সুযোগ্যতায় বর্তমান প্রজন্মের এম এল এ—এম পি-দের কাছে আদর্শ।”

সংবাদভুক্ত পরিণত হন। ইউরোপের মাধ্যমে প্রচাণালী ও মাধ্যমকারী শাসনব্যবস্থার মনোনীত স্বাধীন কর্মচারীদের নীতি-নির্বাচন ও প্রকাশের কলংক হইতে ওঠেন। নগর জনসভায় গণতন্ত্রের ওই অনুপাতের গণতান্ত্রিক কলংক আদর্শ উৎসাহিত করি। পদ্ধতি পদ্ধতিতে রোম নিষদ্ধ করলে সুযোগ্যতায়ের অধি-মানবীর বৃত্তি কলংকর কলংক প্রতিবিলম্বিত হয়। আইনসভার প্রীতিপদ্ধতি ব্যবহারে, পরিণীলিত চিন্তা-মননের সৃষ্টি প্রয়োগে, অগ্রচালনায় ও অকাট্য মুক্তির যুগল সম্মিলনে যোদ্ধার নির্মম অগ্রচালনায় অনন্য সুযোগ্যতায় বর্তমান প্রজন্মের এম এল এ—এম পি-দের কাছে আদর্শ কুচিকার মাধ্যমে হিসাবে বিবেচিত হইতে পারেন।

ইউরোপ-চেসনকোর্ড সিটি অনুসরণে প্রতি ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের বিধানে গঠিত হইতে—শাসন বিচাণে ‘স্বাধীনতা’ স্বাধীন স্বাধীনশাসন বিচাণের প্রথম ভারতীয় মন্ত্রী হিসাবে সুযোগ্যতায়ের জনসভায় কর্মচারীদের শাসনব্যবস্থাতে গণতান্ত্রিক করে তুলতে প্রচাণী হইছিলেন। ঐশনিবেদিক মাধ্যমকলংক পূর্ণ গণতন্ত্রের হীল কলংকো ছিল অসম্ভব কলংক। যা সক্ষম ছিল সুযোগ্যতায় তাই করেছিলেন। ইউরোপ-চেসনকোর্ড অনুসরণে মাধ্যমে কর্মচারীদের শাসনব্যবস্থাকে সন্নিবেশিত হইলেন।

**“সীমিত পরিসরে
গণতন্ত্রীকরণ করার কৃতিত্ব
হাড়াও তাঁর রচিত ১৯২৩
সালের কলকাতা পৌরসভা
আইন বিকেন্দ্রীকরণ নীতির
প্রতি তাঁর আস্থা ও
অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির
স্বাক্ষর বহন করে।”**

সীমিত পরিসরে গণতন্ত্রীকরণ করার কৃতিত্ব হাড়াও তাঁর
রচিত ১৯২৩ সালের কলকাতা পৌরসভা আইন বিকেন্দ্রীকরণ
নীতির প্রতি তাঁর আস্থা ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির স্বাক্ষর বহন
করে। সুব্রহ্মনাথ সর্বপ্রথম ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল বা স্থানীয়
কমিটিগুলিকে আইনমত স্বীকৃতি দেন। অর্শোলেখনের এই
কমিটিগুলি পূর্বে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী গরময় সমসয় ওয়ার্ড বা
অঞ্চলগুলির চাহিদা ও প্রয়োজন মেটাতে সক্রিয় হত। প্রথাসিদ্ধ
একজন বিকেন্দ্রীকরণকে তিনি আইনসিদ্ধ বিকেন্দ্রীকরণে পরিবর্তিত
করেন। তিনি আশাবাদী ছিলেন যে, স্থানীয় কমিটিগুলি স্থানীয়
ব্যয়ত্পানসহ বিস্তারে সহজে কৃমিকা গ্রহণ করবে। তাঁর বিশ্বাস
ছিল যে, অর্শোলেখন তখন এই কমিটিগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ বহু
জঘন্য প্রত্যাশ করবে। অনেকটা ঠিক ইংল্যান্ডের হ্যাগা বা
ভারতের গ্রামীন এলাকার ইউনিয়ন বোর্ডগুলির মতো এই ডিস্ট্রিক্ট
কমিটিগুলি স্থানীয় ব্যয়ত্পানসহের ত্রুটিজনক অপব্যয়সহে কেন্দ্রবিশ্ব
জ্যোতিঃকেন্দ্র বা পঞ্চদশের অর্থবিশ্বের মতো কৃমিকা গ্রহণ করবে।
এই কমিটিগুলি শৈর চেতনার কেন্দ্র হিসাবে প্রীতিস্থাপিত করবে
এক বিকৃত হতে হতে এই চেতনা বহুজাত থেকে ব্যয়ত্পানসহের পর্যন্ত
সমগ্র এলাকাকে আপন পক্ষপৃষ্ঠে আশ্রয় দেবে।

সুবেশ্বনাথ সাম্প্রদায়িকতার মনোভাবকে সর্বক্ষেত্রে
পরিহারের পক্ষপাতী ছিলেন। ‘সাম্প্রদায়িক মনোভাব আমাংগের
সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক প্রকোষ্ঠে ভাঙ করে এবং
আমাংগের ক্ষয় করতে শেখায় পণ্ডিত ব্যক্তির মতো, ন্যায়বিচার
হতো নয়; হিন্দু, মুসলমান বা খ্রিস্টানের মতো, ভারতীয়ের মতো
নয়।’ কলকাতা পৌরসভা ছিল আইনসভায় অস্বাভাবিক সময় প্রায়
সকল মুসলমান ও হিন্দুসহিত অ-ভারতীয় সদস্যগণ পৌরসভায়
নির্বাচনে মুসলমান শৌর্যগতা নির্বাচিত করার জন্য স্বতন্ত্র
নির্বাচন-এলাকার মাতিতে সোচ্চার হন। এককিকে নিষ্পন্ন প্রচার
ও মতীপ্র-মেসজের ডিস্ট্রিক্ট-বনিত স্থানীয় ব্যয়ত্পানসহের কেন্দ্রে
সাম্প্রদায়িক প্রতিনির্বাচনের বিরুদ্ধ বক্তব্য এবং অন্যকিকে
সাম্প্রদায়িক নির্বাচনব্যবস্থার মাতিতে টেলিফোন আইনসভা
সুবেশ্বনাথকে সন্তুষ্ট করে। রাষ্ট্রবাসী সুবেশ্বনাথ শেখপণ্ডিত
‘নাথির অসিত শাখা’ করে মুসলমান প্রতিনির্বাচনের সাম্প্রদায়িক
দাবি ও ধর্ম-নিষ্পন্ন নির্বাচন পদ্ধতির প্রতি অনুপ্রবেশের সম্মুখ
বিহান করেন। শ্রীর হু, মুসলমানসহের জন্য সাম্প্রদায়িক
নির্বাচন-এলাকা নয় বরংর বহুজাত থাকবে, তারপর স্বতন্ত্রিতভবে
স্বতন্ত্র হয়ে যাবে।

প্রাথমিকীয় বুঝায়া শ্রেণীর অধিত উত্তর মুসলিম ভিত্তিতে
গড়ে-ওর ধনাত্মিক পক্ষপাতের সমীচতা ভাল থাকতে চুড়
করছিল। কিন্তু তিনি জানতেন, ধনাত্মিক সভ্যতা-সংস্কৃতির
পীঠস্থান পক্ষপাতী কালক্রমে বুঝায়া ও প্রোলেতারিয়েত শ্রেণীর
বহু-সংঘাতে বিপর্যয় অস্বাভাবিক হলে। বিদ্রোহের পক্ষপাতী
নূতন উৎপাদন-ব্যবস্থার ভিত্তিতে নূতন সমাজ গড়ে উঠবে।
হার্ভসের একজন বক্তব্যের তাৎপর্য অনুপ্রবেশ না করে পশ্চিমী
বুদ্ধিভীষণের কেউ-কেউ হার্কসকে পক্ষপাতী বুদ্ধিভীষণী,
প্রায়-বিরাগী, পক্ষপাতীকিত উল্লেখক বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর
হার্কসের দৃষ্টি অতিমত ঘাড়াই না করেই অতিসমীকরণ শেষে দৃষ্টি
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। হার্কসের একটি অতিমত হল পৃথিবীর
সভ্যতা ভ্রাতাভ্রাতার মর্যাদার প্রতিকার সমে ওরপ্রাতভাবে
জড়িত। বিদ্রোহ অতিমতী হল: নগরভ্রাতার বিপুল-সংঘাত
মানুষকে প্রাণীয় বিবুদ্ধিতার মাত থেকে রক্ষা করেছে। বদায়াংলা,
শ্রেণীবিভক্ত সমাজের প্রেক্ষিতে ধনাত্মিক সমাজের নগরভ্রাতার
চরিত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে পদ্ধতির সারবত্তা না বুঝে হার্কসকে
নগরভ্রাতার অস্বাভাবিক শ্রেণীকরণে। একথা অস্বাভাবিক শ্রেণী, হার্কস
ধনাত্মিক অতিমতীর স্বরূপ বিদ্রোহকে মাধ্যমী শিল্পের কেন্দ্র
পক্ষপাতীকে প্রায়ের তুলনায় প্রাধান্য দিয়েছেন।

নগরভ্রাতার মানুষকে মুক্তি দান দে। হার্কসের একজন বক্তব্য
সকল সমাজবিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ ও দার্শনিকেরা মেনে নিয়েছেন
কলা যায়। প্রায় সকল দেশের প্রাথমিক ও প্রাণীয় সভ্যতার প্রতি
মোড়িয়েশের একটি শীর্ষ প্রায় গুরুত্বপূর্ণ যায়। এমন দী,
নগরভ্রাতার শিল্পমণি মাঝিন দেশে। ট্যাম স্বেচকজন,
বোয়ী, হেলভিল, আলান শো এবং প্রীকনের শেখভ্রাতের জন

ডিউ-র সময়বিশেষী বক্তব্য চর্চাওন বেশে একটি বৈদিক বাবা
পুষ্টি করছে। ভারতে বিবেকানন্দ থেকে শুরু করে,
তিসক-অরবিন্দ হয়ে গাঙ্গী পর্যন্ত অনেক পুষ্টিবিশিষ্ট
গ্রন্থ-ভাষ্যের প্রতি বিখ্যাত টান ও প্রত্যক্ষ প্রভা-ভাসবাসা শোভন
করাচ্ছে। গাঙ্গীর লক্ষ্যপ্রতী বহুক্ষেত্রে আত্ম সাধনামে স্থানলাভ
করেছে। শব্দ-সংকুচিত লালিত-পলিত নৈহত সন্তুষ্ট গাঙ্গী-
প্রতি আনুগত্যের তালিমে এই আত্ম লক্ষ্যমণ্ডে প্রতি ফুটিয়েছেন।

চর্চাশেষে বসনাবলী স্বয়ং সুবেশ্রনাথের পরিচিতি না থাকাই
বাক্যবিশিষ্ট। পুষ্টিকোষের বিস্তারিত সূত্রও উভয়েই সামাজিক
পরিবর্তনের সময়-সংকুচিত পুষ্টিকোষে স্বীকৃতি বিবেচনামে।
গ্রন্থকীরণের প্রতি যোগ্যতাই অনুবাস প্রাণের মুক্ত পুষ্টিক অঙ্গ
করে তোলেন। কল্যাণ 'প্রকৃতির স্রোতে বিধে গুলি' বা
সুবেশ্রনাথের 'নাও ফিরে সে-অবগ' গোছের কোনও মনোভাষ
চর্চা বা সুবেশ্রনাথকে কখনও আঙ্গুর করেনি। শিলাচন,
নগরানন্দ ইত্যাদিতে তাঁরা অনিবার্য প্রতিভা হিসেবে প্রকাশ
করেছিলেন।

সুবেশ্রনাথ তাঁর মুক্তচিত্তে কলকাতা ঘটনাপ্রবাহে অবিচলভাবে
পুষ্টিক অনিবার্য জগৎপ্রবাহে পূর্ণতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি
বিলম্ব জানতেন যে, কলকাতার পৌর-এলাকা উন্নয়ন
পন্থার বিপুলতর সূচনাগতিতে থাকবে না। পৌর-এলাকা স্থির
বাক্যের না, নৃতন-নৃতন মনোভাষ এই এলাকার অঙ্গভূত হতে
থাকবে। কলকাতা বঙ্গের নগরানন্দ বিস্তারের ফলে পৌরাজ্যের
সিয়ার্গিট এই পুষ্টিক অঙ্গভূত বিবেচিত হবে সে-সম্পর্কে তাঁর
সম্যক উপলব্ধি ছিল। ১৯২০ সালের আইন পান হবার পূর্বে
তিনি আইনসভার অধিবেশনী করেছিলেন, ওই দিন আসছে এখন
বঙ্গবাস থেকে ব্যাধাকপূর পর্যন্ত বিকৃত অক্ষ-সুবেশ্র একটি
নগর-এলাকার পর্যবেক্ষিত হবে। আজকের কলকাতা ছোট্টপাটিন
ডিগ্টিট সুবেশ্রনাথের মনস্কোকে দেখে বৃহত্তর কলকাতার প্রায়
সমার্থক। সুবেশ্রনাথ শিশুসদৃশ জনপ্রিয় সমাজে নগরানন্দের
পতিপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ইন্দ্রাজ্যের
লাভন-জহেঙ্গী-বারিহেব- লীডন-ম্যানস্টের-লিডার-শেখিন্দ,
হাফিম বুজরাষ্ট্রের উত্তর-পূর্ব সমুদ্রাশ্রয়বাসী প্রকাশ বা প্রকাশ
মহাশয়ার জীবনী এলাকাহিত নগরগুলি এবং জাণানের
টেকিও-ওসাকা-জিয়েজো-নাগোয়া-ইস্রাকাহা শহরগুলির
অবস্থান লক্ষ করে সুবেশ্রনাথ-অনুগমন আশ্রয় হিসেবে কাজে
কলকাতা থেকে বিগ্নি অনুগমন মহানগরীয় বিকাশ কখন করা
যায়।

নগর-প্রকাশন সম্পর্কে সুবেশ্রনাথের পুষ্টিক সম্পূর্ণতায়
প্রতিষ্ঠানিক গঠিতে সীমাবদ্ধ ছিল। তা হাফিম, তাঁর স্থানীয়
স্বাভাবিকতার জগৎ-চিত্র গোষ্ঠীটুকু ইন্দ্রাজ্যের সফলতায় তত্ত্ব
ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিকশিত হয়েছিল। অন্য সুবেশ্রনাথ
স্থানান্তরী ভীষণপথেই লক্ষিম বুজরাষ্ট্র স্থানীয় স্বাভাবিকতার
ক্ষেত্রে নৃতন পটিকা-নিয়াকার লক্ষ্যপ্রতীক হিসেবে পরিচিতি লাভ

করেছিল। ওই দেশের পৌর-প্রতিষ্ঠান বা নগরিকত্বের
পৌরসংস্কার আশোলাভের প্রভা স্ববেশ্রনাথের চিন্তা-ভাবনায়
প্রায় অনুপস্থিত। তবে, সমস্ত কারণে মনে করা যায় যে, ১৯২০
সালের আইনে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা কর্পোরেশনের শাসনতত্ত্ব লক্ষিম
বুজরাষ্ট্রের চেতন-কটিলিম (প্রাচীন কালীনবর্ধী অধিসার-সংঘত)
সমকালে সঙ্গীপন্যতী ছিল।

সুবেশ্রনাথ কুপনু কুপনু পূর পর্যন্ত কলকাতা ও কলকাতার
বিকেন্দ্রীকতা কাহা মনে করেছিলেন। ওই আইনে ডিগ্টিট
কটিলিমগুলিতে কলকাতা প্রকাশ্যে অধিকার তিনি কর্পোরেশনের
হাতে রাখ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অসীম শক্তি হত। নগরকে
প্রকাশ্যে জনগণের অংশগ্রহণের কার্যকরী কোনও ব্যাবা উদ্ধায়ে
তিনি সক্ষম হননি। বিকেন্দ্রীকরণ ও অংশগ্রহণের ব্যাপকটি
ধর্মবীর ত্র্যম্বকায়ের মতো নয়। জনগণের নাম করে ব্যাধা শুরু
করলে শেষপর্যন্ত ত্র্যম্বক পৌছানোর মতো নয়। কলকাতা ও কলকাতার
প্রকাশ্যকরী কলকাতার আইননুলা উপায়ে পটিলকনা প্রকাশ,
প্রকাশ ও প্রকাশ্যেই পটিকা সক্রান্ত সক্রান্ত সক্রান্ত
বিকেন্দ্রীকরণ কাহা না করলে কাহা আশ্রয় বা প্রতিক্রিয়ার গ্রানি
হয়ত করে।

সর্বশেষে উল্লেখ্য যে, সুবেশ্রনাথের ভীষণপায় বাস্তবের চর্চায়
ও নগরবিশিষ্ট সম্পর্ক, নগর-রাজনীতির চর্চায়, বিভিন্ন
আর্থ-সামাজিক ব্যাবহায়ে স্বাভাবিকসম্পর্ক প্রতিক্রিয়াগুলির ভূমিকা,
নগর অঞ্চলে বিদেশি পুষ্টি লক্ষির ফলাফল ইত্যাদি সম্পর্কে
সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অনুবিশ্লেষণে কলকাতা অত্যন্ত
অনুগ্রহীয় ছিল। বর্তমান পটিলীক বাস্তবায়িত সময়ে থেকে হাফিম
নগর-রাজনীতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে হাফিম হাফিম ভিত্তিক
গোষ্ঠী-বৈধা পুষ্টিকোষ, বহুস্থানীয় পুষ্টিকোষ ইত্যাদি গড়ে উঠতে
থাকে। পশ্চাৎপাশি হাফিমবাসী কাহাও বৈদিক হাফিম পৌছে যায়।
তৃতীয় হিসেবে কলকাতার বাস্তবায়িত ও স্থানীয় স্বাভাবিকসম্পর্ক
স্বাভাবিক হাফিম রাজনীতি ও আশ্রয়তত্ত্ব বহুস্থানীয় প্রাশ্রয়
হিসেবে সামাজিককালে বিস্তার লক্ষ্যপৌষি হয়েছে। কল
নিজস্বোচ্চন, সুবেশ্রনাথের নগর-মনস্কতায় এসব গবেষণায়
হাফিম হাফিম।

কলকাতা কটিলিমটি গাট বাস্তবায়িত, নগরবিশিষ্ট ও কলকাতা
নগরাকালে বিদেশি পুষ্টি লক্ষির ফলাফল সম্পর্কে গবেষণা
পটিলকনার জন্য ব্যাধা প্রতিষ্ঠা করেছিল। ভারতের কোনও
রাজনীতিক হাফিমই এমন গবেষণা কেন্দ্র আছে বলে আমার জানা
নেই। প্রাচ্যোচ্চন রাজনীতির পটিলগাঙ্গী হাফিম নগর হিসেবে
চিন্তা-ভাবনা হাফিম হাফিম হাফিম।

মুদ্রাশ্রয়বাসী চিন্তা-ভাবনায় সম্যক বাস্তব বহুস্থানীয়
সুবেশ্রনাথকে খেতে সময়-জগত প্রতিকার প্রকাশ গুণে। ওই
গাঙ্গী কলকাতা অংশগ্রহণ করতে হবে সকল প্রকাশ্যে শহরবাসী
হাফিম। সামাজিক আশোলাভের ত্র্যম্বকায়ের মতো প্রত্যক্ষ করা
যাবে বাস্তব আজকের সুবেশ্রনাথকে। কার্জন পার্কে মুষ্টি নৃতন
শোভনকর অর্থহীন হতে উঠবে কখন?

সুরেন্দ্রনাথ ও কলকাতা পৌরসভা

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা পৌরসভার কমিশনার নিযুক্তি পান। সেই গ্রন্থন এই প্রতিষ্ঠানে নিযুক্তি পান। ১৮৯২ সাল পর্যন্ত তিনি এই পদে ছিলেন। প্রায় ২৫ বছরব্যাপী এই সময়ের মধ্যে তিনি বুঝার বর্ধিত বিধান পরিষদে কলকাতা পৌরসভার প্রতিনিধিত্ব করেন। পরিষদের ভিতরে ও বাইরে যে নির্ভীক সংগ্রাম তিনি প্রতিনিধিত্বাধী হয়েছিলেন তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছিল এবং যে আইনের প্রতিক্রিয়া ২৮ জন কমিশনার পদত্যাগ করেন, তা বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হয়ে আছে। এই কারণে স্যার সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিস্মার (১৯২৫ সালে প্রকাশিত 'এ দেশন ইন দি মেকিং'-এর অংশবিশেষ নিয়ে ১৯৩৯ সালের ১ জুলাই সি এম পেজেটে প্রকাশিত গ্রন্থের ভাষান্তর প্রকাশ করা হল।

সফলতার পৌরবোদ্ধল ঘটনাপত্র

১৮৯২ সালে পরিষদগুলির সংস্কার হওয়ার পরে আমার পক্ষে কলকাতা পৌরসভার সদস্য হিসাবে বর্ধিত আইন পরিষদের জন্য নির্বাচনপ্রার্থী হতে কোনও ভাবনাপত্র বাধ্য হইল না। আরও দুজন নির্বাচনপ্রার্থী ছিলেন—বাহু কলিনাথ মিত্র এবং বাহু ভদ্রগোবিন্দ লাহা। বাহু কলিনাথ মিত্র পৌরসভার বিরোধী পক্ষের অবিসংখ্যকিত নেতা এবং কলকাতায়ে অগ্রগণ্য প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য ছিলেন। যখন কলকাতা মিউনিসিপ্যাল হল (তা পরবর্তীভাবে ১৮৮৮ সালেই মিউনিসিপ্যাল বিলে রূপান্তরিত হল) বিবেচনাধীন প্রীতিতে সরকার কর্তৃক বাংলার আইন পরিষদের সদস্য হিসাবে ঘোষিত হইলেন কলকাতার স্বাধীনতা কল্যাণ জন্য। কর্তব্য সম্পাদনে তাঁর উদ্যম এবং দক্ষতা দেখানোর মতো ছিল। পৌরসভার তিনি সদস্য ছিলেন ১৮৭৬ থেকে ১৮৯০। অন্য ২৭ জন পৌর-কমিশনারের সঙ্গে যখন তিনি একত্রে পদত্যাগ করলেন, সেই সময়ে তাঁর কমিটি, কার্যকরতা, পরিপূর্ণ অকল্যাণ এবং উদ্দেশ্যের সত্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট ব্যাতিপদে উঠেছিল। বাহু ভদ্রগোবিন্দ লাহা অধ্যাপক পৌরসভার সদস্য হিসাবে অংশগ্রহণকৃত কম ব্যক্তিমান ছিলেন। কিন্তু তবুও পৌরসভার কার্যকরতা সত্য এবং আন্তরিক উদ্যম হওয়াও শান্ত প্রকৃতির কাজের মানব রূপে সহকর্মীদের কাছে তিনি সম্মানিত ছিলেন। আমরা বহু বিলাস এবং বহু মতোই পরিশ্রমের সঙ্গে লড়াই করেছি। এমন কোনও তথ্যবিস্তৃতি, বিশেষ বা কোনও প্রকৃতির কোনও কথা এই সব ব্যক্তিগতভাবে মধ্যস্থতায় ক্রম করতে যেতাম হইনি, যার ফলে একটি তিত স্মৃতিতে আমাদের শিখরে ফেলে যেতে হত। যখন নির্বাচন সমাপ্ত হত, আমরা দ্ব্যর্থকভাবে কিছুই থেকে যেতাম এবং পদত্যাগের সাহায্যকারী সহকর্মী হিসাবে বহিষ্ঠ সম্ভাব্যতার পথে চলতাম।

নির্বাচনের পূর্বে থেকে সংস্কার-উত্তর গ্রন্থন আইন পরিষদে কলকাতা পৌরসভার গ্রন্থন প্রতিনিধি হওয়ার সন্ধান

আমি পেলাম। আমার অনুভূতি কি ছিলি ছিল তা কলা মুদ্রিত কারণ, কলিনাথ মিত্র নিঃসন্দেহে পৌরসভার অধিকৃত মানসগণ্য সদস্য ছিলেন। হুতো বা লোক ভেবেছিল জনপ্রতিনিধি হিসাবে আমার উৎসাহের পরিধি ব্যাপকতার ছিল এবং আইন পরিষদের সন্তোষজনক ও সংস্কারের কাজে আমার কিছুটা অবদানও ছিল। আমি মনে করলাম, যে পক্ষের আমার জন্য, সেখানেই সর্বগ্রন্থন প্রতিনিধি হিসাবে বহুতর আইন পরিষদে প্রবেশ করতে পারা অবশ্যই এক মহান সম্ভাবনার ব্যাপার। বিশেষ করে এই আইন পরিষদ গঠন করতে আমার সাহায্যে চেষ্টা করেছিলেন। আইনসভার কাজে সর্বশক্তি নিয়ে লেগে পড়লাম। আমার সেই কাজের তাল-মুখ বিচার করা আমার পক্ষে শোভন নয়। সেসব তো বর্ধিত আইন পরিষদের বর্তমানের সিপিও হয়ে আছে। আমি তবু এইটুকু দাবি করতে পারি যে, আমার সামনে বা-বা সুযোগ ছিল তার সাহায্য করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

আমার গ্রন্থনব্যয়ের কার্যকালের পরে পৌরসভা বিভাগবাদের জন্য নির্বাচিত করে আমাকে সম্মানিত করেছিল। তৃতীয় ও চতুর্থবার আমি যথাক্রমে মিউনিসিপ্যালিটিগুলির দ্বারা এবং তেঁকা বোর্ডগুলির দ্বারা বাংলার প্রেসিডেন্সি বিভাগের মারফত বর্ধিত আইন পরিষদে নিযুক্তি পাই। এই পরিষদে ১৮৯৮ থেকে ১৯০১ একটিনা বছর সদস্য ছিলাম। এটা ছিল একটি অত্যন্ত পূর্ণ ঘটনা।

বর্ধিত মিউনিসিপ্যাল আইন

আমার আশে আইন পরিষদে যে দুটি সময়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন বিবেচনার জন্য এসেছিল তা হল, বর্ধিত মিউনিসিপ্যাল আইনের সংশোধন এবং কলকাতা মিউনিসিপ্যাল আইনের আদল পরিবর্তন। গ্রন্থনটি আইন পরিষদ সংস্কারের পরে গঠিত

“আধুনিক ভারতের সর্বোত্তম বাঙালির মৃত্যুবার্ষিকী তারিখটিকে ভবিষ্যতের বাঙালি প্রজন্ম স্মরণ রাখবে এই শহরের স্থানীয় স্বামত্বশাসনের মৃত্যুর তারিখ হিসাবেও।”

শৌরসভার সর্বোচ্চ কর্তৃত্বকে কথিয়ে দিয়ে এই প্রধান কর্মচাষীকে একটি সংযোগকারী বস্ত্র শক্তি হিসাবে জাগিয়ে তুলতে হবে। কমিশনাররা হত খুশি বড়োয়া দিতে পারবেন, কিন্তু চেয়ারম্যানকে তাঁর নিজস্ব পরিসরের মধ্যে থেকেও স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে এবং শৌরসভার কাছে এর জন্য তাঁর কোনও দায়বদ্ধতা থাকবে না। তা ছাড়া শৌরসভার কর্তৃত্বকে আরও সমুচিত করা হবে ফোনবেরল কমিটি নামে আর একটি সংযোগকারী স্বাধীন স্বত্বা সৃষ্টি করার মাধ্যমে। অবশ্য কর্মমাতাদের প্রতিনিধিত্বের সংযোগসিদ্ধতা অক্ষুণ্ণই রাখা হবে, কিন্তু বিলাট সিঙ্গেট কমিটির দ্বারা পরেলেই লর্ড কার্জনের উপর নবিত্ব থাকবে সর্বোচ্চ নির্দেশ জারি করা যায়। এই বৃত্তমন্ডায় থাকবে শৌরসভাকে প্রশাসনিকৃত করার এবং নিষাধিত সদস্যদের সংখ্যা হ্রাস করে মনোনীত সদস্যদের সন্ধান সমান করার ব্যবস্থা। সভাপতি বেহেস্ত প্রশাসক, সেই কারণেও শৌরসভার প্রশাসনিক অঙ্গ ঘূর্তীভাবেই সংযোগসিদ্ধ থাকবে। এইভাবেই প্রশাসন-বহির্ভূত আধিপত্যের সম্পূর্ণ অবসান ঘটল। লর্ড কার্জনের সরকারের এই একদশের পদক্ষেপের প্রতিশোধে ২৮ জন কমিশনার তাঁদের পদত্যাগপত্র পেশ করেন। এদের মধ্যে অগ্রদূত জ্ঞানীশ্রী সর্বা-ই ছিলেন। সে: বর্তমানে তার জন উদ্ভাবন পদত্যাগের দ্ব্যমকি বেন, কিন্তু বহুত তিনি শেষ পর্যন্ত পদ আঁকড়ে থাকেন। ১৮৯৭ সালে বিলাট পেশ হয়, ১৮৯৯ সালে পেশ হয় এবং ১ এপ্রিল, ১৯০০ সালে বেঙ্গলের আইন হিসাবে স্বীকৃত হয়।

কঠিন কাজের লোক

আমি সিঙ্গেট কমিটির সদস্য হিসাবে। তিন ঘাস হয়ে বিনের পর বিন আদায় কঠোর পরিশ্রম করলাম। অবশেষে

আমাদের বিলাট পেশ করলাম। ১৭ দিন ধরে পরিষদের অধিবেশন বসলো প্রায় বিলাটটি এবং সংশোধনী সুসংকল্পিত বিবেচনা করবার জন্য। অধিবেশনগুলি প্রায়শই বেলা ১টা থেকে ৩টা পর্যন্ত প্রসারিত হত মধ্যাহ্নভোজের জন্য বিরতিসহ। আমি বহু বৎসর ধরে পরিষদের সদস্য হিলাম বটে কিন্তু এতো বেশি করেবতাবে কাজ করতে হয়নি কোনওদিন। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পর্বীকায় বেওয়ার জন্য যখন তৈরি হুজিলাম সেদিনকার কথা মনে হল। প্রায়ই আমি ১টা পর্যন্ত কাজ করতেই পেরে বিন পরিষদের বেলা ১১টায় অধিবেশনের কাজেই জন্য প্রস্তুতি নিতে। কাজ শেষ হয়ে বাওয়ার পর যখন সব উত্তেজনার অবসান হল, সুত হল প্রতিষ্ঠা। আমি মন্তিধের হবে আত্মস্ত হয়ে শ্যাপাটী হলাম। এটা আমার জীবনের কঠিনতম বাকিব অন্যতম। বিল পাল হওয়ায় আগে বিতর্কের শেষ বিন ছিল ২৭ সেকেন্ডের। এই দিনটি ঘরান বাজা বামমোহন রায়ের মৃত্যুবার্ষিকীর তারিখ। আমি যখন সিঙ্গেট থেকে পরিষদের চেয়ারেব থেকে এগোছি বামমোহনের মৃত্যুবার্ষিকীর একটি সভায় যোগদানের জন্য একটি আমন্ত্রণ আমার হাতে এসে পৌঁছল। সেই মুহুর্তে আমার মনে স্রম বিবাহের আবেগগুলি জ্বলত হল। তাই সেবিন শেষবারের মত বিলাট বিবেচিতা হবে আমি বললাম :

“আজ সকলে আমি যখন এই পরিষদের সভায় আসছিলাম ঠিক তখনই একটি চিঠি পেলাম যা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে আজ বাজা বামমোহন রায়ের মৃত্যুবার্ষিকী। আমার মনে হচ্ছিল যে আধুনিক ভারতের সর্বোত্তম বাঙালির মৃত্যুবার্ষিকী তারিখটিকে ভবিষ্যতের বাঙালি প্রজন্ম স্মরণ রাখবে এই শহরের স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসনের মৃত্যুর তারিখ হিসাবেও। যে শহুরে বামমোহন বাস করতেন, তার জন্য তিনি কাজ করে গেছেন, যে শহরকে তিনি ভালবাসতেন।”

উদারনৈতিক আদর্শ

মি: ই এন (পরবর্তীকালে স্যার এডওয়ার্ড) বেকার বিলাটের তারগ্রাণ্ট ছিলেন। তিনি বহু বছর কলকাতা পুরসভার সদস্য থাকার সুবাদে মিউনিসিপ্যাল আইনের প্রণালী সম্পর্কে সম্যক পরিচিত ছিলেন। আমাদের থেকেই তাঁর সহায়কৃতি ছিল এবং তিনি বিলাট মোটেই পছন্দ করেননি। কিন্তু তাঁকে নির্দেশ পালন করতেই হবে এবং চাকুরিতে বহাল থাকতেই হবে। বিলাট পেয়ার স্যার হার্বার্ট রিসলের দ্বারা পেশ করা হয়েছিল। তিনি তখন মিউনিসিপ্যাল সেক্রেটারি ছিলেন। কিন্তু পরে রিসলে সাহেব ভারত সরকারের বরাট্ট সচিব হিসাবে বদলি হওয়াতে মি: বেকারের উপর বাকিই নাহ হল। সর্বকলই তিনি সার্বজনীন মনোভাব দেখিয়েছিলেন এবং বিরোধী পক্ষের অনুরোধে অনেক সুযোগের অনুমতি দিতে আগ্রহী ছিলেন। অবশ্য একটি নির্দিষ্ট বণি ছাড়াই তিনি যেতে পারতেন না।

“আপনাদের নৌকোগুলো পুড়িয়ে ফেলবেন না”

পরিষদে আমার শেষ বক্তৃতায় গ্রিক ভাষে মিঃ বেকার আমার কাছে এসে বললেন, “সুবেস্ত্রনাথ, আপনার নৌকোগুলি ভস্মীকৃত করে ফেলবেন না।” অর্থাৎ সুবেস্ত্রনাথ যেন এখন কিছু না বলেন বার ফলে নতুন আইনানুযায়ী পুনরুজ্জীবিত হওয়ায় পরে পৌরসভার সম্মুখে অংশগ্রহণ করায় সুযোগ প্রত্যাখ্যান করার আখ্যায় প্রতিশ্রুতি হিসাবে এই ভাষণ চিহ্নিত না হয়ে যায়। আমি বললাম ‘সেটা অসম্ভব।’ আরি ১ সেপ্টেম্বর ১৮৯১ খ্রিঃ (যেদিন ২৮ জন কবিশনাব পদপ্রাপ্ত করেন) শৌরসভার বাইবেই ছিলাম। দু-একবার আমার সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য আমার উপর চাপ আসে সুবেস্ত্রনাথ কেন এবং বসিনবিহারী সরকারের কাছ থেকে। কিন্তু আমি অমত রইলাম। নিয়তির এক বিচিত্র পরিবর্তনে কলে আমার উপরই শেষে বর্তমানে য্যাকোবি আট পরিবর্তন করবার এবং শৌরসভার পঠনভরত্রে গণতন্ত্রপ্রসার করে ডোলবার গারিহু।

য্যাকোবি বিল ও কংগ্রেস

১৮৮৮ সালের কংগ্রেসে আমার লর্ড কার্জনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলাম তার সহস্রাবুভিঙ্গী কথ্যভাষার জন্য এবং আশা প্রকাশ করেছিলাম যে তিনি প্রসিদ্ধির পক্ষে এবং জনসাধারণের মধ্যে আশ্রয় সফলতার নীতি অনুসরণ করবেন। পরবর্তী কংগ্রেসের হটমসলারি থেকে আমাদের মধ্যে সর্বাধিক বেশি আলাপচারী হয়েও যে প্রত্যাশা ফেঁসেছিল তা পূন্যে মিলিয়ে গেল। বড়সোটার প্রতিদ্বন্দ্বিতাপন নীতি এবং ভারতীয় জনমত সম্পর্কে তাঁর অপ্রত্যা কুটে উঠল কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল সিলেই কমিটির গুর পার হয়ে আসার পরে যে সব নির্দেশ তিনি আমি করলেন সেগুলির দ্বারা হয়ে। এইসব নির্দেশ কলকাতা শৌরসভাকে আশাভঙ্গীকরণের সহায়ক ছিল। এটা এতই অপ্রত্যাগিত ছিল যে স্যার জন উডবার্নের পক্ষভাবের ব্যক্তিরা কথ্য ব্যাখ্যাকভাবে রটে দিয়েছিল। কিন্তু কেন তিনি পক্ষভাব করলেন না, তা আমরা জানি না। কিন্তু এই ব্যাখ্যারটা কলকাতা শহরকে এক অকৃতপূর্ণ বিচ্ছিন্নতায় পড়ে নিচ্ছেন করে দিয়েছিল। এটা একমাত্র লর্ড কার্জনের প্রত্যাবর্তিত বক্তৃতকের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্নতায় সন্নিবিষ্ট ডুলারি। জনসাধারণ বড়সোটার উপর আস্থা হ্রাস ঘটিয়ে ফেলেছিল। এই অবস্থার হেতুজনব ১৮৯১ সালে লর্ডে কংগ্রেসের প্রত্যাবর্তি প্রতিশ্রুতি হলে। এই প্রত্যাবর্তিই শেষ করেছিলাম। প্রত্যাবর্তি দ্বারা নিরুত্তর:

“এই কংগ্রেস জনসাধারণের সর্বসম্মত বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপন নীতিই নিষা করছে। এই নীতি স্থানীয় স্বার্থে বাসনকে ধ্বংস করবে। একই ধরনের আইন পোড়ায় কাউন্সিলে বসি পান হয় তাহলেও স্থানীয় স্বার্থে আমাদের আদর্শ বিপরীত হয়ে পড়বে।”

(কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল একটি স্থানীয় প্রশ্ন হলেও

“কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল একটি স্থানীয় প্রশ্ন হলেও তার মধ্যে একটা সর্বভারতীয় স্বার্থও নিহিত ছিল কারণ এই ব্যবস্থা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের চিন্তা-ভাবনার মূলেই কুঠারাঘাত করবে।”

তার মধ্যে একটা সর্বভারতীয় স্বার্থও নিহিত ছিল কারণ এই ব্যবস্থা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের চিন্তা-ভাবনার মূলেই কুঠারাঘাত করবে। তার এই স্বায়ত্তশাসনের প্রসারের জন্য সমগ্র ভারতবর্ষই আগ্রহী। সে সময়ে কংগ্রেসের মধ্যে প্রায়শঃই যে সব প্রাদেশিক বিষয় নিয়ে সর্বভারতীয় উৎসাহ পরিলক্ষিত হত সেই প্রসঙ্গগুলি বিচার-বিবেচনা করার ক্ষেত্রেও গড়ে উঠেছিল। তাই কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল নিয়ে আলোচনা করাটা ঐতিহাসিক প্রচার বিরুদ্ধাচরণ ছিল না আসে। আমার প্রাদেশিক সম্মেলনগুলিতেও গ্রিক ডেমনাই তাতে সর্বভারতীয় প্রশ্ন তাদের আলোচ্য সূচিতে অন্তর্ভুক্ত হত। এই পদ্ধতির মাধ্যমে প্রদেশের জনজীবনের সঙ্গে বাকী ভারতে যোগসূত্র বন্ধার থাকতো এবং তা জাতীয় জীবনের সংহতি ও সংবৃদ্ধিকে সাহায্য করত।

কলকাতা শৌরসভাকে ডেটাবিকার থেকে রক্ষিত করার বিষয় আলোচনা যে কংগ্রেস অধিবেশনের কর্মসূচি সেই সভার জীয়ার সি দ্বারা সভাপতিত্ব করাটির মধ্যে এক অন্তর্ভুক্ত বার্থ ছিল। যখন আমরা মিউনিসিপ্যাল বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছিলাম সে সময়ে জীবুত নত ইংল্যান্ডে ছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধার বাগতে উদ্যোগী ছলাম। প্রথমত তাঁর সৌভাগ্যেই ফেব্রুয়ারি ১৮৯১ সালের সেই বিখ্যাত বিতর্ক সংগঠিত হতে পেরেছিল। তার কলকাতা হিসাবে মিঃ হারবার্ট রবার্টস (পরকর্তীকালে লর্ড রাইড) একটি উল্লেখ্য কবিশনের দাবি উত্থাপন করেন এবং তদানীন্তন বিরোধী পক্ষের সদস্য স্যার হেনরি কার্জনের ঘোষণা করেন যে নিষাচিত কবিশনসরা গারিহু পালনে ব্যর্থ হয়েছেন এই ব্যর্থতার ফলশ্রুতি ফেনও প্রমাণ তিনি বুঝে পাননি।

উক্ত বিতর্কের পরে আমাদের দ্বারা আসার উদ্দেশ্য হয়েছিল যে কিছু কিছু সংশোধন হইতো না আসত। কিন্তু এই আশা ব্যর্থ

**“পৌরসভার দাতকে আরও
গণতান্ত্রিক করে তোলা হল
ভোটাবিকারের ভিত্তিক
প্রশস্ততর করা, বহুমাত্রিক
ভোটদান ব্যবস্থা অবলোপ
এবং মহিলা ভোটারদের
সুযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে।”**

প্রদর্শিত হল। লর্ড কার্জনের প্রত্যয়ই স্মরণীয় হল। যে সময়
যারা নিয়ে তীব্র আগ্রহ ও বিকোচ প্রকাশিত হয়েছিল সেইসব
প্রতিক্রিয়াশীল শর্ত সমেত বিসটি আইনে পরিণত হল। এই
খবর পরবর্তীকালের অনেক প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থার সূচনা
হিসাবে সেদিনের প্রকাশনের আলোক অস্তিত্বিত্ব কঁস করে
নিবেছিল। তবিত্বাতের ব্যাপক বিকোচ এবং উত্তেজনার বীজও
এর মধ্যেই নিহিত ছিল।

সুরেন্দ্রনাথের পতন বহরের জনসেবার নৃত্তিকথা ‘এ
নেপন ইব মেতিং’ থেকে আরও এক গ্রন্থ উদ্ধৃতি নিয়ে
বেঙুরা হল। তা থেকে পরিষ্কার হবে কিভাবে ১৯২০ সালের
কলকাতা মিউনিসিপাল আইনকে পাল করানো কেন্দ্রে ভিত্তি
লগাই করেছিলেন।

কলকাতা মিউনিসিপাল আইন

আমি ১৯২১ সালের বার্ষিক মাসে, আমি কর্তব্যের গ্রহণ
করার দু মাসের মধ্যেই, অগ্রণী প্রতিনিধিত্বের একটি সম্মেলন
আয়োজন করি। আয়োজ্য বিষয় কলকাতা মিউনিসিপাল বিলের
সংশোধন। এই সংশোধন অনেক বিন কারণেই করার বরকর
ছিল। বিসটি লর্ড করমাইকলের আলোক থেকেই সরকারের
মাধ্যম ছিল। ১৯১৭ সালে একমাত্র বিসটি উদ্বাসিত হয়েছিল।
কিন্তু তা প্রত্যাহত হল। আমি বিসটিতে আবার চমকা করে
তুললাম। নবপ্রবর্তিত সংস্কারের সঙ্গে সম্মতসে কলকাতার পুর
ব্যবস্থাকে নিয়ে আসবার উদ্যোগ নিলাম। আমি ধাবি করতেই
পাশি যে পুরোন আইনটির সংবিধানসত্ত অংশটিকে পুরোপুরি
নতুন করে সাজালাম। চাপি সংস্কার কর্মসূচির স্বর্গভাসনার সঙ্গে

মিল মেখে নতুন আইনকে ঢেলে সাজানো হল। বহুত এই
নতুন আইনে কলকাতাসেব নিবাসিত প্রতিনিধিত্বের হাতে
পৌরসভার পরিচালনার দায়িত্ব অর্পিত হল। এই পরিবর্তন
জনসেবারগণের ব্যাপক সমর্থনে গুটি ছিল। এর ফলে সাম্রাজ্যের
দ্বিতীয় শহরের পালন পরিচালনার প্রকৃতপক্ষে স্বরাজ্য অর্জিত
হল। পৌরসভার দাতকে আরও গণতান্ত্রিক করে তোলা হল
ভোটাবিকারের ভিত্তিক প্রশস্ততর করা, বহুমাত্রিক ভোটদান
ব্যবস্থার অবলোপ এবং মহিলা ভোটারের সুযোগ বৃদ্ধির
মাধ্যমে। এইগুলি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির প্রতিনিধিত্ব।

সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা

আমি যে বিল উত্থাপন করেছিলাম সেই মূল বিলে কোনও
সম্প্রদায়-ভিত্তিক ব্যবস্থার স্থান ছিল না (লর্ড সিংহের ১৯১৭
সালের বিলে এই ব্যবস্থা ছিল এবং এগুলি আমি সম্পূর্ণ
উপেক্ষা করেছিলাম)। আমি এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক
লড়াই চালিয়ে গিয়েছি। অবশ্য যাতে এই ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে
আইনবদ্ধ না হতে পারে সেই কথা ভেবে আমি বেশকিছু
সাময়িকভাবে এই ব্যবস্থা মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু এটা অসুত
যাশাব যে প্রকৃতির প্রতিনিধিত্বের হাতে বাংলার ১১৬টি
মিউনিসিপালিটিতে স্বরাজ পাট তার হিন্দু-মুসলিম প্যাটের
মাধ্যমে এই ব্যবস্থাই সম্প্রদায়িত্ব করতে চাইলো। ঠাণ্ডা
হিন্দু-মুসলিম ঠাণ্ডা চাইলেন কিং কিভাবে ?
মিউনিসিপালিটিগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ-শব্দ-সংযোগের
প্রকোচে ভাগ করে দিয়ে। এর ফলে তারা একত্র হয়ে তাদের
নিবাসী অধিকার পালন করতে বাধা পেল। ঠাণ্ডা ইতিমধ্যেই
সুত করে গিয়েছেন এই প্রক্রিয়া। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৌরসভার
লোক নিতোগ হচ্ছে। যদিও ভারতীয় জাতীয়তাবাদীরা এই
প্রশস্ততকে জাতি পর্ননের পক্ষে মারাত্মকভাবে কটিকর বলে
গণ্য করেছেন।

একটি বহরের সার্থকতা

কলকাতা মিউনিসিপাল আইন আবার জীবনের একটি
বহরের সার্থক প্রকাশন। এই বিসটি উত্থাপন করে যে বহুত
আমি রেখেছিলাম তা থেকে কিন্তু উদ্ধৃতি নিম্নি:

“মহাশয়, এই বিসটি আবার কাছে একটি ব্যক্তিগত দায়িত্ব
ও আমিত্বের বিষয়। আবার জীবনের একটা বহরের পরিপূর্ণ
সার্থকতা। ১৮৯৯ সাল থেকে আমি হয়ে বেবে আসছি
আমার নিজের শহরের পুনর্জন্মের রূপ নবজন্ম স্বাধীনতার
বেশকুসুম। আমি অধীর আগ্রহ নিয়ে এতদিন বেঁচে আমি
যত্নকে এই রূপ অবলোকন করব বলে। ইচ্ছাকে ধন্যবাদ
যে আমাকে এই ফুটন্ত কৃতিত্বের অংশীদার হবার সুযোগ
দেয়েছি। এই বিলে আমি আবার প্রচারিত আদর্শ ও
নীতিসমূহের প্রতিকলন ঘটতে দেয়েছি—যে সম্ভব জন্য

আমি সারা জীবন কাজ করে যাছি—আজ এক অনির্ভরীয় আনন্দ আমার হৃদয়কে ভরে তুলেছে। আমার বিরুদ্ধে সব খুসো এবং মিথ্যাবাদের সমুদ্রিক জবাব এখন সকলের কাছেই প্রতিষ্ঠিত। বিরুদ্ধকারী অনেক কঠিন ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে, অনেক কঠিন আঘাত হানা হয়েছে। আশা করি সেগুলির ক্ষতি আমাদের আর তায়াকার্ত্ত করতে না। এই সমুদ্রের থেকে আসুন আজ আমরা বেহিমে ঘাই এক সুসংগত ব্রত পালনের তৃপ্তির পূরক নিয়ে, কক্ষা করতে করতে, তিক্ততা তুলতে তুলতে। আসুন আমরা আমাদের সমালোচকদের কাছে সহনশীলতা ও উদারতার হাত বাড়িয়ে দিই। আমি কলকাতার অধিবাসীদের কাছে আবেদন করছি এই কথা হলে বাধ্যতে যে আজকের এই ক্রীতি পরিবর্তনের ব্যতিক্রমী সবকায়ের যে স্বয়ং আমরা দেখে থাকি তারই তিরিহ্বাস। আমাদেই বিনে আইনসত্যগুলির কাছে এটা হয়ে থাকবে আলোকবর্তিকা। এই মহান লোকের মুখোমুখি বসিয়ে আমাদের মধ্যে কেন কোনও কলীর হলেবৃত্তির অপভ্রাতা না পড়ে।"

সূর্যমুখ্যের বৃত্তিকথা থেকে আরও কিছু অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো যা থেকে বোঝা যাবে কলকাতা পৌরসভার চেয়ারম্যানের পক্ষে প্রথম বেশরকারি ভাষাভীরের নিযুক্তি সম্পর্কে সূর্যমুখ্যের বক্তব্যের তাৎপর্ষ

দ্বিতীয় ভাষাবাসানের দ্বিতী হিসাবে আমি যে দ্বিতী অনুসরণ করবো তা হল আমার পুত্রের অধীনে সব বিভাগগুলির রূপম ভাষাভীরকরণ। আমার প্রাথমিক আশংকাসূত্রে প্রথম সারিতেই রয়েছে ভরৎকতা। অন্য সব বিক থেকে সমস্তগাথিত হলে ভাষাভীরই আমার কাছে বৈশি ব্রহ্মবোধ। তবে এই ব্যাপারে সবটাই আমার হাতে ছিল না। অনেক সমস্যা ছিল। তবুও পদবীর সহযোগিতায় আমি অনেক অসুবিধা অতিক্রম করতে পেরেছি। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল শ্রীযুক্ত এস এন মল্লিকের পুরসভায় চেয়ারম্যান নিয়োগের ব্যাপারটি। ১৯২১ সালে দ্বিতী চেয়ারম্যানের বৃত্তি বৈভ্যার কলে আমি শ্রীকে এক গুণ্ডকে শ্রীমল্লিকের বংশি হিসাবে ওই পদে নিয়োগ করি। শ্রীযুক্ত গুণ্ড তখন ভাল কাজ করেছিলেন। এটা অত্যন্ত তাৎপর্ষবর্ণ যে এই প্রথম সিভিস সার্ভিসের একজন ভাষাভীর সদস্য এই উচ্চ পদে নিযুক্ত হন।

শ্রীযুক্ত গুণ্ড যাওয়ার কারণে এখন বৃত্তি নিম্নে আমারে তাঁর একজন উদ্যোগিকতরী পুঁজতে হল। আমি চাইনার শ্রীযুক্ত সূর্যমুখ্য মল্লিককে ওই পদে বসাতে। আমি তখন পৌরসভার এবং আইন পরিষদের নিবাচিত সদস্য। দুটিক থেকে বিরোধিতা

এল আমার প্রস্তাব সম্পর্কে। এক, শ্রীযুক্ত মল্লিক যাকে মাঝেই সবকায়ের বিরোধিতা করতেন। তাই তাঁকে এই পদ দেওয়াটা কি একটা উপচোকনের মতো হবে না? এই প্রশ্নে আমার জবাব: এমনভাবে জিনিব কি ইংল্যান্ডেও ঘটে না? আর ইংল্যান্ডকেই তো আমাদের মতো হিসাবে তুলে বলা হয়। আমার এই উত্তর অবশ্যই সমালোচকদের সন্তুষ্টি করতে পারবে নি। আমি কিন্তু আপত্তি বিচলিত হই নি।

দ্বিতীয় আপত্তি যে শ্রীযুক্ত মল্লিক ব্যবসায়জীবী এবং বক্তা হিসাবে ঘণ্টা উপযুক্ত হলেও পৌর প্রশাসন সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অনতিজ্ঞ। এই বিষয়ে আমার কৈফিয়ত ছিল লম্বোত ভরৎ যখন চাচ্ছেলব অথ নি এল্লেখকর হলেল তখন ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর কিং বা জ্ঞান ছিল? পৌরসভায় দ্বিতী কর্মচারিবা হয়েছেন তাঁরই শ্রীযুক্ত মল্লিককে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করেছেন। বরংকা হল একটা বৃহৎ বিভাগের চুড়ায় এমন একজন ব্যক্তির দায় আরো সুবর্ণপ্রসারী বৃত্তিভবি, নীতি প্রশংসণে দক্ষতা, পুঁটিগাতি বিষয়ে দক্ষল, ইত্যাদি গুণ। মহামান্য পদবীরের কাছে আমার এই দৃষ্টি প্রবোধোদ্য হলে হয়েছিল। তাই তিনি আমার প্রস্তাবে অনুমোদন বিবেচিয়েল।

এই নিয়োগটি অস্বাভী ছিল তাই কেন্দ্রীয় সবকায়ের মল্লিকি বরকার। আমি ভাবত সবকায় ও সেক্রেটারি অফ স্টেটকে অনুমোদন করে শেষ পর্যন্ত এই মল্লিকি আদায় করে আনলাম।

শ্রীযুক্ত মল্লিকের কর্মদক্ষতা ও সাফল্য তাঁর পক্ষে স্বাভীভাবে বহাল হতে ঘণ্টা সাহায্য করল। তিনি প্রাথম কালেন ভাষাভীররা উচ্চতর পদে গুণগাথিত পালনে ঘণ্টা যোগ্যতাসম্পন্ন। পৌরসভার সাধারণ কমিটি আমাকে প্রশংসা করল। এমন কি উদ্যোগভাষাসম্পন্ন সংবাদপত্রও আমাকে অভিনন্দন জানাল।

শ্রীযুক্ত মল্লিক মল্লিকি ব্রহ্ম জ্ঞান করলে তাঁকে পৌরসভায় চেয়ারম্যান পদ হাড়তে হল। তখনীন্ত্রন ডেনুটি চেয়ারম্যান এবং একজন অভিজ্ঞ পৌর কর্মচারি শ্রীযুক্ত সি সি চ্যাটার্জি নিবাসন ছিলেন ওই পদের জন্য। কিন্তু আমি ভাবলাম যে যার বাহাদুর হরিধন বহু (যিনি নিবাচিত করিনায ছিলেন এবং ২০ বছরের অভিজ্ঞতা ছিল পৌরসভার কাজে) যোগ্যতর ব্যক্তি। কিন্তু কিছু ব্যাপটি উঠল ঘটে, কিন্তু আমার হতেই পুঁজিত হল। সূর্যমুখ্য মল্লিকের মতই শ্রীহরিধন বহু আইন পরিষদের সদস্য হিসাবে সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। কিন্তু আমি বরাবরই সরকার-বিরোধিতাকে চারিত্রিক বৃত্ততা ও যোগ্যতার উপরে হুন ঘিরে আছি নি। আমি চেয়ে এসেছি যোগ্যতর মানুষকে কাজে লাগাতে। এর ফলে একটা সুখ মৈত্রিক প্রতিষ্ঠানর সকার হয়েছিল। সংস্কারের কর্মসূচিতে দ্বিতী কল্যাপকর কিছুই ঘেঁষতে পান নি সেই সব সমালোচকদের উপরও এর প্রভাব পড়েছিল।

কালকতী বিত্তমিশ্রণ থেকেই ব্রহ্মণিক ব্রহ্মকের ভাষাকর করেছেন : নির্ভল সিংহ

সুরেন্দ্রনাথ : বঙ্গভঙ্গ থেকে সুরাট-বিভাজন

তু ডাশিস ঘোষ



বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে, ১৯০৬ সালে

সুরেন্দ্রনাথ বানার্জি তাঁর শ্রুতিকথা 'A Nation in Making'-এ নিজের রাজনৈতিক জীবনের তিনটি লক্ষ্যের কথা লিখেছিলেন: (১) "একটি সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব বিধানের জন্য ভারতের সর্ব শ্রেণীর মানুষকে একত্মিত মতো এনে তাদের ঐক্যবদ্ধ করা। (২) তাদের উন্নতি বিধানের জন্য প্রথম অগ্রদূত শর্ত হিসাবে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সৌহার্দ্য ও আত্মীয় সম্বন্ধ স্থাপন করা। (৩) সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতি সাধন করে তাদের আমাদের গণ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা।" এর মধ্যে শেষ লক্ষ্যটি অর্জনের সুযোগ সুরেন্দ্রনাথ শেষে যান স্বদেশী আন্দোলনের সময়। আর তাই তিনি এই আন্দোলনকে "সমন্বিত তৎপরতা ও উৎসাহের" সঙ্গে আঁকড়ে ধরেছিলেন। ১৯০৪-এ লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব সুরেন্দ্রনাথের কাছে বাংলার মানুষের ওপর আকর্ষিত বঙ্গভাষ্য বলে মনে হয়েছিল। তীব্র প্রতিক্রিয়া জন্মতে গিয়ে লিখেছিলেন: "আমাদের মনে এই ভাব জাগল যে আমাদের

অপমান করা হয়েছে, আমাদের অবজ্ঞা করা হয়েছে, লম্বু করা হয়েছে, আমাদের সঙ্গে চালকি করা হয়েছে। আমরা অনুভব করলাম, আমাদের সমগ্র জীবন্য বিপর্যস্ত হতে চলেছে। আমরা আরও বুঝতে পারলাম যে, আমাদের পর ইচ্ছা করেই এই আঘাত হানা হয়েছে। উদ্বেগ হ'ল, বাংলা ভাষ্যভাষী জনগণের মধ্যে যে জন্মবর্ধন ঐক্য ও আত্মসম্মতিসহ স্বেচ্ছা নিবেদে তাকে ধ্বংস করা। যোড়ার দিকে প্রাশাসনিক প্রত্যায়নীয়তার মিত থেকে দেশ বিভাজ্য করার ইচ্ছা থাকলেও, আমরা বুঝতে পারলাম যে এর মধ্যে রাজনৈতিক উদ্বেগের গন্ধও মিশ্রণ রয়েছে এবং একে যদি পাশ হতে লেওয়ার ব্যবস্থা, তাহলে তা আমাদের রাজনৈতিক উন্নতির পক্ষে অসহায়ক হবে; আর যে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপর ভারতের উন্নতি প্রায়শই নির্ভর করছে তাকেও মাফ আঘাত হানবে।" কোনো ব্যবস্থা সুরেন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের শেষে কার্যনি তথা ব্রিটিশ প্রাশাসনের দুর্বিসংস্থি সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন ছিলেন। কিন্তু, তিনি চেয়েছিলেন, "নিরাময়িতিক বৈদ উপায়ে" এর প্রতিকার করতে। ব্রিটিশের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতের পথে নয়।

বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রাথমিক সুরেন্দ্রনাথ কিন্তু তার বাঙালী উদ্বেগ সীমাবদ্ধ করেন জমিদার এবং কিছু "উদারমনস্ক" ইংরেজদের সঙ্গে পরা-পরামর্শে। মহারাজ হেতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পাতৃবিদ্যাবলীর ব্যতিতে তিনি মিলিত হন জাতিগণের মিঃ কটন, "দ্য স্টেটসম্যান" পত্রিকার সম্পাদক মিঃ রাস্ট্রিক্রি এবং "দ্য ইন্ডিয়ান" পত্রিকার সম্পাদক মিঃ চেয়ারম্যানের সঙ্গে। ঠিক হয়, মহারাজ বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব পূর্ণবিপ্লবের জন্য তাৎক্ষণিক লর্ড কার্জনের ভারপ্রাপ্ত শর্তাবলি। সুশীল করা হল যে, প্রাশাসনিক কারণে দ্বা-বিভাজ্য অগ্রদূত হলে বাংলা ভাষ্যভাষী লোকদের এক প্রদেশে রেখে তা করা হোক। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল মুসলমানের জমিদার সূর্যকান্ত আচার্য ঠাকুর। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে, বঙ্গভঙ্গ-বিরাগী আন্দোলনে বাংলার বিংশগামী জমিদারদের অবদান সম্পর্কে অতিরিক্ত কিছু ধারণা রয়েছে। অশান্ত মুমিত সরকারের ব্যবস্থায় থেকে এটা প্রমণিত যে, এরা স্বেচ্ছাশ্রুত শুধু শিষ্টই হ'লেন, সম্পূর্ণ বিপ্লবিত মেরুতে চলে নিবেদিলেন। বাই হোক, নানান আলাপ-আলোচনা থেকে সিদ্ধান্ত হল,

“ব্রিটিশ জনগণের কাছে দেশবিভাগ রদের জন্য আবেদন করতে যাচ্ছি ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন করে—এর চেয়ে মূর্থতা আর কি হতে পারে?”

১৯০৫-এর ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হল একটি জনসভা হবে। আন্দোল বিষয় নিয়ে বিতর্ক চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। সুরেন্দ্রনাথ লিখছেন ঔষধবৈদিক হ্যাভিগ্রেট্ট এবং জেলা হোড ও পুলিশার সদস্য পদ জাম করায প্রত্যয় আসছেনও, তা বাতিল হয়ে যত। এর পরেই এল ‘বকট’ আন্দোলনের ধারণা।

সুরেন্দ্রনাথ সমতলীন পরিণতিতে তুলনা করেছেন সন্তান পত্রীতে ঠালাতে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বসূর্যের অধিগত পরিণতিতে সম। চিন্তা যেভাবে মস্তিষ্ক পলা কর্তব্যে সফল হয়েছিল, তেমনই কৌশলের কথা বাহু সিঁচা ছিঁচা করতে থাকে। ‘বকট’ সুরেন্দ্রনাথের কাছে ছিল দু-বাব ওলাদা প্রবণতার মতো। একদিকে তা বেশির শিশু আন্দোলনের উদ্দেশ্যে জগাবে, আরো অন্যদিকে এটা রক্তচৌকি হাতিয়ে ফিল্মের ক্যামে আসবে। কিন্তু তিনি, সার্বভৌম সন্তক পত্রিকার নিয়ে চলার নতুনপাঠী ছিলেন। বঁট ‘মডার্নিটি’র মতই তিনি মনে করতেন যে, ব্রিটিশ জনমতের কাছে যথার্থ আবেদন পৌঁছে দিতে পারলেই, তাহলে ব্রিটিশ সরকার কোম্পানির পড়ে শিঁচু হটতে বাধ্য হবে। তাই এমন আন্দোলন করতে হবে, যাতে তা ব্রিটিশ-বিরোধী না হবে ওঠে। স্মৃতিকাব্য সুরেন্দ্রনাথ লিখছেন: ‘ব্রিটিশ জনগণের কাছে দেশবিভাগ রদের জন্য আবেদন করতে যাচ্ছি ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন করে—এর চেয়ে মূর্থতা আর কী হতে পারে?’ তা; অমলেন শ্রীশ্রী সঙ্গীত মন্তব্যই করেছিলেন যে, ‘সুরেন্দ্রনাথের বিষয়ে কলকাতা প্রতি পত্রী অভিযোগ (বকট) প্রতি ব্রিটিশ জনগণের নীতি অকলঙ্ক করাই ছিল বকটের অধিষ্ঠিত লক্ষ্য, বাক্যই তা করে কলকাতার অধিষ্ঠিত লক্ষ্য করলেই বকটের প্রয়োজনও বুঝেই।.....সুরেন্দ্রনাথ তারকটরী ছাড়াই

বিকল্প উদ্দেশ্যন করতে চাননি।’ আর ‘বকট’ হল একটি ‘সামাজিক কর্মপত্র’। নাক্ষত্রিকের দিককে এট ‘মডার্ন ল্যাভি’তে অংশে চলকটী ছাউনহাউসকীমেয় কর্তি ছিল না। লাল্লা লাতপৎ ধাত জাফীন ভাষায় বলেছিলেন যে, ‘বকট’ টান না লড়াইে হালচীমেয় অলিভেরেব প্রতি ব্রিটিশদের দৃষ্টি তখনও অকর্ষিত হবে না। তিলক, বিনয়চন্দ্র ও অরবিন্দের কাছে ‘বকট’ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল দুটি: (১) ব্রিটিশ কলকাতার সওদাগরদের ওপর বৈরিতিক রূপ সৃষ্টির মাধ্যমে লজ্জার মতেইবেব ওপর প্রভাব বিস্তার; (২) এই আন্দোলনের মাধ্যমে ব্রিটিশ প্রতিব ‘না’ দৃষ্টিভঙ্গ। রক্তচৌকী আস করেছিলেন যে, ‘বকট’ বেশাবীতে সংগ্রামে জাা প্রাণের মতই উচ্ছ্বলিত করবে। তিলক বকটকে বলেছিলেন ‘বিরুদ্ধাচের মের’। বকট আন্দোলনকে দিয়ে অমৃতপূর্ব উদীপনার পরিধিই সুরেন্দ্রনাথও লক্ষ্য করেছিলেন। এই আন্দোলনের ‘সাক্ষা’ প্রব করে মনে হয়েছিল ‘এক মডার্ন অলিভের’। তখন রক্তচৌকির চেহে যে আন্দোলন সৃষ্টি হয়, তা তিনি কিছু টুকরো ঘটনা বরণর ছেঁচা করেছেন: ‘আমর মনে আছে বিনয় কলকাতাটো খুলেব একটি চতুর্ন শ্রেণীর হাত বিলম্বি কাগজে তেইব একটি মর্ট পড়ে খুলে এসেছিল। বৈরাহ্য তা অন্য ছাত্রের নজরে পড়ল, সেই চাইই তা শিখন বিক থেকে টেনে ছিঁচে ফেলে দেওয়া হয়, অতঃব জা ছেঁচিটে আরও নিম্নেই হাত থেকে বেহাই গেল। বিনয় কলকাতের ছাত্রেরেব পরীক্ষা হাছে, কলকাত কড়ক ছাত্রের মধ্যে বিলম্বি ক্যাগজে তেইব উত্তরমত বিতরণ করেন; কিন্তু ছাত্ররা সে ক্যাগজ পূর্ণও করল না। এত প্রবল ছিল তাদের মনোভাব যে, তাকে উল্লেখ করা বিলম্বনক বলে মনে হল। তাই দেশে প্রভত ক্যাগজের ব্যবস্থা করতে হল। তারপরে বৈরাহীত পরীক্ষা চলতে থাকে।’

১৯০৫-৫ ১৬ অক্টোবর বকট কার্যের ঘোষণা করা হল।

তাইসরে লর্ড কার্জনের মনোভাব ততদিনে ধ্বংসীয়েব ওপর ব্রিটিশের তিক হয়ে উঠেছে। ১৯০৫-৫ ২৫ মার্চ ব্রজসিংহক লেখা একটি চিঠিতে তিনি বকট-বিরোধী আন্দোলনকে তীক্ষ্ণ বাধ্যবদ্ধ ভাষায় চিহ্নিত করেছেন—“petty Volcanoes who scream and screech and throw their torrents of mud into the air” হিসেবে। সামান্য ভুল করেছিলেন কার্জন। ধ্বংসী আন্দোলনের অমৃতপাত এত জটিলতার নিয়ে ছিল না। ১৬ অক্টোবর দিনটিতে ‘ভোড ও দুঃখের প্রতিক হয়ে ভোলবার জন্ম’ শুরু হল আন্দোলন। বোম্বেরদার বালক তার ‘মুক্তির সন্ধানে ভ্রমত’-এ লিখেছেন যে, ‘বকট কার্য বাঙালির হনতট্টে...পতীয আঘাত নিচ্ছেল...। সুরেন্দ্রনাথ ধর্মমূলক পরিকল্পনাগণে ‘অখও বকটক’ পড়ে তোমার প্রভাব বেন। তিনি পার্বিনে ‘হোটেল দ্য ইনভার্সিট’-এ হাফোর প্রত্যেকটি প্রদেশের প্রতীক স্বরূপ এক একটি দৃষ্টি দেখেছিলেন বেশাবীনের সমগ্রি রক্তের গরণাশে। আসনাল-গোরেইনের প্রতীক দৃষ্টিওলা ছিল লুকোনা ও

“সুবেজনাথের ধারণা ছিল যে, যেভাবে উৎপীড়ন চালিয়ে বরিশাল সংশ্লেন ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল, তার থেকে ‘অরাজকতাবাদী আন্দোলন’ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল।”

প্রতিরোধ বা ‘passive resistance’-এ কথা বলতে শুরু করে। ১৯০৭-র অক্টোবরে শ্যামাচাঁদ কৃষ্ণদাসী তার ‘principle of dissociation’ উপস্থাপন করেন। বিদ্যালয়, আমলত, চাকরি বরকতি এবং সুবর্ণপরি ঘরঘট সংঘর্ষের প্রত্যাহ দেওয়া হয়। ১৯০৪-র আগস্টে সিন্দে বিরেটাস, অ্যালবার্ট হল এবং গ্রাও বিরেটাসের সভাপ্রসঙ্গে সন্ত্রাসের উপস্থিতি, চাকরি ও শিক্ষা বরকতি কথ্য হলেন রমণপুত্রী। প্রমথবাবু উপস্থাপনের ‘সন্ধ্যা’ পত্রিকা (৭ আগস্ট, ১৯০৪) সুবেজনাথ অধ্যক্ষিত ৬ আগস্টের টাইম হল’র সভাকে প্রতিবাদেব নামে ধারণ’ হিসেবে চিহ্নিত করে। হোমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের যোজনাবাস থেকে জানা যাচ্ছে যে, ১৯০৬-র ৩১ জানুয়ারি টাইম হল’র সভায় রমণপুত্রীর ‘ভিক্ষাবৃত্তির রাজনীতির প্রতিবাদে কলকাতায় বিভিন্ন কারখানার প্রাকার্ত লাকানো হয়, যাতে দেখা ছিল: ‘বংশীণী তুলিয়া, অজ্ঞা আকারে বিবিধি সন্ধ্যাবে বিজ্ঞাব জন্য টাইম হল যাওয়ার কর্তব্য আছে’। ১৯০৬-র ১০ জুলাই কলেজের আদায়ী অবিকেশনের জন্য অজ্ঞাব্য সাহিত্যি গঠনব সভায় বক্তৃতা উঠল। হুজিলাল ঘোষের সভাপতিত্বে সভা শুরু হল সুবেজনাথ ও তার বিরোধীরা শান্তিই নু তাহে ভাগ হয়ে যান। সুবেজনাথকে সতর্কন করেন সুশ্রাব্যনাথ ধনু, যে টেমুটি, এ টেমুটি, যে ঘোষণা, ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ অজ্ঞাব, ডাঃ মীলরতন সত্কার, সি টেমুটি, কলিপ্রসাদ কামাখিয়ার, এবং এ এই গল্পবতী। অদ্যিকি বিপিনচন্দ্র পাশকে সতর্কন জানান চিত্তরঞ্জন দাস, এ সি ঘানসি, যে এন মার, যে এন ঘোষ, মীলপতি চারটোমি, পাঁচকবি ঘানসি, এস এন কলমর ও এস জার

দাস। বিতর্ক তুয়ে ওঠে এখন চিত্তরঞ্জন ঘনেন—“সুবেজনাথের কাগ্রেসকে মিথ্যে সম্পত্তি বলে চলে কলা ঠিক হয়।” এংশেই টেমুগোলে সভা ছেড়ে যায়। ১৯০৬-৭ ৪-১২ জুন তলকতাব রমণপুত্রী ‘শিবাজী-উৎসব’ সংক্রান্ত বিষয়ে তিলকের সাথে অগোচরাকলীন তাকে আসামি কলেগ্রস অভিধনের সভাপতি করার সিদ্ধান্ত নেয়। রমণপুত্রীরা এটা কানচাল কথায় জন্য দালাতাই নৌদমীর নাম প্রস্তাব করে। প্রবীণ, প্রাচুর্য এই নেতাকে বিয়ে সংকীর্ণ বলসমিতি জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা ছিল না রমণপুত্রীর। তাই তারা এবারও শিষ্টা ঠিকেন। তবে, তলকতাব কলেগ্রস অভিধনের সময়েই ‘অবিভাল বটল’ বা ‘বিট পট’ বা ‘সানপটী’ হলেন।

১৯০৬-৭ ১৪ এপ্রিলের বকিলাল সংশ্লেনের ঘটনা সুবেজনাথের মনে গভীর ছাপ দেয়েছিল। এই সংশ্লেনের সঙ্গে তিনি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়েছিলেন। এখানে ব্রিটিশ পুলিশের বেশবোরা নির্মাতেন সুবেজনাথের মত পাড়া নড়াবোটে’রও ইংরেজের শ্রুতসুখি ওপর আস্থা ছিলে দিয়েছিল। আছকখনে তিনি লিখছেন: ‘পূর্ববঙ্গে সত্য্য সৃষ্টি করে কেশবিত্তক বিবেচী আন্দোলনকে পিছে ধরাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। আর সেই সত্য্য মীতিরই অধীভূত হল এই পথিকতন। এই মীতির পবিত্রত পদ্ধতিতে তারা অনুসরণ করেছিলেন আন্দোলনের মন করে নিশ্চিত করার জন্য। কিন্তু সে হল যুগলানায়। গল্প-মীতি কোথাও সফল হয়নি, এখানেও নয় না। এতে জনমত তবও প্রতিপালী হল এবং তাদের সঙ্কল্পকে তবও দৃঢ় করে তুলল। পুলিশ একমাত্র সুবেজনাথকেই প্রেরণ করেছিল। মার্কিন্টেট এমার্সনের উচ্চপ্রাণু আদরণে বিতর্ক করে ধাঁড়ানো সুবেজনাথকে আমলত অবমানতার হারে দু’শ টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া ‘বে-আইনী’ শোভাযাত্রা পরিচালনার লগে আর দু’শ টাকা, অর্থাৎ মোট রামশ টাকা দিয়ে সুবেজনাথ শেষ পর্যন্ত মুক্তি পান। তবে বকিলাল সংশ্লেনে অসমাপ্ত থেকে যায়। উল্লেখযোগ্য যে, এখানে সুবেজনাথ ও বিপিনচন্দ্র পাল এতই মত থেকে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এংশের তারা অংশ পূর্বক পৃথকভাবে পূর্বক সভার বেহিয়ে পড়েছিলেন। বিপিনচন্দ্র ও জয়বিন্দুর প্রেক্ষণে সন্তুষ্ট এই সময়েই প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা অনুশীলন সমিতি।

সুবেজনাথের বালা ছিল যে, যেভাবে উৎপীড়ন চালিয়ে বরিশাল সংশ্লেন ছেড়ে যেওনা হয়েছিল, তার থেকেই ‘অরাজকতাবাদী আন্দোলন’ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। এই ‘অরাজকতাবাদ’ের প্রতি তাঁর কোন সহানুভূতি ছিল না। অন্যদিকে রমণপুত্রীরাও তখন অবও অক্রমশক্ত হয়ে উঠেছিল। অমলেন ব্রিটিশী লিখছেন: “১৯০৭-এর মার্চে বঙ্গভাট মিটেব হবার পূর্বকর সঙ্কর করে সুবেজনাথ এসেছিলেন তাইসরর প্রাসাবে। উদ্দেশ্যে বিপিনচন্দ্রের বিরুদ্ধে সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁকে অনুজ্ঞেব জানানো। অমলুগেব সশ্রুটি চতুর্থ মেম্বরী ‘কানোনো’তে পোপের কাছে অনুজ্ঞেব মাথা ঠেট করে যাওয়ার

যত এই আন্দোলন চরমপন্থীরা সুযোগ্যতাকে উপায় কিংবা হাতিয়ার করে। যেমিনীপুরে প্রাথমিক সত্বেসনে কুম্ভ চরমপন্থীদের নেতৃত্ব দেন অরবিন্দ। ইতিমধ্যে সুযোগ্যতাকে অরবিন্দকে বিজ্ঞেয় শুধু বাংলায় কংগ্রেসে অনেকে সৃষ্টির অভিযোগই করেন নি, তারা অন্যান্য প্রদেশেরাও জীবন ন্যবেশ রক্তপাতের মধ্যেও তাঁকে জড়িত করেন। উল্টো অরবিন্দ তাঁর বিজ্ঞেয় জেলা পুলিশের সহায়তায় চরমপন্থীদের মধ্যে সহস্র সৃষ্টির অভিযোগ করেন। সুযোগ্যতাদের স্বাভিজ্ঞাচার যেমিনীপুরে সত্বেসনের যে কল্যাণ হচ্ছিল, তাতে কংগ্রেসের ছেঁচ ইতালিই যে। অট্টে উল্লেখ: 'প্রিন্সিপাল "বিশ্বাস, উপদেশ" জ্ঞানোত্তর করে যে তরুণরা "বে-আইনি" পথে চললে, তখনই তিনি যখন কংগ্রেসে পরিচিতির পিতামহ। এখানে বেশ-তর্কিত সন্দেহে অবলা সুযোগ্যতাদের যখন কোনও সংশয় ছিল না।

সমসাময়িক চরমপন্থীরা কি চোখে দেখতেন সুযোগ্যতাকে? কবীন্দ্রকুমার ঘোষের আত্মকথনিয়ে একথা এ প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য: 'অরবিন্দ এত ছিব্বার রাজনীতিক কুম্ভাল, অসম্পাদ্য-নেতা সুযোগ্যতাকে কখনও লোকহস্তের কাছে যাবা নিত। কবিতা দিয়েই নাই, তামস অর্থাৎ ছেলের তিনি ছিলেন কামাল রাজ, এতদিন লাগি হাতেই গরু চলাইতেন। আজ বেশ গোজ্ঞর দুঃখের মানুষ হইতেন, আজ সুযোগ্যতাকে উপায় পথের গজ হওয়া। ১৯০৭-৮ খ্রিস্টাব্দে সুদীর্ঘ অত্বেসনে "সহর" ও "গরম" বলের মধ্যে সংঘাত চলে পৌছিল। সভাপতি হিসেবে বাসবিহারী ঘোষের নাম প্রস্তাব করার জন্য সুযোগ্যতাকে হস্তে উঠে পাকতাইই চরমপন্থীরা যখন যখন দেখতেন তখন তখন তখন বাসা ছিলেন। কখন, তারা চেয়েছিলেন তিনজন সভাপতি হন। সুযোগ্যতাকে বাকুলতা আর চেহারা, জুতো ছোঁকছুঁড়ি সামলাতে শেষ পর্যন্ত সম্মেলনমণ্ডলে পুলিশ ডাকতে হয়। সুযোগ্যতাকে শেষ চেষ্টা করেছিলেন একটা মিটিংয়ে। বাংলায় প্রতিদিনের নিয়ে সভা বসল তার বাড়িতেই। কিন্তু, "সবাই সেখানে উদ্বাস, উদ্ভাস, ব্যস্ত সচর, সবাই যেন একটা কি হাওয়াটা গাঢ়। যেন বেশ লম্বা তলে কাঁচা সন্তোষ কোথায় হুগে চড়া করিয়া তার খিঁচিয়াছে,..." উভয় গোষ্ঠীর তীব্র নেতারা হাফিজ ছিলেন সভায়। সুযোগ্যতাকে বাংলায় প্রতিদিনের একসঙ্গে চলার আবেশন কামালেন। কিন্তু চরমপন্থীরা অন্যতম: সুযোগ্যতাকে আগলে অধিকাংশমান হুগুয়ার একটা সমাজতান্ত্রিক তৈরি করেন। কিন্তু চরমপন্থীরা আসে সেই কলতে নয়। শেষ পর্যন্ত বিহারী সভাপতিত্ব বসু (যিনি রাজস্বাধী নরেন্দ্র গোস্বামিকে হস্তা করে উল্লিখে প্রায় পেন) সমাজতান্ত্রিক স্তিতে কেন্দ্রন। বহিঃপ্রবর্তন এইরকম: "...বিহার-উল্লস বজ্রাধী পেন। যখন সে বড় হইতে অরবিন্দের পক্ষভেদে আসে। বহিঃ হইতেই, তখন একজন হোমরা-চোমরা খুব বড় ফলজ-মেতা হাত বাকিয়া বসিতেন। "অরবিন্দ ঘোষ তিনজন ও বাও, ও বাও।" সুযোগ্যতাকে তাঁর স্বাভিজ্ঞাচার এই তিনজনকে একিৎ পেলেন। তবে তিনি স্বীকার করেছেন সুদীর্ঘ অধিবেশন কংগ্রেসের ইতিহাসের পৃথক অধ্যায়ের ইতি টেনেছেন। চরমপন্থীরাও তা-ই যেন করতে। তাদের মধ্যে ছিল বহুজন মুক্তি আনন্দ ও উত্তেজনা: "এত দিন পর জাতীয় জীবনের বাটে-কাঁচা বজ্রায় মাঝ-বহিয়ার তুলনি টেউ আসিয়া লাগিয়াছে। বড়-বড় খিঁচিয়া বজ্রা আজ বড়ের হাতাল উল্লস; পাল নাই, গুণ নাই, গাও নাই, ফল নাই, আরে শুধু জোয় বাতল, পাগল টেউ আর কুম্ভীনের পথ। শুধু অগ্নিগোলা বজ্রাধী আর আনন্দ, কাঁচা বাটের আওতা ও অর্জনের ফল কাটানোই আর জীবন;..... ভরা জোয়ারের এই টান, এই শ্রমস্ত পতিই পথন করিয়া চলিলেই কুল খিঁচিয়েই চলিলে, এই তখনকার গরর পলের হন।" নিয়ন্তাত্ত্বিকতার আধীন অনুপ্রাণী সুযোগ্যতাকে যে কখনওই ছক-কাঁচা রাজনীতির বাইরে বেরিয়ে পড়েননি, সেটাই ছিল স্বাভাবিক। তবে এটাও জানতে হবে যে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির পরিবর্তিত আবহুকে কলতে পড়েন নি। কিংবা কলা ভল, কখনও সেভাবে কলতে চানও নি।

নির্বাচিত গ্রন্থসূচি

1. A Nation in Making: Surendranath Banerjopadhyay. বর্তমান রচনা যে বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু হুগু, এ নেতা হুগু—কবীন্দ্রকুমার ঘোষের অনুবাদ "অট্টে সুযোগ্যতাকে পুস্তিকা" (পশ্চিমবঙ্গ পুস্তক পলি প্রকাশন) থেকে। কলকাতা / ১৯৮১।
2. Surendranath Banerjee: His Political Ideology—S. R. Bakshi, Delhi: 91.
3. Moderates and Extremists in the Indian Nationalist Movement, 1883-1920: with special reference to Surendranath Banerjee and Lajpat Rai: Daniel Argov; Calcutta / 64.

4. The Swadeshi Movement in Bengal—1903-1908: Sumit Sarkar, Calcutta / 73.
5. Tilak and Gokhale: Revolution and Reform in the Making of Modern India: S. Wipert, California / 62.
6. স্বাভিজ্ঞাচার মুক্তিগোষ্ঠী চরমপন্থী পথ: অরবিন্দ গুপ্তা, (The Extremist Challenge—এ অরবিন্দ—বিজ্ঞ ৭৪) কলকাতা / ৮৭।
7. মুক্তি সন্তান রক্ত: হেডলিয়ার বসু, কলকাতা / ১৯৭৭ বঙ্গ।
8. বহিঃপ্রবর্ত অরবিন্দ: কলকাতার কুল—কবীন্দ্রকুমার ঘোষ, কলকাতা / ১৯৮০ বঙ্গ।
9. Modern India, 1885-1947—Suma Sarkar, Delhi / 83.

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা

বীথের বন্দ্যোপাধ্যায়

রাষ্ট্রের সত্যের দৃষ্টিতে হন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
তাকে বলা হত বঙ্গের নুতুনীন বাহা। বঙ্গের
গণচেতনার উদ্ভব ঘটিয়েছিল হাদীনতা আন্দোলনের
সময় থেকে। তার জন্য সুরেন্দ্রনাথের বিরাট দান ছিলেনভাবে
স্বদেশীয় হয়ে আছে।

অধ্যাপক অমলেন দ্রিগাটী লিখেছেন: "...সুরেন্দ্রনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক "নান্দাল কমন্সহেল" প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয়
কংগ্রেসের উপর অত্যন্ত কালের মধ্যে তাঁর ইথিগিট প্রভাব বিস্তারে
ইংরেজ আমলারের কাওসি লিখেব আরও থেকে যায়। লর্ড রস
কেনও থিনই কংগ্রেস নেতৃবর্গকে সুসজ্জবে দেখেননি। তাঁর হত
ছিল এরা জনসংগের গোহাই বিবে নিজেব নিজেব কৃত্ত কার্থ সিদ্ধি
করতে চান। জর্জটিন সুরেন্দ্রনাথের অনুগামীদের কাওসে শ্রবণ
হয়ে "অবিকল্পের কিত্রে ও অতন্ত্রনের উপলব্ধি" হাতা আব কিছুই
ভায়েত পারেননি।..."

হাদীনতা আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথ

হাদীনতা আন্দোলনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে সুরেন্দ্রনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাবের কথা সুভাষচন্দ্র বসু উল্লেখ করেছেন:
"অবশিষ্ট থেকে সম্পূর্ণ এক পুথকে ধরনের ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায়, তিনি এক সময় কালের নারক ও অন্ধশাই ভারতীয়
জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম প্রাণী ছিলেন। কলকাতা টাউন হল
বন্ধিন আফ্রিকার মহান্দা গাভীর সত্যাত্মই অভিযানের ব্যাপারে এক
সময় তাঁকে আঘি প্রবণ দেখি। সুরেন্দ্রনাথের তখনও পূর্ণ
প্রতিপত্তি এবং তাঁর উদার কঠোর ও হৃদয় সন্মুদ্র বহুতরার সাহায্যে
তিনি সমগ্র প্রান্তর অর্থ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।..."
বিশিষ্ট পণ্য বর্জনের কথা নিয়ে লিখেছেন সুভাষচন্দ্র বসু।
হাদেশী আন্দোলনের আন্দোলনের কর্মসূচির মধ্যে সুরেন্দ্রনাথের
নেতৃত্ব ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সুভাষচন্দ্র বসু লিখেছেন:
"...সুভাষ লোকমান্য তিলক, কালার অরবিন্দ ঘোষ এবং
বিশিষ্ট পণ্য-এর মধ্যে বান্দশী নেতৃবর্গ কংগ্রেসের কর্মসূচির
অর্থ হিসেবে ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের নীতি গ্রহণ করতে চাইলেন,
এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে থেকে ব্যবসায়ীদের লাজে তাঁরা
সবাই স্থিরেন না। ঘোষাই-এর সার্য বিস্তার না মেটা, সুভাষ কি
তে গোহলে এক জ্বলার (পরে সার্য উপাধিগ্রহণ) সুরেন্দ্রনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায়ের রতন বন্ধিনপন্থী নেতৃত্বা অবিকল্প কণ্ঠস্থার
সমর্থক ছিলেন।..."

হাদেশী আন্দোলনে ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের নীতি গ্রহণের
সুরেন্দ্রনাথের কর্মসূচির কথা অধ্যাপক অমলেন দ্রিগাটী
লিখেছেন: "...চলকপন্থী প্রায় সমস্তই বিশ্বাস করতেন যে বর্জিত
ভাব্যতার লিখিত হাতলে তেমনও উদ্যোগই ভাবতবর্ষে সম্ভব হবে
না। সুভাষ করকটকেও বর্জিত অনুশাসনের বন্ধি দিতে হবে।
হাদেশী ব্রিটিন ব্যবসায়ের পণ্য গ্রহণের প্রথা (কলিঘাট, ২৮
সেপ্টেম্বর, ১৯০৪) চলু করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। "সভা"
পত্রিকা কিত্র আরও এতদ্যপ এলিয়ে য়ে। সিভ্যাপন্থে তৈরি লখন
এক মলিলাসের চিনি যে অধি-পূর্ণ হাওয়া শেখিত করাব পর
বাহ্যহৃদয়ের জ্ব-এ তথা এই কালকটাই প্রবণে বদিক্তবে হালা
হয়েছিল।..."

হাদীনতা আন্দোলনের সময় ভারতে ইংরেজের শিকারাবাস্তু
বিরোধিতা করে জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কার্য শুরু
হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক অমলেন দ্রিগাটী লিখেছেন:
"...হাদেশী ব্যবসায়ের অনুপ্রাণিত নেতারা সমস্তকে নিবেদিত
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (ব্রজবজ্রবের ভায়েত "গোলবিশ্ববদ
গোলাঘরানা") বরকট করার সিদ্ধান্ত নেন। কিত্র এই সময়ে
"কালশিল্পে সার্কিউলর" অর্থাতে ইছন ভোগ্যে আব জট নেয়
"আর্টি সার্কিউলর সোমাইটি" (৪ মেতেষ, ১৯০৪)।

এটি হল হাত সমাজের বর্জিতা-নাগের অশ্রুগ্রহণের
প্রস্তাব। কৃষ্ণকুণ্ডাব মিহু (পরবর্তীকালে "স্বদেশপন্থী" হিসেবে
মির্জাসন-গেও গঠিত) ছিলেন এই সভাপতি। ইব্রীন্দ্রনাথও
সোমাইটিস প্রতি বেগেই সহযুক্তিহীন ছিলেন, লমিও
প্রবন্ধনবেষে তাই সমালোচনা করতেনও তিনি থিরা করেনি।
নন্দমণীসেই মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুণ্ডাব বসু এবং
অন্ততঃম গোদুদী, স্বদেশপন্থী বিনিন্দ্রপ্র, ব্রজবজ্রব ও মতিলাল
ঘোষের সঙ্গে মিলিত হয়ে এতটা জাতীয় শিল্প পরিষদ গঠনের
উদ্যোগ নেন। বহু বিতলালী জমিদার এবং আর্জিনীযীর বন্দনাভায়ে
পরিষদের তামিল পূর্ণ হয়ে ওঠে। মুগত "অন সোমাইটি" ব
সভাপিত্ত্র মুখাধির অধিকারি চেঁচাৎ ১৪ আগস্ট, ১৯০৬ সালে
হাশিত হ "না বেকল নান্দাল করলেন।" এর শিকতরা
অধিকরণই ছিলেন সভাপিত্ত্রের অনুগামী, আর শুভ্রমাত্র বিদ্যাজ্ঞ
নয়, শিল্পবীথের মধ্যে জাতীয়তাবাদী বৃত্তিগতি গড়ে তোলাই ছিল
এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য।"

১৯০৫ সালের আন্দোলনকে কেন্দ্র করে, বাগোয় শুরু
হয়েছিল জাতীয় অ্যালোচন। বিভিন্ন স্থানে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে

তোলা থেকে শুরু করে, বাসমতী জালতেব মিল, এদুই উঠেব কাথানা, বাস, শীতলদিয়া কোম্পানি প্রভৃতি গড়ে তুলতে অনেক চেষ্টা করেন। এই প্রসঙ্গে অবশ্যই অমলেন ত্রিশাণী লিখেছেন: "...এ জাতীয় ঈশান বিংশ বিবরণে জনা ১৩১৩ বঙ্গাব্দেব ত্রিভুজ সংখ্যাব প্রকাশী প্রকাশ। বোম্বাইতে ১৩০১ জালতেব মিল বৈদ্যুতিক হয়েছিল, বাসমতী দুটি (বঙ্গলী) কটন মিল এবং মেইনো মিলস।)। তৎকালেব এমী জর্জিয়ার হল-বদে লিকম্পনেব জনা তুল প্রতিষ্ঠাব উদ্দেশে এতটা ঘন্টা গড়ে তোলেন। বাসমতী বসিও আরও বেশি সংখ্যাব ৩০০ মিল প্রতিষ্ঠাব জনা তুলন সংগ্রহ সম্ভব হয়নি, বাসি-এর প্রতি কিছু ১-শিকার ও বাসলী অন্তর্গত হয়েছিলেন। ৩০ লক্ষ টাকা (অনুমোদিত) তুলন দিয়ে না বেঙ্গল ন্যাপনাল ব্যাঙ্ক ও ২ কোটি টাকা দিয়ে না কো-অপারেটিভ ফিন্ডেবন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। একই সূত্র থেকে কো-অপারেটিভ টিম নেভিয়েশন মিল, না ইষ্টার্ন বেঙ্গল ফ্রেসারি কো-অপারেটিভ মির্চিট্রেড, না ইন্ডিয়া ইন্ডুস্ট্রিয়াল লাইট ইনস্টিটিউশন কো-অপারেটিভ এবং ফিন্ডেবন কো-অপারেটিভ ইনস্টিটিউশন-এর তুলন সংগৃহীত হইতছিল। এই সাহায্যসিবা পরিচালকদের মধ্যে অমলেনসি-এব মহাশয়া সূরেন্দ্রনাথ, কপিন্দাবজাভের মহাশয়া মণীন্দ্রনাথ মণী, উত্তরপাঠার রাজা শিখরীচন্দ্র মুখার্জি এবং কামাকুসের রাজা শ্রীনাথ বাঘের আত্মবিকি (কৌতুক-উদীপক)। সেই তুলনাব এই অমলেনেব মোড়া সূরেন্দ্রনাথ, অম্বিকীকুমার বসু, আবুল রসুল এবং আন্তঃতেন চৌধুরী ছিলেন স্বত্ব বিজ্ঞানিত।..."

অবশ্যক অমলেন ত্রিশাণী লিখেছেন: "...আর্য্য প্রকৃষ্টতন্ত্র দায় ছিলেন না বেঙ্গল তেমিকাল সংগঠনের মূল। শ্রীলংকন সরকারের অর্থাভ্যুসায়ে গড়ে ওঠে এদেশে প্রথম ক্রোম ট্যানারি এবং বাসবিহারী ঘোষ প্রতিষ্ঠা করেন না অমলেনের দায় লাকটিরি।..."

ভারতসভা ও সুরেন্দ্রনাথ

আর্য্য নিন্দ্যাব নাক্তি তাঁর "আন্তঃগিরিত" লিখেছেন: "অনন্দমোহনবাবু বিলাত হইতে আসার পর হইতেই আশ্রয় একত্র হইলেই এই কথা উঠিত যে, কখনেব অমাবিত শ্রেণীর জনা কোনও রাজনৈতিক সভা নাই। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বনিয়েব সভা, ভারত সভা ইত্যাদি অমাবিত অনুবাদের কথ নহ, অম্ব অমাবিত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা যে বেশ বাড়িতেছে, অম্বতে অমাবিত শ্রেণীর উপস্থিত একটি রাজনৈতিক সভা করা আবশ্যক। আরম্ভা তিনজনকে কলকাতায় পর থিয়ে হইল এবং, অমলেনার নেতৃত্বইতী ব্যক্তিদের সহিত পরামর্শ করা কর্তব্য। অম্বতকলকাতায় শিশিরকুমার ঘোষ অমলেন অনন্দমোহন বাবু বহু এক আসারও গ্রিবা বহু ছিলেন। প্রচুর অম্বত পরামর্শের মধ্যে লওয়া হইল। তৎপরে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগত মনোবদন ঘোষ মধ্যপন্থকও লওয়া হইল। মনোবদন থেকেব ব্যক্তিও এই পরামর্শ চলিল। ভারত সভা পরামর্শে আরি উপস্থিত ছিলার না,

আর্য্যদ্বয়ে অন্যত্র ছিলান। তি পরাচর্চ হইতেছে ভারত অনন্দমোহনবাবু ও সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে প্রমিলাস; যখন একটা সভা স্থাপন ও একপ্রকার থিয়ে হইল, তখন এতদিন অনন্দমোহনবাবু ও অম্বি ইকবতন্ত্র বিদ্যাসামন হইত-এদের সহিত যোঝা করিতে যেলাম। বিদ্যাসামনর মহাশয়ের এগুন প্রত্যয়ে বিশেষ উৎসাহ ছিল। তিনি বলিলেন, এতৎপ্রকার মেসেব এতটী মাত্র সভাব বহু হইবে। আরম্ভা তাঁহাকে আশ্বাসের প্রদেব সভাপতি হইবার জন্য অনুবোধ করিলার, কিন্তু তিনি শরীরিক অসুস্থতাবে মোহাই মিচা যে অনুবোধে অগ্র্য্য করিলেন।"

সেকালে একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইছিল—“ভারতসভা”-র সংবদ। সেই সংবদটি হল এই: ‘ভারতসভার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন

২৪ ফেব্রুয়ারি এলবার্ট হলে ভারতসভার দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের বিবরণ প্রকাশ করা হইয়াছে। নবাব শীর্ষ মল্লভদ্র আলি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অনন্দমোহন বসু সভার গত বর্ষসের বিবরণ পাঠ করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ বক্তৃত্যব নানা প্রশংসার আলোচনা করেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টেব নিবর্ত ভারতবাসীর অতীব অধিযোগগুলি পেশ করিবার জন্য অনন্দমোহন বসু ও লালমোহন ঘোষের নাম প্রস্তাব করার সভা উঠা গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে ভারতসভার কাজের প্রশংসা করিয়া বলা হইয়াছে যে লালমোহন ঘোষেব পরিবারে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাকে প্রতিনিবি হিসাবে মনোনিবর্ত করিলে ভাল হইত।"

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, ১৯৭৬ সালে ২৯ ফুদাই 'ভারতসভা' (ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন) প্রতিষ্ঠিত হয়। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতসভা স্থাপনের কারণ ও উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন: "

ভারতসভা স্থাপনের কথা বিদ্যাসামল সরকার উল্লেখ করেছেন: "...অনন্দমোহন বসুস সহযোগিতায় ইনি ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনেব নামক সমিতি স্থাপন করিবা এখন শব্দত অস্তিত্ব যোগ্যতার সমিত হইবার সম্পাদকের কার্য করিতেছেন।..."

সুরেন্দ্রনাথের সাংবাদিকতা

বিদ্যাসামল সরকার লিখেছেন: "...১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে ইনি "বেঙ্গলী" পত্রেব স্বত্ব গ্রহণিয়া লন এবং ইহার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেন। তখন এখানি সাপ্তাহিক ছিল। উত্তরকালে ইহার স্বত্ব বিক্রয় করেন এবং ইহা সৈনিক পত্রে পরিণত হয়। কিন্তু সম্পাদন ভার ইহার হস্তে বরফাই নাত আছে।..."২

বিদ্যাসামল সরকার লিখেছেন: "...গর্ভ মিটনের সাংবাদিক-আজনের বিরুদ্ধেও তিনি অনেক সভাপতিত্ব প্রাপ্ত করেন।..."

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাংবাদিকতা প্রসঙ্গে বাদী যায়। লিখেছেন: "...বেঙ্গলী" ১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে (এস মর্টারজনের মতে ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে) সাপ্তাহিক সাংবাদিক হিসাবে জন্ম

নিবেদিল, জনসমাজ ও মানিক ছিলেন কোয়ার্টার সার্টিস। শব্দেই
বহু নব শক্তিতে আর্থিক সাফল্যে পড়ে, প্রচুর ধন্য ধুব করে
যায়। এ অবস্থা সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিভ্রান্ত করে,
উদ্ভ্রান্তে তিনি আইন ব্যবসায় ও অধ্যাপনায় সুপ্রতিভতা এনে
ব্যবসিকভাবে বড় প্রত্যয়ে ব্যস্ত হন। তিনি ১৮৭১ সালের
শরৎ মাসেই "বেঙ্গলী" জিন্স নিয়ে নিজস্ব পণ্ডালিকা প্রতিষ্ঠা
করেন। তখনও জাতীয় কংগ্রেস দলের প্রভাব ছিল। তাঁর পরিচালনায়
"বেঙ্গলী" ছাউনটা অসাধারণের প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষিণ এবং তখন
এটি এ দেশের আইন, রাজনীতি ও সামাজিক বিষয়গুলির সম্পূর্ণ
সব বাব বিতরণের বড় কুশলী। যখন এটি "ফ্রি প্রেসিডেন্ট"
নামের উন্নতর শক্তিত বৃদ্ধিলাভ করে ধুব জনপ্রিয় হয়েছিল।

যামুগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন: "...সুবেন্দ্রনাথ তাঁর
চৌধুরী বক্তৃতাশেষে জনা কোল পিবেছিলেন, হাটখোঁচের চর
নবিল-এর কাগজে তীব্র কটাক্ষ করে লেখার ফলে। শালগ্রাম
শিলাকে ভক্তসংস্পর্শে কোর্টে গুলিয়ে করার হুমকি দিয়ে
হয়েছিলেন। জনসময়ের ঘর্ষসংগ্রামে আতঙ্ক। এই হুমকিতে
বর্গতার নামান্তর করার সুবেন্দ্রনাথকে অস্বাভাবিক অবস্থানায়
অভিব্যোমে অভিযুক্ত করা হয় এবং দু-মাসের জেল হয়। এর
বিরুদ্ধে লেগে দলে ওঠে। ছাত্রেরা বিকোভ প্রদর্শন করে।
অন্ততঃই সুবেন্দ্রনাথ (শব্দবীজের) বিখ্যাত "কাদা"
আন্তর্জাতিক সুবেন্দ্রনাথের হস্তেই নেতৃত্ব করেন। পি.মি.
সুবেন্দ্রনাথের ধান্যবৃত্ত ছিলেন। ওস্ত-সমিতি স্থাপনে দুজনের
অনেক পরামর্শ হত। বিভিন্ন সাক্ষ্যে জেল ভেঙে সুবেন্দ্রনাথকে
বাস করে আনার প্রস্তাব করেছিলেন।..."

সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কলকাতায় পঠানো নিয়ে সারা
দেশে বিকোভ দেখা দিয়েছিল। কলকাতার বিভিন্ন স্থানে জনসভায়
প্রতিবাদ করা হয়েছিল।

বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রতিবাদ করা হয়েছিল। সেদিনের একটি
সংবাদেই কিছু আল হল এই: 'সুবেন্দ্রনাথের মোকদ্দমা লইয়া
কলকাতায় আসায়েল উঠিবে ইহাও নহি কি? এ আসায়েল কি
সুবেন্দ্রনাথের জনা? সুবেন্দ্রনাথ দেশের জনা অনেক করিয়াছেন
ইহা কে অস্বীকার করিবে? তাঁরই কামনাও বঙ্গদেশের জনে
আঘাত লাগিয়াছে, কিন্তু যে আসায়েল হইতেই ইহা উত্থার জনা
নহি দেশের মহাশয়ের জনা। হাটখোঁচের চিত্তাশ্রমণের বেলায়
কমতা পরিচালনা করিয়া সুবেন্দ্রনাথকে বও মিথ্যেই বলি বক্তৃতির
আইনানুসারে উত্থারের একজন কমতা না থাকে, তাস্ত হইলে এই
জাতি প্রব্রের পরিচায়ক হীমালয়া হওয়া বিস্তারত আবশ্যক; তাহাতে
আর কখনও হাটখোঁচের চিত্তাশ্রমণের সন্ধানের বিচাৰ করিয়া
সংবাদপত্রে সংবাদকথিতকে জেলে প্রেরণ না করিতে পারেন একজন
বিধি না হইলে ব্যক্তিক সংবাদপত্রেই হাটখোঁচের নামমাত্র
ব্যক্তিবে।..."

সেদিন বিভিন্ন জনসভায় সংবাদপত্রে হাটখোঁচের প্রশ্ন
উঠেছিল। বীজান স্ট্রিটের জনসভায় সংবাদের কিছু আল এখানে
উল্লেখ করা হল:

বীজান স্ট্রিটের বিখ্যাত সভা

বিজাত সুবাব কলিকাতাবাসীরা বীজান স্ট্রিটে যে পুণা
বেদিয়াছেন, সেজন পুণা এই শব্দে পূর্বে আর কেহ কখনও
নেবেন নাই। প্রত্যয় হিব হা যে, এই সভা টাইম হল পূর্বে করা
হইবে। তৎপরে কোনও কারণে টাইম হল পাওরা গেল না।
এবংকে করেতকিন বহিরা সুবাব সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ
হইতেই যে, টাইম হল সুবাব অসম্ভাব সত্যে পঁচাত্তর বছর
সভার অধিবেশন হইবে। সভার উদ্বোধনকর্তার প্রথম বিবৃতি
বিশেষে পড়িলেন। তৎপরেই অধি প্রত্যয় হইতেই হানান্তর
অধিবেশন আরম্ভ হইল। সুবাব বেলা ১টা বাজিয়া গেল তখনও
হিব নাই কোথায় সভা হইবে। অবশেষে জনসমগতি হইয়া বীজান
স্ট্রিটের বাহুরি করেতকি হিব করা হইল। তৎকালে নূতন
বিজ্ঞাপন সুবাব মুদ্রিত হইল তৎকালে উৎসাহী সুবাব নূতন
বিজ্ঞাপন হুতে পছন্দে সর্বত্র ছড়ানো পড়িলেন, এই হুতেই
বিপ্রহর হুতে ছায়ে ছায়ে দুইটা নূতন বিজ্ঞাপন বিতরণ
করিতে লাগিলেন। পড়ে, ঘাটে, টাংকাডিতে, কোকোনে, বাড়িতে
সুবাব বিজ্ঞাপন লইয়া উপস্থিত হুতে লাগিলেন।..."

সেদিনের সংবাদপত্রে উল্লেখ আছে অনুমান যে বেল
হাটখোঁচেরও অতিক্রমের সময়েই হইবে। কলকাতার কং
সভায় মানসুখের তীব্র হুতছিল সভায়। সভায় দেখা গিয়েছিল
সেদিনের ব্যাভাষা ব্যক্তিবে। কোকোনে সংবাদপত্রে থেকে
করেতকিনের নাম এখানে উল্লেখ করা হল: সুবাব মীলকুৎ দেখ
বাহাদুর, সুবাব বিনকুৎ দেখ বাহাদুর, রাজা সুবেন্দ্রনাথ দেখ
বাহাদুর, সুবাব মালিয়া, বেড়াহেত কলকাতায় বন্দ্যোপাধ্যায়,
ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, রেডার্সে কে ফার্স্টন, বেড়াহেত
কে এম ম্যাকডোনাল্ড, টি পলিট-বারিষ্টার, জি সেন
বারিষ্টার, আনখোয়োন কং ব্যারিষ্টার, পি এল মায় ব্যারিষ্টার,
আর সুবেন্দ্রনাথ ব্যারিষ্টার, ডাক্তার পি এম জুগু, ডাক্তার
একজন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার এম এম বসু, ডাক্তার অরুণচন্দ্র
বাস্তব, সিংহপুত্র মেহ, নরেন্দ্রনাথ সেন—নিবাস সম্প্রদায়,
আচার্য সিংহালা শাস্ত্রী, পণ্ডিত রাজকুমার নাথার, পণ্ডিত
বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, পার্শ্ব,
খ্রিস্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের লোকজনের উপস্থিত ছিলেন।

সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অস্বাভাবিক অবস্থানে প্রেরণ
করায় জনা প্রতিবাদ করেন বাবলিয়া। হুতখোঁচের, টাংকাডার,
রাবাবাচার, কলকাতার প্রভৃতি হুতের দেখান সকল বক্তৃতা
বাবলিয়া সভায় জড়ো হয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। সেদিনের
একটি সংবাদপত্রে লেখা হুতছিল: 'এখন উৎসাহ জনসংবাদে
এনে ব্যাভা ও সকল দেশীর একজন একতা কেহ কখনও
কলিকাতাতে নেবেন নাই।'

বীজান মার—সুবেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে লিখেছেন: '...সুবাব
ডাক্তার জাতীয় কংগ্রেসের তিনি সভাপতি করেন। প্রথমবার
১৮৮০ সালে পুণাতে এবং দ্বিতীয়বার ১৮৯০ সালে

আমেরাধায়ে। লর্ড ব্যাকলেব “বকডক” প্রস্তাব বিলম্বিতা অপ্রাচলন ছিল তাঁর একটি বিশেষ কুসিদ্ধি। এই বিষয় নিয়ে তিনি ১৯০১ সালে বিলাত বার্তা কথেন এবং সেখানে ইংরেজ সরকারেরে বক্ততক বোব সম্পর্কে সচলত ব্যাখ্যাব বুঝিয়ে বলেন।...”

কলকাতা কর্পোরেশন ও সুরেন্দ্রনাথ

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বর্তমান কলকাতা কর্পোরেশনের জনক বলা হয়। এই বিষয় কয়েকটি লেখা বিস্তারিত সবর জানাথের চোখে পড়েছে। একটি লেখাব কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল। মনি সান্যাল লিখেছেন: “...একসিতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নগর শাসন ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিকরূপে অপ্রাচলন এবং জ্ঞাথিতে ইউরোপিয় বসিন্দা ও বসিত স্বার্থেব সংঘাতের ফলে লর্ড ডেকলি ১৮৮৮ সালে ৫ নং আইনে পূর্ব ব্যবস্থা বন কথেন নতুন নিয়ম চালু কথলেন ১ এপ্রিল থেকে।

একজন সেকারচার্য ও ৫০ জন কমিশনার নিয়ে নতুন কর্পোরেশন তৈরি হল। এই নতুন বিধিতে ৫০ জনের মধ্যে ২৫ জন নির্বাচিত হবেন এলাকার হিতহিত। সরকার ঘনোদীত ১৫ জন, বাকি ১০ জনের ৪ জন বেঙ্গল চেম্বর অব কমার্স, ৪ জন কালকাতা ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের ও ২ জন কালকাতা পোর্ট কমিশনার কর্তৃক ঘনোদীত হবেন বলে হিব হল। ব্যস্তিক পৃথক

এই কর্পোরেশনের বিলের কোনও অমডাই ছিল না। শুধুমাত্র কব ও ট্যাক্স বার্য করাও ব্যাজেট ঘনো করাই ছিল এর কাজ। নমন্ত কার্যকরী অমডা নান্ত হয় ইউরোপিয়ন বসিন্দা ও বসিত সম্প্রদায় দ্বারা পঠিত একটি ছোট কমিটির ওপর। এর নাম বেওদা হয় জেনারেল কমিটি।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বেশির অধিবাসিনীদের ২৮ জন প্রতিনিধি এই কর্পোরেশনের থেকে পদত্যাগ করেন। এইভাবে কলকাতার স্বায়ত্বশাসনের জন্য আমেরাধন ট্রাস্ট আকার বালন করে। এর ফলে ১৯১১-১২ সাল কলকাতা থেকে প্রায়বাসী ইন্দোভারিত হয়ে গেল বিস্তিতে। কলকাতার ভাগে শুভ হল অমহোদার ইতিহাস।...”

সুভাষচন্দ্র বসু লিখেছেন: “...হাসিনী স্বায়ত্বশাসন মন্ত্রী সাহাব সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জনাব। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯২০ সালে কলকাতা শৌর আইন সংশোধিত হয়েছিল। এই আইনের বলে কলকাতা শৌরসভাকে অধিকতর অমডা বেওদা হয় এবং জোড়িকার হয়েই বাড়িয়ে নিবাসন ব্যবস্থাকে অথেষ্ট নতিনালী করা হয়।...”

বাংলাদেশের স্বায়ত্বশাসন উন্নয়নে সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। অসাব্যাস ব্যাপী ও নিতিক চহিরের জন্মেরে শিক্ষাপ্রদার করে সিনন কলেক্ট প্রতিকা করেন। সুরেন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত অর্থ দান করেন।

গ্রন্থপঞ্জী

- ১। অমহল প্রিন্সী, অমহল ভূতিন সত্রয়ে লমবণী পর্ব, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ১৮
- ২। সুভাষচন্দ্র বসু, ভাষ্য পত্রিক, সাত্র ভক্তবলী, (অনব), প্রথম ৭০, ১৯৮০, পৃষ্ঠা ৫৫
- ৩। সুভাষচন্দ্র বসু, সাত্র ভক্তবলী, (অনব), দ্বিতীয় ৭০, ১৯৮০, পৃষ্ঠা ১৪
- ৪। অমহল প্রিন্সী, অমহল ভূতিন সত্রয়ে লমবণী পর্ব, ১৯৯১, পৃষ্ঠা ১১৬
- ৫। ঐ, ঐ, পৃষ্ঠা ১২৫
- ৬। ঐ, ঐ, পৃষ্ঠা ১৫৫
- ৭। ঐ, ঐ, পৃষ্ঠা ১৫৫
- ৮। সিনকল পত্রী, অমহল, ১০২৫, ১২৭
- ৯। সাত্র প্রাকল, ১৮ লম্বন ১২৮৫, অর্ড ১৮৭৯

- ১০। Surendranath Banerjee. A Nation in Making. 1925. Ch. V.
- ১১। বিলিওলল লমবল, সাত্রবল, ১৯৯১, সাত্রবল পৃষ্ঠা ৫০৬
- ১২। ঐ, ঐ, ঐ
- ১৩। ঐ, ঐ, ঐ
- ১৪। বালী বলা, অমহল সরকারের ইতিহাস, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৪০
- ১৫। অমহল ভূতিনসাত্র, বিলিওলল পত্রী, ১৯৯২, পৃষ্ঠা ২২২
- ১৬। সত্রীন্দ্র, ৫০ সাত্র, ১২৮০
- ১৭। সত্রীন্দ্র, ৬ সাত্র, ১২৮০
- ১৮। সাত্রীন্দ্র, ৬ সাত্র, ১২৮০
- ১৯। বীভন অম, ঐ সাত্র বক্তবলী, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ২৮৭
- ২০। বালী সাত্রাল, কমিটার—অম স্বাসনবল্যব অমহল, অমহল বিলিওলল লমবলিত: সাত্র কলকাতা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ১২৮
- ২১। সুভাষচন্দ্র বসু, সাত্র ভক্তবলী, দ্বিতীয় ৭০ (অনব) ১৯৮০, পৃষ্ঠা ৫৪

সুরেন্দ্রনাথ

আমরা মনে করি সময় পাশ্চাত্যে
যাচ্ছে। মানুষ এখন আর অতীতে তাকাতো
ভালবাসে না। একশো বছর আগে এই দেশে
এখন একজন ব্যক্তি জন্মেছিলেন, তাঁর সমস্ত বাণী সাধা
জাভেত ছিল না। তিনি ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে
ছুটে বেড়িয়েছেন একটি বাঁটা নিয়ে—ভারত এক এবং অপর।
এই মানুষটির প্রচেষ্টায় ঘটনাচক্রে জন্ম নিয়েছে জাতীয়
কংগ্রেস—যে দলের ছত্রছায়ায় থেকে সমগ্র ভারত ব্রিটিশ
সাম্রাজ্যবাদীর বিরুদ্ধে বাহ্যিক আঘাত মেনেছে যতদূর
পর্যন্ত না তারা এদেশ ছেড়ে চলে যায়।

যত বিজ্ঞানজ্ঞানেই সুরেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক জীবন ও
শিক্ষাকে মূল্যায়ন করা যাক না কেউই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে
কোন প্রশ্ন তুলতে পারেননি। তিনি ভারতবর্ষের স্বাভাবিক
জীবনের প্রতি ক্ষেত্রেই জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রবর্তনের চেষ্টা
করেছিলেন। এতটিকে তিনি স্বাভাবিকপন্থিত সর্বকালের সীতি ও
সংবিধান গ্রহণ করার কথা চেয়েছিলেন যার প্রকৃষ্ট
উদাহরণ—‘কালকাতা থিউনিসিয়ান আই’, ১৯২৬’ অন্যদিকে
ভারতবর্ষের সব প্রদেশের মানুষের কাছে ভাষা, সামাজিক
আচরণ-আচরণ, ব্যক্তিগত জটি ও ক্ষমতার উর্ধ্বে যে অস্বীকৃতি
একটি আছে, সে সম্বন্ধে সচেতন করতে চেয়েছিলেন।

দেশের স্বাভাবিক জীবনে তাঁর এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি
প্রবর্তনের একশো বছরের মধ্যেই দুর্ভাগ্যবশত এবং অসমীচীন
হিসেবে আমরা এই নৈশবাসিত ব্যক্তির অবদানকে ভুলতে শুরু
করেছি। এই সময়ের মধ্যে আমরা দেখেছি তাঁর উচিত নৈশ
আইন কিংকম হস্তান্তর হয়েছিল, স্বাভাবিকভাবেই সময়ের
বাহ্যানে কিভাবে তা বাস্তবায়িত হওয়ায় পরে বাধ্য হতে
হয়েছে। আমরা দেখেছি, তাঁর জন্মশতবার্ষিকী কিভাবে উপেক্ষা
ও অবহেলায় মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। দেশের যৌনিক ভ্রম
চেষ্টা করেছিলেন আইন ও যখন নৈশবাসিত কণ্ঠেরেণন অত্র
কালকাতা গঠন করতে সেই কলকাতাবাসীরা কিভাবে তাকে
ভুলতে বসেছে।

আজ সুরেন্দ্রনাথের ১০১তম জন্মদিনে নানা ভাবনা মনে
আসছে এবং আমাদের পীড়িত করে। আমরা ভুল করেছি,
অতীতকে মনে রেখে আমরা আগের নিজেদের নিজেদের
করতে পারি কলকাতাকে নতুনভাবে প্রাণীকৃত করে
সাম্রাজ্যের যে চেষ্টা সুরেন্দ্রনাথ বর্ষাবর করে এসেছিলেন।

কালকাতা থিউনিসিয়ান সেক্টর ২০শে নভেম্বর, ১৯৮৬, প্রকাশিত
সম্পাদকের প্রস্তাবনা:

প্রয়াত স্যার সুরেন্দ্রনাথ কর্পোরেশনের শ্রদ্ধাঞ্জলী

স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির দুর্ভাগ্যে কলকাতা
স্ট্রীটসের শোক ও অশ্রুপূর্ণ কণ্ঠ নবিকৃত করার
জন্য গত সোমবার ১০ আগস্ট বিকল ৫টার
কলকাতা পৌরসভার কাউন্সিল চেম্বারে এক সভার মিলিত হন।
সভার সভাপতিত্ব করেন মেয়র, তিনি মহান নেতার দৃষ্টির
উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন এবং একটি প্রস্তাবের ওপর ক্ষুদ্র
জন কর্পোরেশন—এর তাকে সত্যি শোক প্রকাশ করে তাঁর
পরিবারবর্গকে সম্বোধনা জানানো হয়। মেয়র বলেন : অন্তঃস্থ
ও কাউন্সিলরগণ, আজ রাতে আমরা এখন মিলিত হয়েছি,
জাতীয় শোকের ক্ষয়। ভারতবর্ষের একজন মহান সন্তান তিনি
দুর্ভাগ্যে আমাদের পর্বত নিম্নবিক্ষিপ্তভাবে দেশের সেবা করে গেছেন,
তিনি আমাদের মধ্যে নেই। এই মহান আত্মার প্রতি কর্পোরেশনের
বন নীরব করার সাথে এটি উদ্ভব করা প্রয়োজন তিনি ছিলেন

ভারতবর্ষ জাতীয়তাবাদের জনক। তিনি ভারতের জাতীয়
কংগ্রেসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। তিনি দু-বার ভারতের
জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নিযুক্ত হয়েছিলেন। গত ৫০ বছর
ব্যাপী ভারতীয় জনজীবনে আত্মসচেতনতা এনেছেন তিনি। তাঁর
জনাই বাংলা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবন সারিতে এসেছে।
বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে তিনিই আন্দোলনের নেতৃত্ব নিয়েছিলেন,
সংগঠিত করেছিলেন। তিনি লর্ড কার্জন ও লর্ড মন্টগোমেরী-এর
স্টেটস্‌ম্যান্স লীগকে আন-স্টেটস্‌ম্যান্স করেছিলেন। তিনিই
ভারতবাসীকে নিজের পায়ে গাঁড়তে শিখিয়েছিলেন। তিনিই
আমাদের দেশে স্বদেশী ও স্বকল্পের আন্দোলনের পটভূমি
উন্মোচিত করেছিলেন।

কিন্তু এই সুযোগে আমরা যেন ভুলে না যাই তিনি আমাদের
কর্পোরেশনের সঙ্গে কত নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এই মহান

শহুরে তিনি প্রকৃত প্রেমিক ছিলেন। ২৩ বছর ধরে ১৮৭৩ থেকে ১৮৯২ তিনি কলকাতায় বাস করেছিলেন এবং যে সংস্কারের জোরে অল্প সময়ের মধ্যে সত্য জানি, সেই সংস্কারও সম্পূর্ণরূপে তাঁর দৃষ্টি। অতীত অতীত পূর্বে যত দূর দূর করে তাঁর সত্য ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বহু জন ১৮৯১ সালের কুমার জ্যোতি বিদ্যালয় বিদ্যালয় তিনি তাঁর ২৭জন সহকর্মীকে নিয়ে এই কলকাতায় থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন। এই কারণে তাঁর প্রকৃতি পূর্বেই অবতরণের বিদ্যা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মনুষ্য সন্তান। এই ইতিহাসিক স্থানীয় ঘটনার ২১ বছর পর দর্শন তিনি বেঁচেছিলেন, পরিচয় করে গেছেন। তাঁর জন্মের তিনি অল্প দিনে অতীত তাঁর জন্মস্থানে তিনি পুনরায় স্বাধীন চেহারা দেখেছেন বলে। এবং এর ২৩ বছর পূর্বে তাঁর সে আশা পূর্ণ হয়েছিল।

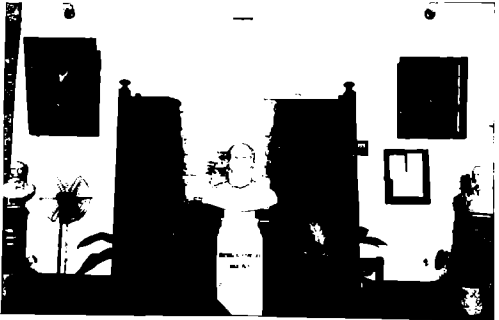
তাঁর দৃষ্টি জীবনে দেশভক্তির প্রতি উৎসাহিত জনসেবার কার্যক্রম রয়েছে এমন কি অনাগত ভবিষ্যতেও মানুষের প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে।

এখন ঘরে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি পেশ করেন এবং উপস্থিত সকলে উত্তর দিলে সেটি অনুমোদন করেন।

‘কলিকাতা শৌচসভা প্রতিষ্ঠা পুণ্যের সঙ্গে এবং অশুভচিত্ত দ্বিধা হিসেবে সবার সুবেশনার ব্যানধি দূর্য্য ঘটানোকে নবীকৃত করছে। সবার সুবেশনার পথের পোশাক, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অশুভচিত্তে আশা এবং দ্বিধা পীড়িত মনকে হৃদয় জাগ্রত করে এবং প্রতি তাঁর ঐকান্তিক কর্মসিদ্ধি চিত্তাকর্ষিত কৃতজ্ঞতার দ্বারা করছে। শৌচসভা বিশেষভাবে দৃঢ়তা করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সম্বন্ধে তাঁর কঠোর পরিচয়ের কথা। দৃঢ়তা করে কলকাতার প্রতি তাঁর সেরা, তিনি কলকাতার হিসেবে বর্ধিত পরিচয় ১৮৯৮ সালে জ্যোতি বিদ্যালয় বিদ্যালয় যে অঙ্গন ঘোষণা করেছিলেন তাঁর পশ্চিম বছর বাসে এই পূর্বে আবার তিনি স্বাধীনতাকে বিধি আনতে দেখেছিলেন। শৌচসভা কৃতজ্ঞতার দ্বারা করছে বর্তমানের গণতান্ত্রিক চেহারা জনা তাঁর প্রতি দৃঢ়তা করা এবং এই সুযোগে তাঁরা তাঁদের অন্তরে প্রকৃত জ্ঞান করছে। তাঁর শোকগত পরিবারকে তাঁরা তাঁদের আশ্রিত পোত এবং সহানুভূতি জ্ঞান করছে।’

[১০ অক্টো ১৯২০ কলকাতা মিউনিসিপাল বোর্ডের সভাপতি বক্তব্য]

১৮৯২ সালে কলকাতার কুমার জ্যোতি বিদ্যালয়



কংগ্রেসের আদিপর্ব ও ভারত সভার নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

মৃণালকুমার বসু

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বঙ্গীয় ঐতিহাসিকদের গভীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। অথবা একথাও বলা হয়েছে যে পূর্ববর্তী রাজনৈতিক নেতাদের কার্যকলাপ ঘোষণিত ওজস্ব পায়নি। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করা হতে থাকে ভারত সভা ও ন্যাসন্যাস কনফারেন্সের সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর নাম। বিশেষত এই কারণে যে সুরেন্দ্রনাথের মতো অসাধারণ পরিচর্যা সংগঠনপট্ট নেতা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগেই জাতীয়ত্বের রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন বলেই নয়, তিনি কংগ্রেসের মতো আদ্যাত পূর্বল সংগঠনের সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ ঐতিহাসিক যোগাযোগে যোগেছিলেন। অতঃপর তাঁর এই কৃতিত্ব মর্যাদা পায়নি। স্বী প্রতিফল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে রাজনৈতিক আন্দোলনের বনিয়াদ তৈরি করার কাজ তিনি ভুল করেছিলেন সে বিষয়ে অন্তত আংশিক ধারণা দেবার জন্যই এই প্রবন্ধে অবতারণা।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগেই বাংলার উন্নত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। তাই বটেই আন্দোলন যাতে শহরের গভীর হৃদয়ে গ্রাসাচ্ছিল হৃদয়ে পড়ে তার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা করা হয়েছিল; এ স্বরূপের সংগঠনের মধ্যে প্রধানত মধ্যবিত্ত পরিচালিত ভারত সভার নাম প্রথমেই মনে আসে। এটির নেতৃত্বে ছিলেন আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী ও হারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো মুখ্যকর্মী। বেশির ভাগই ব্রাহ্ম আদর্শে কার্যেই কিছু পরিচয়ের সমাজের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। এ সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথের মতো কিছু অথচ আনন্দমোহন থেকে সদাবিতাড়িত মানুষ। ফলে সভ্যত্বের ঐক্যের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন হরিন্দ্র আদর্শে পত্রিকার সম্পাদক শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সুরেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে কলকাতা মিথ্রে বক্তৃতাগুলিকে হরদ্বৈপী বৈরাগ্যেরী কলকাতা কলস্ব করেছিলেন। এমনকি তিনি সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে

সবকিছু অনুগ্রহস্বাক্ষর আকর্ষণ দেখেছিলেন।^১ বক্তৃতাগুলি বক্তব্যেরী পত্রিকা ও আদি ব্রাহ্মসমাজের তত্ত্ববোধিনী এদের চেয়ে কম ওজস্ব ছিল না; অথবা সাংবাদিক-রাজনীতিবিদদের সমালোচনার সুব ছিল অনেক চড়া ও ব্যক্তিগত। বাংলা থেকে

“সুরেন্দ্রনাথের মতো
অসাধারণ পরিচর্যা
সংগঠনপট্ট নেতা কংগ্রেস
প্রতিষ্ঠার আগেই
জাতীয়ত্বের রাজনৈতিক
সংগঠন গড়ে
তুলেছিলেন।”

অনেক ঘূবে পূণ্য অনুষ্ঠিত কংগ্রেস সম্পর্কে ঐশ্বর্য করে তথ্য ছিল কম। ফলে অনুগ্রহস্বাক্ষর পত্রিকা এটিকে উল্লেখ করেছিল “বোম্বাইয়ের জাতীয় কংগ্রেস” বলে।^২ কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানীতায় শ্রীতি অপরিবর্তিত থাকল। বং আরও জোরাল হল যখন বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসকে জনপ্রিয় করার জন্য গ্রামনিক নেতাদের দায়িত্ব দেওয়া হল। বাংলার কংগ্রেসকে সংগঠিত করার দায়িত্ব পেলেন ‘নববিভাগ’ পত্রিকার সম্পাদক শিবজিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট-রাজস্ব উপাধিকারী শিবজিলালবন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্যায় ব্যক্তি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব চেয়ে বেশি ছিল। কিন্তু অনুগ্রহস্বাক্ষর পত্রিকা যোগ্য করল যে বোম্বাই, মহাদ্ব ও বাংলার কংগ্রেসের কাজের হিসেব যখন করা হবে তখন দেখা যাবে বাংলা ভারতের চেয়ে পেছিয়ে নেই।^৩ অথবা পত্রিকা যত্নবা করেছিল ‘বে



ভারত সভার আদর্শাবলী

- ১) স্বাধীনতা লাভের পরেই দেশের পক্ষে যোগ্যতা
 ২) স্বাধীনতা লাভের পরেই দেশের পক্ষে যোগ্যতা
 ৩) স্বাধীনতা লাভের পরেই দেশের পক্ষে যোগ্যতা
 ৪) স্বাধীনতা লাভের পরেই দেশের পক্ষে যোগ্যতা

‘এ নেশন ইন মোকিং’

— श्रीकृष्ण-साधनं साध्यानामभ्यासः —

[illegible]

বাংলার অন্যান্য সংগঠনগুলো তাকে উপযুক্ত সাহায্য করবে। অনুমতি করা শক্ত যে, যে বাংলাদেশের সক্রিয় সংগঠনগুলোর সাহায্য ছাড়া কংগ্রেসের পক্ষে প্রতিষ্ঠা অর্জন করা সম্ভব হবে না।

হিউম কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধির জন্য সবা তৎপর ছিলেন। কিন্তু বাংলার রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর ওপর তাঁর নির্ভরতা ছিল না। তিনি নানান পুস্তিকা ছেপে প্রচার করলেন। এগুলোর মধ্যে "Old man's hope" যেমন ছিল তেমনই ছিল "The Star in the East or the Bengal National League" যাতে নতুন সংগঠনের মাধ্যমে কংগ্রেসকে বাংলায় শক্তিশালী করা যায়। মনে রাখা মরকার হিউমের বহুল্লু ঘরানা ছিল যে ভারতীয়রা প্রায় সকলেই ইংরেজ শাসনের খোঁড়া শত্রু। ডব্লিউ অমলেন্দু হিঙ্গলী সঙ্গত করেছিলেন হিউম সাম্যের বাস্তবতিকে তীব্রভাবে সমালোচনা করছেন।^১ কিন্তু ইংরেজ বিরোধী মানসিকতার মোকাবিলা করার জন্য ভারতীয় নেতাদের শাসন

ব্যাপারে বিশেষত আইনসভার মাধ্যমে কিছু পরিমাণে তুল্য করার
 প্রয়োজন। সর্বভারতীয় স্তরে যেমন কংগ্রেসে তেমনই প্রাথমিক
 স্তরে থাকবে ভারত সভার প্রতি শুধু ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান
 অ্যাসোসিয়েশনের নয় আরও অনেক গোষ্ঠীই ছিল সমান বিরক্ত।
 রাজনৈতিক মতদর্শনও পার্থক্যের সঙ্গে তুল্য হইছিলে ব্যক্তিগত
 ক্রোধ, ইচ্ছা ও গোষ্ঠীর বগড়া। এদের মনোভঙ্গির চেয়ে কম
 বিষয়দেয় ছিল না সবা প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা
 নেতাদের মনোভাব। অবশ্য মনে রাখতে হবে—আগাম্য
 রাজনৈতিক হিটম সাংহেবের সহায়তা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠাতাবর্ষে
 কংগ্রেস ছিল কিছু পরিমাণে বায়বীয় সাংগঠন। অবশ্য কংগ্রেস
 প্রতিষ্ঠার আগেই ভারত-বন্ধু হিসেবে হিউমের খ্যাতি ছিল।
 তিনি একদিকে আবার রাজনৈতিক সংগ্রাম গড়ে তোলার সঙ্গে
 সঙ্গে ব্যক্তিগত সন্তোষ স্বরূপেই আসান-প্রদানের জন্য
 টেলিগ্রাফ সংস্থা গড়ে তোলার কাজে। বিভিন্ন শহরের বন্ধু,
 সমর্থক ও উৎসাহী ব্যক্তিদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ
 করছিলেন। এদের মাধ্যমে ভারত সভার নেতা আনন্দমোহন
 বসুও ছিলেন। তাঁর অর্থিক সাহায্য হিটম গ্রহণ করেছিলেন।
 কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁরা ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন বলা যায় না।
 অথচ কলিকাতার সমস্ত আইনব্যবসায়ী উমেশচন্দ্র বোনার্জীর
 সঙ্গে তাঁর গভীর ঘনিষ্ঠতা হইছিল ও দুজনেই ভারতের
 রাজনৈতিক অবিজ্ঞতা বিষয়ে একমত ছিলেন। এর প্রতিফলন
 পাওয়া যায় উমেশচন্দ্রের বক্তব্য। কিন্তু উমেশচন্দ্রের তুলনায়
 রাজনীতিতে অনেক বেশি তৎপর ভারত সভার নেতাদের সম
 হিটম কথা মনে করেননি। সুব্রহ্মনাথের মত ব্যক্তি তাঁর বিপুল
 রাজনৈতিক অজিজ্ঞতা সত্ত্বেও কংগ্রেস বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।
 কিন্তু ১২ জন বেলগেণ্ডি নিয়ে কংগ্রেসের তুলনায় অনেক বড়
 সংগঠন ছিল ভারত সভা আয়োজিত ন্যাশনাল কনফারেন্সে।
 সুব্রহ্মনাথ সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা নেতাদের মনোভঙ্গি
 শুধু প্রতিষ্ঠা বছরের ব্যাপারে ছিল মনে করলে তুল্য হবে। এর
 মধ্যে নির্ভিত ছিল জনমুখী সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে গভীর
 মিনারবাসী নেতৃত্বের বিরোধ। তাই সুব্রহ্মনাথের মত নেতাকে
 কংগ্রেসের জন্মদেয় ঘুরে পরিচয় রাখা হইছিল। বিপিনচন্দ্র পাল
 তাঁর আত্মজীবনী ও অন্যত্র এ কারণে উদ্র সন্দেহোৎপাদ
 করেছেন। “কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বঙ্গার পরে এ সমস্যা
 ব্যাভারজি মিটে যায়নি। বহু কংগ্রেসের ভেতরে ও বাইরে
 ভারত সভা ও সুব্রহ্মনাথ বিরোধিতা চোখেছিল। কলে
 ঘনিষ্ঠত্ব, গোষ্ঠীগত ও মতদর্শনগত সংঘাত কখনই
 সুব্রহ্মনাথকে বাংলার ‘নরমদহী’ বলে পরিচিত দলেও গ্রাস্য
 বাংলার প্রতিষ্ঠা করতে দেখনি।”

এই বিষয়ের তীব্রতা সরকারি আমলাদের বিষয়ের চেয়ে কম ছিল না। অত্যাচারের পত্রিকার শিশিরকুমার ও মতিলাল খোঁষ ইতিমধ্যে লীগের বার্ষিকা ও ভারত সভার সাফল্যের জন্য তিরমি ইচ্ছাশিত ছিলেন। বেসল ন্যাশনাল লীগ। নতুন এই প্রাথমিক সংগঠনের নেতাদের কিছু পরিচয় প্রয়োজন।

৩ এপ্রিল ১৮৮৬-তে ঠিক হল যে ৪ শীশ প্রতিষ্ঠিত হবে।

সংস্থানির জন্মলাভ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানিয়েছিল স্টেটসম্যান পত্রিকা। এটি তুমিই হল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক। সাদুবেল স্মিথ এম. পি. হাজির ছিলেন। সভার ব্যক্তিত্বলাল খিত্র ভাবভের সমস্যার কথা বিস্তারিত আলোচনা করেন।^১ মহাবাঘা বতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এর সভাপতি নিযুক্ত ছিলেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের দক্ষিণাঙ্গভে বেঙ্গল ন্যাপনাল শীপের পক্ষে বেশ প্রাণবর্তনপূর্ণ ছিল। কিন্তু ভাবত সভা ও অন্য সক্রিয় সংগঠনের তুলনায় শীপের একটা বড় পার্থক্য ছিল। শীপের মত কেউ লম্বী করেনি যে বাংলার সব ধরনের সামাজিক অবস্থার মানুষ এতে দৃঢ়। শুধুতেই ছন্দে জন শীপের সঙ্গে দৃঢ় হয়। এর দল লক্ষ্য ছিল আইনসভার পরিবর্তন। তাই হিন্দু পেট্রিট মন্তব্য করেছিলেন যে শীপ ছাত্রী সংগঠন হবে না। লক্ষ্য পূর্ণ করাই ছিল একমাত্র কাজ। আশা ছিল ভারতবর্ষী তিরোবিচার শাসনসভার প্রদর্শনের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের সময়ে শীপের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। উৎসাহী শীপ সমর্থকরা আইনশীপের কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন যে বেঙ্গল ন্যাপনাল শীপ প্রথম থেকেই জাতীয় সমস্যার সঙ্গে দৃঢ়। এটিই আইনশীপ শীপের সঙ্গে বড় তফাক।

সর্বজনীন সংগঠনের দ্বারা দেবার আশ্রয় চেষ্টা সবেও শাসকগোষ্ঠী বেঙ্গল ন্যাপনাল শীপ সম্পর্কে সদ্যোচ্চাশ্রয়বর ছিল। প্যারেনীয়র Star in the East পুস্তিকাটির লেখক হিসেবে হিউম বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করে। এতে অমৃতবাজার পত্রিকা প্যারেনীয়র এর বিরোধিতা করেও প্রীকার করতে বাধ্য হয় যে হিউম যদি এই পুস্তিকাটির লেখক হন তাহলে তাঁর পক্ষে নাম প্রকাশ করাই সমীচীন ছিল।^২ মহারাজা বতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বেঙ্গল ন্যাপনাল শীপের সভাপতি হওয়ার আশা করা হয়েছিল যে শীপের সবকিছের প্রতি আশ্রয়ভার বিধে প্রায় উঠবে না। শীপের কার্যনির্বাহক সমিতিতে পত্রিশ জন নিযুক্ত হলে। কিন্তু এত বড় কমিটি হলেও কলিকাতার বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠীর নেতাবাই শুধু নির্বাচিত হলেন। জনসাধারণের বাহ্যনৈতিক চেষ্টা জাতিয়ে ভোলায় ব্যাপারটা শুধু কামড়ে-কামড়েই বজায় থাকল। কিন্তু পেট্রিট সাধেবে মন্তব্য করেছিল যে শীপের নেতারা কলিকাতাকে কেন্দ্র করে ঘোড়ার গাড়িতে ঘাওয়া ঘাব এমন ছোট গড়ির ঘোড়াই বাস করেন।^৩

অবশ্য বৃহত্তর জনসমাজের ওপর প্রভাব ব্যক্তনোর চেষ্টা ছিল। শীপের চীমার হার ঠিক হয়েছিল মাত্র এক টাকা। ঠিক হল যে দ্বারা শীপের সদস্য হতে তাঁরা টাকা পর্যাতে পারেন ইন্ডিয়ান বিদ্যর পত্রিকার সম্পাদকের কাছে। অবশ্য ছাত্রজন্য চক্রবর্তী বা গুলুলাল ঘরিকের কাছে পর্যাতে যেতে পারে। শীপের বক্তব্য জানতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের ঘোষণাবোধ করতে বলা হল নিরিবাকৃতক ঘোষণাখ্যাতের সঙ্গে।^৪

কিন্তু শীপের কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে জনসংঘের মধ্যে উৎসাহ জাতিয়ে তুলবে সেটাই ছিল সমস্যা। আইনশীপ শীপের

“সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা নেতাদের মনোভঙ্গি শুধু প্রতিষ্ঠা বছরের ব্যাপারে ছিল মনে করলে ভুল হবে। এর মধ্যে নিহিত ছিল জনমুখী সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে গজদন্ত মিনারবাসী নেতৃত্বের বিরোধ।”

জমিদারী সমস্যা নিয়ে আন্দোলন করা মহারাজা বতীন্দ্রমোহন বুঝে থাক অমৃতবাজার পত্রিকার দায়িত্বের কাছে দৃষ্টিভ্রান্ত ব্যাপার ছিল। তাই অমৃতবাজার পত্রিকা সামাজিক শ্রেণীপত্ত বিষয় নয় ধর্মীয় ভাবকে কাজে লাগিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার পরামর্শ দেয়।^৫ এ বক্তব্য ছিল বুঝে প্রাণবর্তনপূর্ণ। কিন্তু এতেও দৃষ্টিভ্রান্ত ছিল তাই অমৃতবাজার পত্রিকা বক্তব্য নয় ব্যক্তিত্ব কাজের ওপর জোব দিতে পরামর্শ দেয়।^৬ মনে হয়, সুরেন্দ্রনাথ অথবা ভাবত সভার বক্তৃতাশক্তি ওপর বিশ্বাস এর কারণ। কিন্তু শীপের সভাপতি মহাবাঘা বতীন্দ্রমোহনের পক্ষে কোনও ব্যাপারেই বেশি সময় দেওয়া সম্ভব ছিল না। মহাবাঘা বতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে মামলা এর একটা প্রধান কারণ। এতে মহাবিভ নেতাদের প্রভাব শীপের ওপর যেতে বাওয়াই স্বাভাবিক। সেটা বইয় এং ব্যত পত্রিকার পক্ষে বিরুদ্ধিচ্ছ। তাই রইস আশ্রয় রাখত শীপকে জমিদারী দায়িত্বের সঙ্গে মহাবিভ উজ্জলার ঘোষণা বহলে মনে করেছিল।^৭

সক্রিয় বাহ্যনীতিবিশিষ্টা সত্ত্ব কারণেই জানতে উৎসাহ ছিলেন শীপের প্রকৃত নীতি ও কার্যক্রম। সুরেন্দ্রনাথের বেকলী আশা করেছিল যে শীপ ন্যাপনাল কলিকাতার কার্যক্রম প্রদর্শন করেবে।^৮

“একই সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথকে
দলে নিলেও তাঁকে কর্তৃত্ব
করতে দেওয়া হয়নি। অবশ্য
কলিকাতায় কংগ্রেসের
দ্বিতীয় অধিবেশনের আগেই
রাজনৈতিক কাজকর্ম অনেক
বেড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে
বেড়েছিল গোষ্ঠীবন্দ্ব।”

বাবিভক্তার মধ্যেও কলিকাতায় বাইরে আইনসভা,
পার্টীসারী ব্লক ও রাজত্বের অধিকার ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে
জনসভা হল নানান জটিলতার। বিক্রমচাঁদ্যর অদ্বৈতবাজার
পত্রিকার যোগ পরিবার জনসভা সংঘটিত করেছিলেন। এতে
উপস্থিত নিয়ে ও বটেই জনসভার সভাপতির হয়ে নিয়ে তুলসী
বাবুন্যায় শুরু হল পর-পত্রিকার জনসভার রাজনীতি থেকে
নিষ্কৃতি সেলেম বোম্বাইয়েহা। কিন্তু আইনসভার প্রতিিনিবন্ধের
গ্রন্থ ও রাজত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গদ্যের দ্বারা
নহরও ও বটেই ভারত সভা সভাপতিত্ব করেছিলেন হুগলি,
হাওড়া, বেলিশীপুর ও বাংলার নানা দুর্গম জায়গায়। এসব
কাজের ফলে ভারত সভার ক্ষমতা বাড়ছিল দ্রুতগতিতে।
অন্যদিকে সুরেন্দ্রনাথ আশ্রয় চৌরী সলাতে থাকেন হিন্দু ও
মুসলমান নেতাদের একত্ব করতে। প্রাথমিক ক্রমে এ কাজ
কল হুগলি বলা যায় না। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের প্রত্যেক
সম্মেলনের দ্বারা তাই মুসলমান নেতারা এগিয়ে এসেছিলেন।
উল্বেকির এক জনসভার সভাপতিত্ব করেন সৈলম আনন্দের
হোসেন। সেখানে বক্তাদের মধ্যে ছিলেন বৈদ্যদী নুসল হুগলি।

এটা স্মৃতি হল ক্রমে যে ভারতসভা ও সুরেন্দ্রনাথকে বাইরে
রয়ে বাংলায় রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্ভাবনা কম। ফলে

শীঘ্র কর্তৃপক্ষ মহাবাজা বস্ত্রপ্রমোহনের সভাপতিত্ব কার্যনির্বাহক
সমিতি তৈরি হল। সম্পাদক হলেন তিনজন। পুরেন্দ্রনাথ
হাফোশাখায়া, হাবকানাথ চক্রবর্তী ও শিখিলাকৃষ্ণ হাফোশাখায়া।
পাঁচজন সহ-সভাপতিত্ব মধ্যে তিনজন মুসলমান। অবশ্য হিন্দু
পেট্রিট মায়ে হুজুর হিন্দু সহ-সভাপতির কথা জানায়। এরা
হলেন : (১) দুর্গাচরণ লাহা, (২) নবাব আসদুর আলী, (৩)
খানবাহাদুর শীলার জর, (৪) নবাব জেহান কামির খান ও (৫)
উমেশচন্দ্র হাফোশাখায়া।

সুরেন্দ্রনাথের অন্তর্ভুক্তি ফলে শীঘ্রই কাজের দ্বারা ফলে
গেল এটা বলা যায় না : ভারত সভার নেতারা আইনসভার
প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর ব্যাপারে, চাপক শ্রিত্তির বিরুদ্ধে ও
বাংলাদেশের উৎসাহিত করার কাজে নিজেদের পাঠেই চলেছিলেন।
এ ধরনের সভা যে শিকড়হীন গাছের মত সে কথা আমলাদের
মতই সরবে যোগ্য করা হয়েছিল হুগলি আদ্য ভারত সভার
ও অদ্বৈতবাজার পত্রিকার তরফে।” অন্যদিকে পাঠেরীয়ার ডর
পেয়েছিল যে আন্দোলন হুগলি বেতে পারে উত্তর ভারতের
বীরখান চাষীদের মধ্যে। সুরেন্দ্রনাথ নিজেও আন্দোলনের
সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তাই তিনি চরমপন্থী
গাজনীতির উদ্ভব বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে সচেতন করে দিয়েছিলেন
একদিকে, আর অন্যদিকে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক আন্দোলনের
পর না নিয়ে জনা বলেছিলেন : “

কিন্তু অভিজাত জমিদার-ঘরবির নিয়ন্ত্রিত শীল ইংরেজ
কর্তৃপক্ষের সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হতে চাননি। এ রকম
টানাশোড়ের ফলে শীঘ্রই পক্ষে ভারত সভার মত তৎপরতা
দেখানো সম্ভব হয়নি। কিন্তু একইসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথকে ফলে
নিলেও তাঁকে কর্তৃত্ব করতে দেওয়া হয়নি। অবশ্য কলিকাতায়
কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনের আগেই রাজনৈতিক কাজকর্ম
অনেক বেড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছিল গোষ্ঠীবন্দ্ব।
অদ্বৈতবাজার পত্রিকা কংগ্রেসকে সতর্ক করে দিয়েছিল যে
সভাপতি সভাপতিত্ব বিষয়, যেমন সাময়িক যাতে বাধ্যবাদ নিয়ে
মাথা ঘামানো ঠিক হবে না মরং কংগ্রেসে ঘোটে ঘোটে কমিটির
দ্বারা এক-একটি বিষয় নিয়ে বিতর্কিত আলোচনা হোক।”
এ পরামর্শ কংগ্রেস নেতারাও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন। হুগলি
আদ্য ভারত সভার কংগ্রেসের লিয়ারেল ফলের প্রতি সমর্থন
নিশ্চা করে।” কংগ্রেসের কাছে দুর্গাচরণ অগ্রাহ্য হলে
অদ্বৈতবাজার পত্রিকা সবচেয়ে মন্থন করে যে কংগ্রেস দল কম
কাজ, বেশি কলার রাজ্য নিয়েছে।”

কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন দুর্গাচরণ সম্পন্ন করার
জন্য অগ্রদূত সমিতি তৈরি হল। শীঘ্রই নেতারা গ্রাম সবাই
ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ হাফোশাখায়াও এ সমিতির সদস্য
ছিলেন।” শুধু তাই নয় কংগ্রেসকে জাতীয় আন্দোলনের দ্বারা
সঙ্গে বৃত্ত করার জন্য দ্বিতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনকে জাতীয়
আন্দোলনের চতুর্থ মহাসভা হিসেবে বর্ণনা করেন। এ দ্বারা
তিনি ব্যর্থতার মুসলমান নেতাদের কংগ্রেসে বোল বোঝার জন্য

“কংগ্রেসের অধিবেশনের
সময়েই বাংলা, বিহার,
উড়িষ্যার প্রতিনিধিদের
নিয়ে আলাদা সভা হল
যাতে কংগ্রেসের কার্যক্রম
জনগণ জানতে পারেন। এ
কমিটিতে সম্পাদক ছিলেন
সুরেন্দ্রনাথ ঝমং। এটাকে
একধরনের পালা বদল বলা
যেতে পারে।”

অনুরোধ জানিয়েছিলেন যাতে কংগ্রেস প্রকৃত অর্থে জাতীয়
মহাসভার রূপান্তরিত হয়।^{১১} কংগ্রেসের অধিবেশনের সময়েই
বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার, প্রতিনিধিদের নিয়ে আলাদা সভা হল
যাতে কংগ্রেসের কার্যক্রম জনগণ জানতে পারেন। এ কমিটিতে
সম্পাদক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঝমং। এটাকে এক ধরনের
পালাবদল বলা যেতে পারে। কমিটিতে একমুখে যেমন
প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় ছিলেন অন্যমুখে তেমনই ভারত
সভার আনন্দমোহন বসুর সঙ্গে বিহারের সন্দরউদ্দীন, বাংলার
ডাক্তার তমিজুদ্দীন ও বোম্বা আবদুল আলিম। এই কমিটির
গণমুখী চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় বদল ক্রিক হর যে শিল্প
সংক্রান্ত শিক্ষা ও কৃষীদের বিষয়ে তদন্ত করা হবে।^{১২} কিন্তু
এওৎসাহকেও বেঙ্গল ন্যাশনাল লীগ, ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন ভারত
সভার পাশাপাশি পনের বছর অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল।
কংগ্রেসের গভীর অধিবেশনে লীগের প্রতিনিধিদের নাথ কেন
উল্লেখযোগ্য। উদ্দেশ্যেই মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যেভাবেও
কালীচরণ মুখোপাধ্যায়, জামকীনাথ ঘোষাল, শঙ্করজ
মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বসু জড়িত ছিলেন লীগের তরফে।^{১৩}
প্রথম কংগ্রেস সভাপতি, রাইস অ্যান্ড রায়তের সঙ্কল্পে এমনকি

সুরেন্দ্রনাথ বসুও সুরেন্দ্রনাথের প্রকৃত ঘনিষ্ঠ ছিলেন একথা বলা
যায় না। প্রথম বঙ্গীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে লীগের
প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দ্বিতীয়নাথ
ঠাকুর।^{১৪}

ফলে কংগ্রেসের বাইরেও ও ভেতরেই সমালোচকদের
বিবোধিতা সত্ত্বেও সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও ভারত সভা
কংগ্রেসের তরফে গণমুখী আন্দোলন বড়ে ভালোর চেষ্টা
করেছিলেন একথা সহজেই বলা যায়। এর সীমাবদ্ধতা ছিল
নিশ্চয় কিন্তু সেদিনের পরিস্থিতিতে এ কার্যক্রমের গুরুত্ব যথেষ্ট
ছিল। মহাকাণীষ পানসকালের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের
জাঁকজমকের মধ্যে আইনসভার সংস্থায় হল না। বোম্বা সেল,
ঔপনিবেশিক পানস ন্যাশনালিষ্ট বাহিও সহজে যেমন বেধে না।
তবুও বাংলা কংগ্রেসের বহু বিতর্ক শোভা সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব
প্রদর্শনে যেমন বেরানি। তবু জাতীয় আন্দোলন বড়ে ভালোর
টার্স আন্তরিক চেষ্টার ফলটি ছিল না। আর এখানেই তাঁর কৃতিত্ব।

সূত্রনির্ণয়

১. শিপিংস্ট্র পানস, 'মেম্বরস অফ দ্য লাইফ অ্যান্ড টাইমস' প্রথম
বর্ষ পৃ: ১০ ও ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিস্ট ইন প্রিন্সিপালস অ্যান্ড
পারসোনালিটি পৃ: ১৮।
২. রাইস অ্যান্ড রায়ত ২৪ জানুয়ারি, ২৬ ডিসেম্বর ১৮৮৬।
৩. আবদুলকাদের পত্রিকা ৪ মার্চ ১৮৮৬।
৪. আবদুলকাদের পত্রিকা ১১ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৬।
৫. কেন—কংগ্রেস সভার সংখ্যা—আরমেন প্রিন্সি, ভারতের
জাতীয় সংগ্রাম ও জাতীয় কংগ্রেস ১৮৮৪-১৯০৭ পৃ: ১৭, ১৮।
৬. বেকলী, ২৬ জুন, ৭ আগস্ট ১৮৮৬।
৭. আবদুলকাদের পত্রিকা, ৫০ ডিসেম্বর, ১৮৮৬।
৮. হিন্দু পেস্ট, ১২ এপ্রিল, ১৮৮৬।
৯. ইন্ডিয়ান সিক্স, ৮, ১০, ১৭ এপ্রিল, ১৮৮৬।
১০. আবদুলকাদের পত্রিকা, ১৪ এপ্রিল, ১৮৮৬।
১১. ২
১২. রাইস অ্যান্ড রায়ত, ২১ এপ্রিল ১৮৮৬।
১৩. বেকলী, ১০ মার্চ, ১৮৮৬।
১৪. বেকলী, ১০ এপ্রিল, ১৮৮৬।
১৫. আবদুলকাদের পত্রিকা, ৮ এপ্রিল, ১৮৮৬; রাইস অ্যান্ড রায়ত, ২২
মে, ২২ জুন, ১৮৮৬
১৬. বেকলী, ১ মে, ১৮৮৬
১৭. আবদুলকাদের পত্রিকা, ২৪ নভেম্বর, ১০ ডিসেম্বর, ১৮৮৬
১৮. রাইস অ্যান্ড রায়ত, ২১ আগস্ট, ১৮৮৬
১৯. আবদুলকাদের পত্রিকা, ২০ ডিসেম্বর, ১৮৮৬
২০. বেকলী, ২ অক্টোবর, ১৮৮৬
২১. বেকলী, ১১ ডিসেম্বর, ১৮৮৬
২২. বেকলী, ১ জানুয়ারি, ১৮৮৭
২৩. বেকলী, ৫ ডিসেম্বর, ১৮৮৭
২৪. বর্তীক ঘোষ (সম্পাদিত), বেঙ্গল প্রতিনিধিদের কনকর্ডেন্স, ১৮৮৮

[বৌদ্ধ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ইন্ডিয়ান অনুল্যান্ড-২' গ্রন্থ
থেকে নেওয়া]

১৯২৩ সালের পৌর আইন কলকাতার মুক্তি সনদ

দেবজ্যোতি বর্মণ

“আমার জন্মভূমির জন্য অশেষ করেছি
উদ্ধতলভের সুখিন, অতীতবিশেষের প্রজা
অভিগেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, স্থানীয় স্বায়ত্ব
শাসনের অপরিমেয় অগ্নির্বল অদূর ভবিষ্যতেই আমার জন্মভূমি
এই শহর যা আমার প্রিয়জনদের বাসভূমি, আমার সম্মান-সম্মতি
এবং আমার সম্মান-সম্মতির সম্মান-সম্মতির জন্য নিমিত্ত নির্ধারিত
বাসভূমি এবং যাকে কেন্দ্র করে আমার প্রিয়তম, মমুরতম ও
কেবলতম সব সম্পর্কে ঘনীভূত হয়েছে, সেই শহরে ডিরে
আসবে—এইসব আশা ও বিশ্বাস নিয়ে আমি বেঁচে থাকবো।”,
একথা বলেছিলেন স্যার সুব্রহ্মনাথ বানার্জি যাকেই বিল
আইনে পরিণত করার মিনে অর্থাৎ ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৩।

প্রিয় শহরে পৌর স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার-সেবে বাওয়ার জন্য
সুব্রহ্মনাথ বেঁচেও ছিলেন। এই পৌর স্বাধীনতা তাঁর অমূল্যতম
ধানের ধন। পৌরজগতের তাঁকে আজকের মিনে সেই শহরেই
স্বাধীনতাকে পুনরায় বিশাল অবস্থায় দেখবার জন্য বেঁচে থাকতে
হয়নি।

মূল নীতি

স্যার সুব্রহ্মনাথ ২২ নভেম্বর ১৯২১ বর্ষীয় আইন পরিষদে
তাঁর কলকাতা মিউনিসিপ্যাল বিল উপস্থাপন করেন। এই উপলক্ষে
তাঁর ভাষণ ছিল সজাগ এবং ন্যায্যোচিত। তিনি আইনটির
অন্তর্নিহিত নীতিগুলি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন। বিলটির
চূড়ান্ত খসড়া শেষ করার আগে তিনি জনমত সংগ্রহ করেছিলেন।
১৯২১ সালের মার্চ মাসে তিনি ভারতীয়, ইউরোপিয়, সরকারি
আমলা এবং বেসরকারি ব্যক্তিবৃন্দ সকলকেই একটি সম্মেলনে
আহ্বান করেছিলেন। খসড়া বিলটি কলকাতা পৌরসভার কাছেও
পাঠানো হয়েছিল অতিমত চেয়ে। পৌরসভা এটি উপস্থিতি গঠন
করে বিলটির বিভিন্ন নিক পর্যালোচনা করারায় ব্যবস্থা করেছিল।
উপস্থিতিগুলির বিশেষ্ট পাওয়ার পর পুরোটা সরকারকে তার
মতামত পাঠিয়ে দিয়েছিল।

সর্বশেষ কলকাতার নাগরিকবৃন্দ যাতে শহরের অবস্থা সম্পর্কে
আগ্রহী থাকে তাই নিয়ে সুব্রহ্মনাথ সব সময়েই সতর্ক ছিলেন।



কলকাতার প্রশাসনে নাগরিকদের চিন্তা-ভাবনা যাতে উপযুক্ত
মর্যাদা পায় সেমিকে তাঁর বিশেষ মনোর ছিল। জনমতের ক্ষমতা
সম্পর্কেও তাঁর খড়ীর আস্থা ছিল এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে
অশাসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার এই জনচেতনা।
তাই তিনি তিনবার বিলটি গিলেট কমিটিতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।
জাম্বাজাও জনসাধারণের অবিকাংশই যাতে বিলটি সম্পর্কে

“সর্বশেষে জনপ্রিয়তার ভিত্তি হওয়া উচিত জনমতের সাহায্যে কর্মক্ষমতা সুনিশ্চিত করা।

অতিমত জানাতে পারে সেজন্য বিলটির ব্যাপক প্রচারণে ব্যবস্থা তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিয়ে করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন “সুশাসন ব্যবস্থাসমূহের বিকল্প হতে পারে না।” জমি শেয়ারভার জন্য চেয়েছিলেন নির্ভরাল ব্যবস্থা গঠন। সেইজন্যই পৌর প্রশাসনের দায়িত্ব ক্রমশঃ নির্বাহিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে হস্তান্তর করতে চিন্তা করেছি। যদিও এই কাজের জন্য সাময়িকভাবে কোনও কোনও ক্ষেত্রে কর্মক্ষমতার সমস্যা দেখা যেতাম আশঙ্কা ছিল। তবুও সুবেন্দ্রনাথ সে দৃষ্টি নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে “সর্বশেষে জনপ্রিয়তার ভিত্তি হওয়া উচিত জনমতের সাহায্যে কর্মক্ষমতা সুনিশ্চিত করা।... জনমত যে ব্যক্তিগততার পতিত্বস্ত সে কথা আমরা কেবল মনে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না।”

এলাকার সম্প্রসারণ

এই আইনের অধীন কলকাতা পৌরসভার চৌহদ্দি অর্ন্তত সম্প্রসারিত হয়েছে। কাশীপুর, ডিংপুর, মানিকভাড়া, গার্ডেনবীচ এবং পুরসভার পরঃপ্রণালীয়া পাশ্চিম টেনশনের সংলগ্ন টোলিগঞ্জে কিছু অংশ ও ডক সম্প্রসারণের জন্য সাউথ সুবার্বান মিউনিসিপ্যালিটির কাছ থেকে অতিব্রীত জমি কলকাতা পৌরসভার এলাকাভুক্ত হলো। এর ফলে ১১.৭৫ বর্গমাইল এলাকা পুরনো পৌরসভার ১৮.৭৫ বর্গমাইলের সঙ্গে যুক্ত হলো। মোট জনসংখ্যা ঠাঁড়ালো ১০,৫৫,০০০ (বাড়তি ১,১১,০০০ জন নিয়ে)।

কিন্তু এই বাড়তি এলাকার উল্লেখ টোলিগঞ্জের অঞ্চল ব্যাধ দিয়ে) দুই বিলে ছিল না। সুবেন্দ্রনাথ-সাহিত্য মিউনিসিপ্যালিটিগুলির চেয়ারম্যান ও ডাইন চেয়ারম্যানদের সঙ্গে পরামর্শ করার পর জানতে পারলেন যে তাঁরা কলকাতা পুরসভার সঙ্গে সাংস্কৃতিক চেয়ারম্যানের বিরোধী। সুবেন্দ্রনাথ তাঁদের কথা মেনে নিলেন। কারণ তিনি জানতেন পৌর এলাকার নতুন সীমা-নির্ধারণ নিয়ে জনমতকে উপেক্ষা করা কঠোর বিপজ্জনক। কিন্তু প্রত্যাবলী সাংবাদিকেরা এবং বকীর আইন পরিষদের মধ্যে এই সাংস্কৃতিক পক্ষে প্রবল সমর্থন ব্যক্ত হতে লাগলো। এই সমর্থন ছিল প্রধানতঃ জনবাহ্য এবং সাংস্কৃতিক অঞ্চলগুলির অনুরূপ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই। এইসব ব্যাপির প্রতি সন্ধান দেখিয়ে সুবেন্দ্রনাথ

একটা সীমানা নির্ধারণ করিন পঠন করলেন। এই কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন প্রচলনের আওতাভুক্ত চেয়ারম্যান এবং পুরন সনস নিযুক্ত হলেন, ডাঃ শংকর দ্বানার্ণি এবং ডাঃ (বর্তমানে মায়) জন উডহেড। এরা কখনই পুরসভার সঙ্গে কোনওভাবেই যুক্ত ছিলেন না। সুবেন্দ্রনাথের এই কমিশন পঠন সাংবাদিকদের অতিমত ছিলো। মিলেই কমিটি এই কমিশনের সর্বসম্মত সুপারিশ গ্রহণ করলো। এই সুপারিশে মানিকভাড়া সাংস্কৃতিক অনুমোদিত হয়েছিল কিন্তু কাশীপুর-ডিংপুর ও গার্ডেনবীচের সাংস্কৃতিক অনুমোদন পাননি। অবশ্য আইন পরিষদের জোয়ালো অতিমতের নকল এই দুইটি অঞ্চলও শেষ পর্যন্ত কলকাতা পুরসভার সঙ্গে যুক্ত হল। সাংস্কৃতিক এলাকাগুলির কলকাতার সঙ্গে যুক্ত হিশেব সুবিধা যেওমায় ব্যবস্থা হলো। যেহেতু শহরতলীর এলাকাগুলি এখনই কলকাতার সব সুখ-স্বাস্থ্য উপভোগ করতে পারছে না, তাই প্রথম বছরে বাড়তি হয়ে টোল অংশের বিতে হবে না এবং পরবর্তী সনে বছরে হিশেব সুবিধাদানের ভিত্তিতে তাদের কাছের টোল নেওয়া হবে।

ভোটামিকার

ভোটামিকারের ক্ষেত্রে কিছু সংশোধন এনে ব্যাপকতার ভিত্তি রচিত হল। আগে ব্যাসটিক ২৫ টাকা কর এবং টোল ব্যাপক ভাড়া মিলে ভোটামিকার পাওয়া যেত। এখন তা কমিয়ে ১২ টাকা করা হল। তদ্ব্যতী বার্ষিক ভোটামিকার ভাড়া পূর্ববর্তী ৬ মাসে মাসিক ২৫ টাকা ভাড়া বিধে পূর্বে বাস করেন তাঁরাও ভোটামিকার বোণাতা অর্ন্তন করবে। হাউল্যান্ডের ভোটামিকার নেওতা হল। তাঁরা নির্বাচনের ৫ মাস গ্রহণ করবার অধিকার পেলো।

কাউন্সিলারদের সংখ্যা

আগের আইনে কমিশনারদের মোট সংখ্যা ছিল ৫০। এখন বেড়ে হল ৮০। এখন থেকে তাঁদের বলা হবে কাউন্সিলার। সুবেন্দ্রনাথ বললেন “এইসব পরিকল্পনা পুরসভার গণতান্ত্রিকীকরণের শ্রেয় অগ্রগতি। এর ফলে শহরের পরিচালনা ব্যবস্থার ন্যায়বিক্রমের এবং বিভিন্ন বহুদৈনিক সমস্যাগুলি হাফের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ ব্যাপকতার হওয়া সম্ভবপর হল।” প্রতিনিধিদের ব্যতিক্রম সংকেলনে সুপারিশ করা হয়েছিল কাউন্সিলারদের ৪/৫ অংশ হবে নির্বাচিত, কিন্তু ছিল শেষ পর্যন্ত এটা ৯/১০ অংশ করা হল।

১। (১০টি মুন্সিপালের জন্য সংরক্ষিত আসন সহ)	
সাবাঞ্চ ভোটামিকারের নির্বাচিত কাউন্সিলার	৫৫ জন
২। চেয়ার অফ কম্যান্ড থেকে নির্বাচিত	১ জন
৩। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে নির্বাচিত	৪ জন
৪। শ্রেণী কমিশনার থেকে নির্বাচিত	২ জন
৫। কাউন্সিলারদের দ্বারা নির্বাচিত (অলভারম্যান)	৫ জন
৬। সরকার কর্তৃক যোনীত	৮ জন

মোট ৮০ জন

সাধারণ ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত কাউন্সিলারদের সংখ্যা ২৫ থেকে বাড়িয়ে ৫৫ করা হল এবং ঘনোবীত কাউন্সিলারের সংখ্যা ১৫ থেকে কমিয়ে ৮ করা হল। তাদের আইনে ৫০ জন কমিশনারের মধ্যে মোট ৫৫ জন নির্বাচিত হতেন। নতুন আইনে ৮০ জন কাউন্সিলার হলো ৭২ জনই নির্বাচিত হলেন। অসভ্যরাবানের পক্ষ থেকে একটি অভিনব ব্যবস্থা। এই সম্পর্কে সুপ্রসন্ননাথ বলেছেন, “সব সময়েই কিছু মানুষ থাকেন সবায়, তাদের স্বীকৃতিস্বরূপ বৈশিষ্ট্যের জন্য প্রত্যেক নির্বাচনের ঘটি-কাজেই বা দুর্ভিক্ষ নেওয়া প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। কিন্তু এঁদের মধ্যে অনেকেরই উপস্থিতি পৌরসভার সম্মান বৃদ্ধি ঘটায় এবং তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ পৌরসভার আলোচনাকে লব্ধ করে তোলে।”

পর্যবেক্ষণ এলাকাগুলির সংখ্যায় ফলে কাউন্সিলারদের সংখ্যা বেড়ে গেল। ফিলটি আইনে পরিণত হওয়া দুইভাগে এই সংখ্যা শেষ পর্যন্ত দাঁড়ালো:

১। (১০টি মুন্সিপালদের জন্য সংরক্ষিত আসন সহস্রত)	
সাধারণ ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত কাউন্সিলার	৬০ জন
২। চেম্বার অফ কমার্স থেকে নির্বাচিত	৬ জন
৩। ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান থেকে নির্বাচিত	৪ জন
৪। শেট কমিশনার থেকে নির্বাচিত	২ জন
৫। কাউন্সিলারদের দ্বারা নির্বাচিত (অসভ্যরাবান)	৫ জন
৬। সরকার কর্তৃক ঘনোবীত	১০ জন

মোট ৯০ জন

ইউরোপিয়ন এবং মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব

১৮৭৬ সালের আইন অনুসারে চেম্বার অফ কমার্স, ব্যবসায়ী সমিতি এবং শেট কমিশনারস্ মোটামুটি ইউরোপিয়ানদেরই পরিচ্যে। পুরনো প্রতিনিধিত্ব করত। এছাড়া সাধারণ ওয়ার্ডগুলিও ইউরোপিয়ানদের কাছে উন্মুক্ত ছিল। ৮০টি ওয়ার্ডের মধ্যে বসন্ত: ১২টিতে ইউরোপিয়ানরাই প্রতিনিধিত্ব করতেন। এই ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বকে অতিশয়া হল আইন পরিষদে প্রতিনিধিত্বের নিশ্চিত হয়েছিল।

মুসলিমদের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি একটি কঠিন খালার। গত ব্যারো বছরের (১৯১০-১১ থেকে ১৯২১-২২) হিসাব বলছে যে মুসলিম সম্প্রদায় কখনই ৫ জনের বেশি কাউন্সিলার পাইতেন না। সর্বমোট থেকে এই সংখ্যা ১১ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেয়। সুপ্রসন্ননাথ আরও লক্ষ্যন ব্যক্তিতে ফেন। ফলে মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ১০১। এটা সাধারণ ভোটারদের জন্য বিশিষ্ট আসনের এক-ভূমিগোষ্ঠের সারনা করা। সাধারণ আসন দুইজনী মুক্তি দেখান যে ১০ সংখ্যটি অঙ্গার। বাই থেকে ফিলটি ঘন ফুডার্স পর্যায়ে শেটলস ওজন মোট সংখ্যা হল ১৫।

“সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধারণা বহুমূল হয়ে যায় যে দুর্বলতর দেশবাসীদের জন্য যা করণীয় তা তো করাই হয়েছে সুতরাং তারা (সংখ্যাগুরুরা) নিজেদের স্বার্থ নিয়েই এখন স্বচ্ছন্দে ব্যাপৃত থাকতে পারেন। রাজনৈতিক জীবনের সার কথা হল পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ার সুসম্পর্ক স্থাপন।”

জিউনিয়ন এরই দৃষ্টে বরাদ্দ লুপ্ত নিবাসিতহুণীয়া ব্যবস্থা—এই দ্বিধা উদ্ভূত তর্কবিতর্ক চলছিল। সুপ্রসন্ননাথ আবেগপূর্ণ ভাষায় অতিরিক্ত নির্বাচকহুণীয়া ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন। হাউস-চেম্বারস্‌ফোর্ড রিপোর্টে সম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচকহুণী গঠন করার যে ব্যবস্থার কথা করা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে সুপ্রসন্ননাথের দৃষ্টি ছিল।

প্রথমতঃ, শ্রেণী এবং মতবাদের ভিত্তিতে বিভাজনের অর্থ হবে পারস্পর-বিরোধী রাজনৈতিক নিখিলের উদ্ভব।

দ্বিতীয়তঃ, এই ব্যবস্থা মানুষকে নগরিক হতে শেখায় না, দলপন্থী হতে শেখায়।

তৃতীয়তঃ, এই ব্যবস্থার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এক বছরের সুনির্দিষ্ট নিয়োগব্যয় আত্মসমর্পিত নিম্ন থাকে এবং সংখ্যাগুরুদের মধ্যে যোগ্যতা অর্জনের উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

চতুর্থতঃ, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধারণা বহুমূল হয়ে যায় যে দুর্বলতর দেশবাসীদের জন্য যা করণীয় তা তো করাই হয়েছে সুতরাং তারা (সংখ্যাগুরুরা) নিজেদের স্বার্থ নিয়েই এখন স্বচ্ছন্দে ব্যাপৃত থাকতে পারেন। রাজনৈতিক জীবনের সার কথা হল পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ার সুসম্পর্ক স্থাপন। এই ব্যবস্থার এরকম সম্পর্ক কখনই হবে না।

পঞ্চমতঃ, রাজনৈতিক সম্পর্কগুলি এই ব্যবস্থার ফলে বাঁধা হতে পারে।

বর্তমানে, এই ব্যবস্থা স্বাধীনভাবে জাতীয় প্রতিনিধিত্বের প্রাথমিক বাহক হয়ে।

মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্বের জন্য তিনটি বিতর্কিত পথ খোলা ছিল। এক সাম্প্রদায়িক ভোটদানের ব্যবস্থা। দুই, সরকারি মনোনয়ন। তিন, হিন্দু নির্বাচন কেন্দ্রগুলিতে আসন নিশ্চিত করে রাখা। সুপ্রসন্নাত প্রথম দুটি পথ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করলেন। তৃতীয় পথটি গ্রহণ করলেন। হুসিয়ারি ঘিরে তিনি বললেন, 'শৌরসভার সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বই সমগ্র খালারটি সীমাবদ্ধ থাকবে না। রাজধানীর বাইরে স্থানীয় শৌরসংস্থাগুলিতেও এই ব্যবস্থা প্রসারিত করতে হবে। ভ্রমবর্জিত বিচারক প্রতিষ্ঠা একটির পর একটি কেন্দ্রকে গ্রাস করে ফেলবে। আমরা যদি এখনই এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে রুখে না গাঁড়াই, তবে ভবিষ্যতে এই পণ্ডিত অপ্রত্যাশিত হতে উঠবে। আর এই পরিস্থিতি স্বাধীনতার সীমানাকে প্রসারিত করার পরিবর্তে সংকীর্ণতা এবং নিষেধাত্মক ব্যবস্থাসমূহের প্রচুর দেখে।"

রাজধানীস্থ রাজ্যচলন পালও মুক্তি দেখান যে যদি একজন মুসলিম প্রতিনিধি শৌরসভার কোনও একটি ওয়ার্ডের সমস্ত বাসিন্দাদের প্রতিনিধিত্ব না করে ফেলেন তবে এক-তৃতীয়াংশ বা এক-তৃতীয়াংশের প্রতিনিধিত্ব করেন তাহলে তাঁর প্রতিনিধিত্বের পণ্ডিত হয়ে গাঁড়ায় আদিক, সামগ্রিক নয়। কিন্তু যৌলতি নাসিব

"সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে
প্রতিনিধিত্বের দাবিকে
আমার ধর্ম বিশ্বাসের স্তরে
উন্নীত করার সকল কৃত্রিম
প্রচেষ্টাকে আমি তীব্রভাবে
নিষ্পত্তি করি। আমার মুসলিম
ভাইদের কাছে আবেদন
করছি যে তাঁরা ইতিহাস ও
দর্শন পড়ে সেসব থেকে
শিক্ষাগ্রহণ করুন।"

আমির বক্তব্য সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের সমর্থক এবং তাঁকে কর্মবশি সমর্থন করলেন মুসলিম এম-এল-সি'রা। ডাঃ সুবাহী অংশা মুসলমানদের আসনের সংখ্যা বৃদ্ধির দাবি করেছিলেন ও আসন সংরক্ষণের অধিক নির্বাচনগুলোর বিরোধী ছিলেন না।

আবদুল্লাহ সুবাহীর বক্তব্য

ডাঃ (শরৎকালে স্যার আবদুল্লাহ) সুবাহী তীব্র ভাষায় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচনগুলোর গঠনের সমর্থকদের সমালোচনা করলেন। তিনি বললেন,

"সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবিকে আমরা ধর্ম বিশ্বাসের স্তরে উন্নীত করার সকল কৃত্রিম প্রচেষ্টাকে আমি তীব্রভাবে নিষ্পত্তি করি। আমার মুসলিম ভাইদের কাছে আবেদন করছি যে তাঁরা ইতিহাস ও দর্শন পড়ে সেসব থেকে শিক্ষাগ্রহণ করুন। প্রাতি-বিরোধী এবং তৃতীয়াংশ শিল্পায়নের মধ্যে পণ্ডিত দীক্ষার ঘিরে একটি সমাজ তৈরি হয় না। সমাজের ভিত্তি হল প্রাণবন্ত গতিসমূহ। এইসব পণ্ডিত এগিরে হলে কালের বহাধা স্তব্ধ হয়ে পড়ে। ব্যক্তি এবং জাতির ক্ষেত্রে যেমন সন্তানবাসনমূহের ক্ষেত্রেও তেমনই সত্য। যে কালের গতির সঙ্গে গাফা মিটে চলতে না পারলে কিংবা পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে না পারলে ধ্বংস অনিবার্য। আমরা যে বরফা ঘিরে আইন পরিষদে প্রবেশ করেছি সেই বরফা অঁততে পড়ে থাকে আমাদের উচিত হবে না। এই ক্ষুদ্র বক্তব্য শেহিরে অনেক দূর আছে এক বৃহত্তর ও প্রশস্ততর চর্চা হা শেহিরে পৌঁছতে হয় মুক্তি ও শৌরসভার ফলস্বরূপ। হিন্দু-মুসলিম ঈর্ষার অর্থ অতীতে ঘাই থেকে থাক না কেন যতমানে এটা যন্ত্রণা, আত্মহনিক এবং অশুদ্ধ। যেই ঈর্ষাকে সামান্যতম আঘাতও মিতে চায় সে বলাবলি এবং বিশ্বাসঘাতক, নিজের ঘর্মের কাছে ও নিজের শোনের কাছে সে বিচ্যাতকী।"

ল্যাংফোর্ড জেমসের প্রত্যাব

সিলেট কমিটিতে হিপোর্ট বন্ধন বিবেচনার জন্য উপস্থিত হল ল্যাংফোর্ড জেমস একটি গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করলেন। তিনি বললেন:

"মুসলিম বক্তৃতির ১৩টি আসনের ব্যতিক্রমী প্রকার করে শিহরও এবং সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচনের নিষিদ্ধ বৃত্তিযুক্ত হলে গ্রহণ করেও আমি তাঁদের কাছে আবেদন করছি যে এই ব্যবস্থা অনন্তকালের জন্য বজায় রাখবার জন্য চপ না ঘিরে শুধু ন-বয়সের জন্য চালু রাখার প্রত্যাবে রাখি যেন।"

যিঃ জেমসের এই ৯ বছরের সময়সীমা নির্ধারণের ভিত্তি ছিল এই কথা যে ৮ বছর পরে ১৯১৯ সালের সংসদ প্রতিনিধির মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে এবং তারপরে একটি রয়্যাল কমিশন গঠিত হবে। এই কমিশন সংসদ প্রতিনিধির আরও অগ্রগতি নিয়ে বিচার

বিবেচনা করবে; কমিটিন কাজ শেষ করতে ব্যবস্থাবলক সমর্থ নিতে পারে। ইতিমধ্যে পৌরসভার এটি নির্বাচন হবে হয়েছে।

মিঃ জেমসের প্রস্তাব প্রস্তাব প্রদান হলেন ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯২০ তারিখে। সুপ্রভাষ ৪ মিনিটের মধ্যে অর্থাৎ ১৯ ফেব্রুয়ারি পরিষদে যোগ্য কর্মসে যে যেমন সরকারের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে এবং সরকার প্রাদেশিক সালোমন পেল করেছেন। এই সালোমন বিশাল ভোটাধিকার গৃহীত হয়।

সুপ্রভাষ ৫মিঃ অতিরিক্ত নির্বাচনও গীর্ষ সিটিতে পুনঃপ্রতিস্থাপন, শুধু তাঁর ঘন ঘুরে ঘনিষ্ঠ হয়েই আসেছিল ছিল। পূর্ব-উত্তরি প্রতিনিধি-সম্মেলনে এই বিষয় গীর্ষ সমান সমান ভাবে বিতর্ক হয়ে পড়েছিল। ৬ জন পক্ষে এবং ৬ জন বিপক্ষে। এই অবস্থায় ১ বছরের জন্য অস্থায়ীভাবে অতিরিক্ত নির্বাচনও গীর্ষ সিটি থেকে বিস্তারিত হওয়াটা কাঙ্ক্ষিত ছিল মনে করেছেন সুপ্রভাষ। তাঁর আশা ছিল যে ১ বছর পরে অতিরিক্ত নির্বাচনও গীর্ষ শহরে নাগরিক প্রীতির স্বাধীন হওয়া আরও বিস্তারিত হবে। এই সময়িক সিদ্ধান্ত হওয়া বা অপেক্ষা একটি অন্তিম সিদ্ধান্তে পরিণত হবে। অন্যথায় বিলাইটি হওয়া পাল কখন ঘাবে না এই আশা ছিল।

বিলটি ছিল তিনটি সালোমনকারী কর্মসূচির বাধ্য ছিল—শৌকসজ, সাধারণ কমিটি এবং চেয়ারম্যান—সাধারণ ইচ্ছা এতিয়ার ছিল বিভিন্ন ক্ষেত্রে। নতুন ছিল এ সব বাক্স করে নিয়েছে। এখন শৌকসজকে কর্মসূচি কর্মসূচি করা হয়েছে। পুনঃপ্রতিস্থাপন সিদ্ধান্তে কমিটি এবং চেয়ারম্যানকে কিছু কিছু কর্মসূচি প্রদান করতে পারবে অথবা কিছু কিছু কর্মসূচি সিদ্ধান্তে নিতে পারবে—এটা সম্পূর্ণ শৌকসজের নিজস্ব বিচারের উপর নির্ভর করবে।

চেয়ারম্যানের বৈধ কর্মসূচিতে ভাগ করে দেওয়া হল। শৌকসজের বাধ্য দেওয়া হল চেয়ারম্যান এবং কর্মসূচি গৃহীত দেওয়া হল প্রাথমিক কার্যবিধি অফিসারকে। দুইজনই শৌকসজের দ্বারা নির্বাচিত। চেয়ারম্যান প্রধান কার্যবিধি অফিসারকে ক্ষেত্রে সরকারি অনুমোদন প্রদান। এই অফিসার পক্ষে উপস্থিত থাকতে পারবেন এবং আলোচনার আগেও নিতে পারবেন কিন্তু কোনও প্রস্তাব উপস্থান করতে পারবেন না কিংবা ভোটাধিকারে ভাগ নিতে পারবেন না।

বেতন-সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারি অনুমোদন প্রদান হবে চেয়ারম্যান ও জন অফিসারকে ক্ষেত্রে। বলা, প্রধান কার্যবিধি অফিসার (টেক এডিক্সিটটি অফিসার), দুইজন তেওঁ এডিক্সিটটি অফিসার, টেক ইন্সপেক্টর এবং হেলথ অফিসার। অফিসার ছিল হালিক হাজার টেকার বৈধ বেতনভোগী কর্মসূচির জন্য সরকারি অনুমোদন আশীর্বাদ ছিল।

শৌকসজ কার্যকরী টেকার ব্যাপারে পুনঃপ্রতিস্থাপন ছিল যে কোনও ভাবে এক লক্ষ টেকার উপরে কর হলেই সেই কর্মসূচি

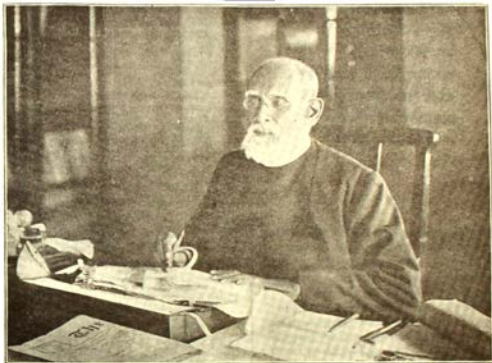
জন্য সরকারি হস্তান্তর প্রদান হবে। কিন্তু নতুন আইনে কার্যকরী আড়াই লক্ষ টেকার পর্যন্ত। অর্থাৎ লক্ষ বছরের মধ্যে বাৎসরিক ০ লক্ষ টেকা খরচ করা বাধ্যতামূলক। এখন সেই সর্ব বাক্স বাক্স হটে, উপস্থান নবমাস্ত্র এলাকার উন্নয়নের জন্য বছরে অনুদান এক লক্ষ টেকা প্রাথমিক শিকা ব্যবস্থা করে বিবিধ অতিরিক্ত কার্যে বড়ান। শৌকসজকে, পত্রবিভাগ ক্ষেত্রে, গোপাল নির্মাণ ও বস্ত্রব্যবসায় কর্মসূচি শৌকসজকে দেওয়া হল। বলা ও গৃহ-সংক্রান্ত আইন আরও সুসংগঠিত করা হল। লাইসেন্সপ্রাপ্ত গৃহ-নির্মাণ সার্ভিসের দ্বারা প্রাপ্ত এবং সাধারণ না হলে গৃহ নির্মাণের যে কোনও প্রাধান্য বাক্স না করার অধিকারও পেল শৌকসজ। অফিসার-প্রদানের আচরণগতি শৌকসজের নিয়ন্ত্রণের অধীন করা হল। সিনেমা হলে প্রদানের এবং থিয়েটার অনুষ্ঠানের সময় নির্বাচন শৌকসজের এতিয়ারকৃত হল। ফেলার দ্বারা এবং ফেলার সাধারণভাবে জন্য অর্থ যোগানের বাধ্য থাকল। দুর্ভাগ্যবশত হলে জরি পরিষিতির দ্বারা না উত্তর না হয় সেখানে আদ্যব্য, গর, কালনি ইত্যাদি অত্যাবশ্যক সামগ্রীর ডিপো ও শৌকস ফেলার জন্য শৌকসজকে কর্মসূচি দেওয়া হল। তবে এইসব ডিপো ও শৌকসজটা বোলা সরকারের অনুমতি সম্পন্ন।

আইন পরিষদে বিলাই পেল করা হয় ১৯২১ সালের ২২ নভেম্বর। সুপ্রভাষ নিজেই বিলাই প্রস্তাবের জন্য প্রস্তাব উপস্থান করেন। ১৯২২ সালের ০ জুলাই বিলাই সিঙ্গেল কমিটিতে প্রেরিত হয়। ১৯২৩ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি বিলাই কমিটির সিঙ্গেল নিজে বিবেচনা শুরু হয়। সভাপতি মহাশয় (প্রবাস সন্তোষের মহাশয়) বিলের দ্বারা—এতদ্বারা পর্বদালনার প্রস্তাবে যে পদ্ধতিতে প্রস্তাব অনুমোদন করেন তার ফলে প্রাপ্ত হয় যে প্রবাস, শুধু সংশোধনী প্রস্তাবসমূহ বিবেচিত হবে, তার পরে জেট বেওয়া হবে। আলোচনার এই দর্শে কোনও প্রস্তাব দেওয়া হবে না। ১৯২০ সালের ৭ মার্চ চুক্তিভাষে বিলা পাল হয়ে গেল। সুপ্রভাষ বললেন, ‘২৫ বছর পরে কলকাতা ডিউনিশিয়াল বিলের আদ্য পরিষদে সম্মিত হল এবং এই পরিষদে বিলা এখন যেখানে আইনসমূহের অধীকৃত হতে চলছে। ইতিমধ্যে আমাদের প্রাথমিক ও নাসরিক সিদ্ধান্তাবল্য ক্ষেত্রে বিলাটা এবং সুদূর প্রসারী পরিষদে হটে গেছে। অন্যথায়—সম্পর্কিত এবং অন্যান্য রিফাইন্স কলে গেছে। গত সভায় শেষ বছর (যখন কলকাতা ডিউনিশিয়াল বিলা প্রবাস পাল হতেছিল) তারতম্য বেখানে ছিল আদ্য আর সেখানে গঠিত নেই। আদ্য আদ্য করে নতুন বিলাই স্থাপিত অফিসার ডিপো ও স্থাপিত করল। আদ্য প্রীতির অন্ততম বছর এটা একটি যাত্রা বাক্স। বিতর্কের সময় অনেক কঠিন তথ্য প্রদান করা হয়েছে, অনেক আশাও দান হয়েছে। সে সব আদ্য আর মনে রাখা না আবশ্য। আদ্য সব ভুলে দিয়ে কমান্ডম্যান হয়ে আদ্য করান দিন।’

ভোটাধিকার উন্নয়নে কোনও ‘ডিভিডেন্ড’ দ্বারা না নিয়েই নবকলনের কলকাতা ডিউনিশিয়াল বিলা আইনে পরিণত হল।

সাংবাদিকতায় সুরেন্দ্রনাথ

অঞ্জন বেরা



উনিশ শতাব্দী বাংলায় অন্যান্য বর্ণন্য চরিত্রগুলির মতো সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির (১৮৪৮-১৯২৪) সাথে সাংবাদিকতার সম্পর্কেও বাংলা তথা ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। তবে পরাধীন ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুরেন্দ্রনাথের অবদান ও অবস্থানের একটি যেমন বিশেষ মাত্রা রয়েছে, তেমনই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সাংবাদিকতায় সুরেন্দ্রনাথের ভূমিকা।

এদেশে, বিশেষত বাংলায় সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উনিশ শতক থেকে বিশ শতকে উত্তরণের জীবন্ত প্রতীক হিসেবে সবচেয়ে আগে ঘর নাম মনে আসে তিনি হলেন-

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। কি তাৎপর্ষ্যেই না তবু তাঁর অকল্পিতই নাম! 'এ দেশন ইন মোকিং'। উনিশ শতকের শেষ তিন দশক থেকে বিশ শতকের প্রথম দু'দশক-আনান্নি দশক জুড়ে সক্রিয় ছিল তাঁর জনজীবন, সেই সুরেন্দ্রনাথের আত্মশ্রুতির নামকরণের ক্ষেত্রে অন্য কিছু ভাবাই যায় না। একটু অস্বস্তি ভাবাসুতো থাকলেও, এবেশে 'জাতীয়তাবাদের জনক' হিসেবে সুরেন্দ্রনাথকে চিহ্নিত করার মতো তুল কিছু নেই। যদিও একটা ঠিক যে, ১৯২৪ সালে সুরেন্দ্রনাথের বয়স দু'তু হর তখন সেই সময়কার জাতীয় জাঘনীতিতে তিনি প্রাণবিক্রান্ত হাবিবেহিসেন। আরও স্পষ্ট করে বললে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে জাতীয়

“আমাদের ইতিহাসে
জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের
প্রথম পর্বে সুরেন্দ্রনাথের
নাম চিরভাষ্য। সারা ভারত
জুড়ে ধর্মনিরপেক্ষ
রাজনৈতিক
জাতীয়তাবাদের উত্তরণের
পর্বের সঙ্গে ঠিক এখানেই
রয়েছে সুরেন্দ্রনাথের
সাংবাদিকতার বিশেষ
ভাণ্ডার্য।”

মুক্তি আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ সত্ত্বই সুরেন্দ্রনাথের
রাজনৈতিক জীবনের কার্যকর অঙ্গন হয়েছিল। কালেক্টরেটের
ফিক থেকে ১৯২০ সালে সুরেন্দ্রনাথ ও চিত্তরঞ্জন একই বছরে
শেখিঃদাস ত্রাস করেছিলেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জন ছিলেন
সুরেন্দ্রনাথ-উত্তর পর্বের নেতা। তাহলে আদর্শ লাগলেও
তৎকালীন পরিস্থিতিতে তা ঘটেই সম্ভবিস্থ ছিল যে ১৯২০
সালে তৎকালীন আইনসভার নির্বাচনে সুরেন্দ্রনাথকে পরাজিত
করেই চিত্তরঞ্জনের অবশিষ্টা বিধানসভা রায় উঠে এসেছিলেন
পাণ্ডুরীশের আসনে। এই কল্যাণ অর্থাৎ কিন্তু নয়,
প্রতিবন্ধিত হইছিল একটি পুণের অবসান।

কিন্তু আমাদের ইতিহাসে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রথম
পর্বে সুরেন্দ্রনাথের নাম চিরভাষ্য। সারা ভারত জুড়ে
ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের উত্তরণের পর্বের সঙ্গে
ঠিক এখানেই রয়েছে সুরেন্দ্রনাথের সাংবাদিকতার বিশেষ
ভাণ্ডার্য। তাই এটা আশ্চর্যের নয় যে, ‘এ নেশন ইন মেকিং’
হয়েছে একটি পুরো অধ্যায় আছে তার শিরোনামই হল
‘সাংবাদিকতা’। এতদ্বারা আরও অন্তত তিনটি অধ্যায় আছে
যেখানে সুরেন্দ্রনাথ সাংবাদিকতা প্রসঙ্গে তাঁর মূল্যবান চিন্তা
অন্যদিক দৃষ্টিতে দেখেছেন।

সাংবাদিকতার সুরেন্দ্রনাথের আভ্যন্তরীণ সূত্রপাত
অংশগুরুত্বপূর্ণভাবে ‘হিন্দু পেট্রিয়ার্ট’-র সূত্রে। হরিশ মুখার্জি হিন্দু

পেট্রিয়ার্ট সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথের মূল্যায়নটিও লক্ষ্য করার মতো।
আরম্ভস্থিতিতে সুরেন্দ্রনাথ লিখছেন—‘হিন্দু পেট্রিয়ার্ট পত্রিকা
বাংলায় তো বটেই, সারা ভারতেই সর্বপ্রথম ভারতীয়
সাংবাদিকতা ছিল।’ হরিশ মুখার্জি ‘হিন্দু পেট্রিয়ার্ট’ সম্পর্কে
এককর অসামান্য মূল্যায়ন সুরেন্দ্রনাথের আগে কেউ করেছেন
নয়ন যেন হয় না। সিংহী হরিয়া ও নীল বিশ্লেষণের
প্রেক্ষাপটে হরিশ মুখার্জি বলেন ভারতীয় সর্বভারতীয় মুক্তি
সুরেন্দ্রনাথকে সবচেয়ে আকৃষ্ট করেছিল।

১৮৯১ সালে হরিশ মুখার্জি মৃত্যুর পর হিন্দু পেট্রিয়ার্টের
সম্পাদক হন কৃষ্ণদাস পাল। ১৮৮৪-তে মৃত্যু পর্যন্ত কৃষ্ণ দাস
পেট্রিয়ার্টের সম্পাদক ছিলেন। হরিশ মুখার্জি মৃত্যুর পর হিন্দু
পেট্রিয়ার্ট অগেবে সেই পরিমাণে অনেকটা হারায়েও অন্তত কৃষ্ণ-
দাস পালের মৃত্যু পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী মুখপত্র হিসেবে তার
একটা গুরুত্ব ছিল।

সুরেন্দ্রনাথ হিন্দু পেট্রিয়ার্টের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ১৮৭৪-৭৫
সালে। ১৮৭৪’র এপ্রিল থেকে ১৮৭৫ সালের মে মাস পর্যন্ত
ইংলণ্ডে থাকাকালীন সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন পেট্রিয়ার্টের লন্ডন
সাংবাদিকতা। আই সি এসের চাকরি থেকে বরখাস্ত হবার পর
ইন্ডিয়া অফিস কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া জন্য
সুরেন্দ্রনাথ লন্ডন নিয়েছিলেন। বিলেতে গিয়েও অবশ্য কোনও
প্রতিকার তিনি পাননি। এতে অবশ্য ভালোই হয়েছিল।
ইংল্যান্ড থেকে ফেরার পর জনজীবনে পূর্ণভাবে তিনি যোগদান
করেছিলেন। ১৮৭৬ সালের ২৬ জুলাই প্রতিষ্ঠা করলেন
‘ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন’ যা ভারতসভা। যার আয়োজিত
উদ্দেশ্য ছিল সর্বভারতীয় রাজনৈতিক উদ্যোগের কেন্দ্র হিসেবে
সংগঠিত হওয়া। ভবিষ্যতের সংগঠন ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান
অ্যাসোসিয়েশন থেকে ‘ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন’ গঠন সূচনা
করেছিল একটি নতুন পর্বের।

তখনও পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথ নিজে কোনও সাংবাদিকতা
পরিচালনার ভার নেননি। হিন্দু পেট্রিয়ার্ট তখন ছিল ব্রিটিশ
ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের মুখপত্র। ১৮৭১ সালে বিল্ডিতে
অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সাংবাদিক ও সম্পাদকদের আশ্রয় জানানো
হয়েছিল এবং সেই সম্মেলনে সুরেন্দ্রনাথ যোগদান করেছিলেন
হিন্দু পেট্রিয়ার্টের সাংবাদিক-প্রতিনিধি হিসেবে। সুরেন্দ্রনাথের
নিজের ভাষায়—‘সেখানে আমি হিলাথ সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয়
সাংবাদিকদের প্রতিনিধি।’ বিল্ডি সম্মেলন থেকে গঠিত হয়েছিল
যৌথ প্রেস অ্যাসোসিয়েশন এবং সেই অ্যাসোসিয়েশনের
সাংবাদিকদের দ্বাৰাভিত্তিক করাও পেশ করেছিল আইনসভার
করূহ।

কিন্তু এর পনের মাসের মধ্যেই ভারতীয় ভাষায়
সাংবাদিকতাবাদী কর্তৃত্বের ক্ষমতে ব্রিটিশ উপনিবেশিক সরকার
জারি করে ভারতীয়দের প্রেস আইন। ১৮৭৮-র ১৪ মার্চ এই
আইন কার্যকর করা হয়। এই প্রেস আইনের বিরুদ্ধে বেশ জুড়ে
গীর আন্দোলন গড়ে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা নেন সুরেন্দ্রনাথ ও

ভার সংগঠন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। শেষ পর্যন্ত
আন্দোলনের চাপেই ১৮৮১-র ৭ ডিসেম্বর এই আইন বাতিল
করা হয়। লর্ড রিপন তখন ভারতের ডাইস্বরয়।

লক্ষণীয়া, ডানাকুয়ার প্রেস আইন সম্পর্কে হিন্দু
পেট্রিয়ার্টে ভূমিকার সমালোচনা করতে সুরেন্দ্রনাথ কিম্ব দ্বিধা
করেননি। আত্মসম্মতিতে তিনি লিখছেন—‘হিন্দু পেট্রিয়ার্ট
গ্রোসের এই দুখ বন্ধ করার বিরুদ্ধে লিখলেন ঠিকই, কিন্তু
শোষণবোধকে কোন মত প্রকাশে হিন্দু পেট্রিয়ার্টের সাধারণত যে
ভাঁজ থাকে এই বিরুদ্ধ মন্তব্যে সে বহুদূর বাক্ত ছিল না।’
এ প্রসঙ্গে বলাই যায় যে, ডানাকুয়ার প্রেস আইনের
বিরুদ্ধে আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই রাজনৈতিক আন্দোলনে
প্রকৃত অর্থে প্রথম নেতৃত্ব দেন সুরেন্দ্রনাথ। সেই সময়ে জাতীয়
ত্বের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। সাংবাদিকতার সঙ্গে
সুরেন্দ্রনাথের সম্পর্কের এই বিশেষ মাত্রাটি লক্ষ্য করা যতো।

ডানাকুয়ার প্রেস আইন-বিরোধী আন্দোলনের
প্রকাশপট্টেই সুরেন্দ্রনাথ নিজে সংবাদপত্র পরিচালনার কাজে
হাত লাগান। বেঙ্গলার গ্যোটার্জির কাজ থেকে ইংরেজি সাপ্তাহিক
‘বেঙ্গলি’ কিনে নেন। ১৮৭৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে
সুরেন্দ্রনাথ ‘বেঙ্গলি’র দায়িত্ব ও সম্পাদক হন। ‘বেঙ্গলি’ প্রকাশিত
হয়েছিল ১৮৮৮ সালে। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা।
সুরেন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিসত্তা নিয়ন্ত্রণে ও দায়িত্বের ‘বেঙ্গলি’
চালাতে চাননি। হিন্দু পেট্রিয়ার্ট বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান
অ্যাসোসিয়েশনের সম্পত্তি ছিল তেমনই তিনি চেয়েছিলেন,
‘বেঙ্গলি’ পরিচালিত হোক ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের
দায়িত্বের। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। ‘বেঙ্গলি’ সুরেন্দ্রনাথকে
ব্যক্তিগত উদ্যোগেই চালাতে হয়। শেখবিকে কিছু সময় বার
দিলে ১৯২০-এর ৬ আগস্ট দুই পর্বত সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন
‘বেঙ্গলি’র সম্পাদক। বর্তম, সোমপ্রকাশ ও হিন্দু পেট্রিয়ার্ট
পর্বতটি পূর্বে বিশ পত্রকে অন্তর্গত প্রথম বেঙ্গল শব্দক বাংলা
প্রকাশ থেকে প্রকাশিত ‘বেঙ্গলি’ ও অমৃতভাষ্য পত্রিকার ছিল
জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র হিসেবে বেশ ভূমিকা বিখ্যাত।

কলামহত্বা, সংবাদপত্র হিসেবে ‘বেঙ্গলি’ পত্রিকা ছিল
সুরেন্দ্রনাথকে রাজনৈতিক দর্শন ও বৃত্তিগিরি অনুসারী। ফলে
জায় জনপ্রিয়তাও ওঠানামা করেছে সুরেন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তার
সঙ্গে। তবে সামগ্রিক বিচারে রাজনৈতিক সাংবাদিকতার জাতীয়
বৃত্তি আন্দোলনের এক সচিবরূপে ‘বেঙ্গলি’ সকল দৃষ্টান্তে তার
অনশয়ের ছাপ ফেলাতে।

সুরেন্দ্রনাথ সম্পাদক হবার সঙ্গে সঙ্গেই ‘বেঙ্গলি’ অত্যন্তপূর্ণ
জনপ্রিয়তা পায়। অমৃতভাষ্য পত্রিকার তখন সাপ্তাহিক ছিল।
ডানাকুয়ার প্রেস আইন থেকে বাঁচতে ১৮৭৮ সালের ২১ মার্চ
সংবাদ থেকে অমৃতভাষ্য পুণোদয় ইংরেজি সাপ্তাহিক
পরিণত হয়। ‘বেঙ্গলি’ সুরেন্দ্রনাথের দায়িত্বের আশার পর
ইংরেজি সংবাদপত্র হিসেবে অমৃতভাষ্য এবং ‘বেঙ্গলি’ ছিল
জাতীয়তাবাদী মহলে সবচেয়ে জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী।

“বেঙ্গলি সম্পাদক হিসেবে
সুরেন্দ্রনাথ প্রথম দেশজোড়া
আলোড়ন পেলেন কলকাতা
হাইকোর্টের তৎকালীন
বিচারপতি নরিসের
সমালোচনা করে একটি
সম্পাদকীয় লিখে।”

‘সংবাদপত্র পরিচালনার দ্বাা দিয়ে কোনও প্রকার ব্যবসা করার
ছায়ায়ই অভিজ্ঞতাও আমার ছিল না। আমার একমাত্র উদ্দেশ্য,
একমাত্র প্রেরণা ছিল জনসেবা—আত্মসম্মতিতে লিখে গেয়ে
সুরেন্দ্রনাথ। তাঁর মতো করে একজন তিনি করেছিলেন।

‘বেঙ্গলি’ সম্পাদক হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ প্রথম দেশজোড়া
আলোড়ন পেলেন কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি
নরিসের সমালোচনা করে একটি সম্পাদকীয় লিখে। একটি
মামলাকে কেন্দ্র করে নরিস সাহেব প্রতিদ্বন্দ্বী একটি লক্ষ্য
পারিবারিক শাস্ত্রাধ্যাপিতা আদালতে নিয়ে আসার নির্দেশ দেন।
ভারতীয়-বিশেষী নরিস সাহেবকে এই নির্দেশের ফলে চিত্তব্রজ
কায়ের শিষ্টা কুশলমোহন দাস সম্পাদিত ‘ব্রাহ্ম দায়িত্ব
ওপনিয়ন’-এ প্রকাশিত হয়। এই বছরের ডিসেম্বরে ১৮৮০-র
২ এপ্রিল সুরেন্দ্রনাথের লেখা একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়
‘বেঙ্গলিতে’। স্বভাবতই নরিসের সমালোচনা ছিল সেই
সম্পাদকীয়ের। এই সম্পাদকীয়ের জন্য ৫ রো আদালত
অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয় সুরেন্দ্রনাথকে।
৫-মাসের কারাবন্ড কেওয়া হয় তাঁকে। এই দায় দান নিয়ে গোট
বেশ, বিশেষত বাংলায় বিকোভেন্স বড় হয়ে যায়। রবার্ট নাইট
সম্পাদিত স্টেটসম্যান পর্যন্ত তখন সুরেন্দ্রনাথের প্রতি সহানুভূতি
প্রকাশ করেছিলেন। ‘বেঙ্গলি’ পত্রিকার নাম আরও ছড়িয়ে পড়ে।

“সাংবাদিক হিসেবেই
সুরেন্দ্রনাথ ১৯০৯ সালের
জুন মাসে লন্ডনে অনুষ্ঠিত
ইম্পিরিয়াল সাংবাদিক
সম্মেলনে যোগ দেন।
সম্মেলনে তিনিই ছিলেন
একমাত্র ভারতীয়।”

বাঙালি জাতির বিবেক থেকেই সাংবাদিক বেশিকৈ
মৈনিক চাপাগুলিত করা হয়। অমৃতবাজার সাংবাদিক থেকে
মৈনিক হয়েছিল ১৮৯১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। বেশিকৈ মৈনিক
হয় ১৯০০ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে। বেশিকৈ মৈনিক
করার প্রত্যাবির্বেছিল প্রথম রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব। এতপর
হিতবাহী পত্রিকার মালিকানা পরিক্রমাস্যে সি কে সেন আভ্য
কোম্পানির উপেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে বণ বহর বরসী একটি
অংশিদারী চুক্তি হয় সুরেন্দ্রনাথের। তারপরই বেশিকৈ মৈনিক
হয়। সম্পাদক পদে সুরেন্দ্রনাথই ছিলেন। এই সাংবাদিক থেকে
মৈনিকোচ্ছন্নাত্তরের কামল বর্ণনা করতে গিয়ে আত্মবৃত্তিতে
সুরেন্দ্রনাথ অসমর্থ্য একটি ব্যাখ্যা বিবেচন। যা থেকে
সাংবাদিকতা সম্পর্কে তাঁর স্মৃতি ব্যাখ্যা প্রকাশ হয়ে পড়ে।
সুরেন্দ্রনাথ লেখেন—“...লীল্য আরি মুকুতে পারল্যাম যে
সর্বভারতীয় বার্ষ-বিষয়িত বিষয়কে ভুলে বরার জন্য বালাদেব
প্রকাশিত এই ইংরেজি সাংবাদিক পত্রিকা দ্রুত আকর্ষণে হয়ে
পড়ছে। দেশে নাসরিক ও রাজ্যিক জীবন ক্রমেই বন্ধ হয়ে উঠেছে
এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত সংবাদ পাওয়ার জাহিও বেড়ে বাড়ে।
সাংবাদিক পত্রিকার আদর-প্রভাব এবং জনপ্রিয়তাও দ্রুত কমে
যাচ্ছে। সুতরাং অবস্থার চাপের কাছে এবং সেই সঙ্গে মনিয়ে
জলের বহন নীতির কাছে আমায় নতি স্বীকার করতে হল।”

সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মবৃত্তিতে লিখেছেন, বেশিকৈ প্রথম
জরাজীর্ণ পরিচালনাবীন কালক যে কিনা সংবাদ সংস্থা
“রয়টার”-র গ্রাহক হয়েছিল। ব্রিটিশ সাংস্থা রয়টার ১৮৬৭

সালেই ভারতে প্রথম নিজস্ব দপ্তর খোলে। মূলত
আংলো-ইন্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলিই এর গ্রাহক ছিল। কিন্তু
বট্টাচরণের গ্রাহক হওয়া নিয়ে সুরেন্দ্রনাথের দাবি সম্ভবত ঠিক
নয়। কারণ ১৮৭৪-৭৫ সালে থেকেই অন্ত্রত অমৃতবাজার
পত্রিকায় বট্টাচরণ প্রেরিত সংবাদ ছাপা হত। এই প্রতিবেদক
সুরেনা কাইলেই তা থেকেছে। অমৃতবাজার কী গ্রাহক না হয়েই
বট্টাচরণ-এর বন্ধ হওয়াতো? তাই হোক, সেটা বন্ধ কথা নয়, বন্ধ
কথা হল বট্টাচরণের সার্ভিস নিয়ে বেশিকৈ সুরেন্দ্রনাথ
সর্বভারতীয় মৈনিক পরিগণত করায় জন্য সুরেন্দ্রনাথের লজ্জা এ
থেকে বোঝা যায়।

সাংবাদিক হিসেবেই সুরেন্দ্রনাথ ১৯০৯ সালের জুন মাসে
লন্ডনে অনুষ্ঠিত ইম্পিরিয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে যোগ দেন।
সম্মেলনে তিনিই ছিলেন একমাত্র ভারতীয়।
বলাবাহুল্য সেই সময় থেকেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের
মূল হোত থেকেই বুরতে শুরু করেছিল যার সঙ্গে
সুরেন্দ্রনাথের যত্নের মিল ছিল না। কিন্তু বেশিকৈ ও তাঁর
সম্পাদকের যত্না জনমানসে টোল খায়নি।

বেশিকৈ পরিচালনায় আবার একটি বড়সড় পরিবর্তন আসে
১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসে। উপেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে চুক্তি
যেহায শেষ হয়ে গিয়েছিল ১৯১০ সালে। সুরেন্দ্রনাথ বেশিকৈ
একক মালিক হয়ে পড়েন। এই এককমালিকানা বজায় ছিল
১৯১২ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত। জানুয়ারিতে সুরেন্দ্রনাথ
কনিষ্ঠ-বাজারের মহারাজার সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন।
কলে মহারাজা বেশিকৈ মালিকানা অংশীদারিত্ব পান। ঠিক
হয়েছিল বেশিকৈ মালিকানা একটি সিবিটিতে কোম্পানির হাতে
অর্পণ করা হয়ে যাবে থাকে। এ থেকে বোঝা যায়, একক
উদ্যোগে তখন বেশিকৈ চলাতে সুরেন্দ্রনাথ অসুবিধার মধ্যে
পড়েছিলেন। কিন্তু এই চুক্তির কিছুদিনের মধ্যেই পরিকল্পনা
হতাস্থের কারণে সুরেন্দ্রনাথ বেশিকৈ থেকে সরে আসেন।
পদত্যাগ করেন সম্পাদক পদে। সেই সময় পরীক্ষণাথ মুখার্জি
সম্পাদক হয়েছিলেন বেশিকৈ।

১৯২৫ সালের ১৪ মে সুরেন্দ্রনাথ আবার বেশিকৈ
সম্পাদক পদে ফিরে আসেন। তখন বেশিকৈ সহস্বামী
প্রকাশন হিসেবে “লিট এন্ডপায়ার” এবং “বজ্রাঙ্গ” প্রকাশিত
হয়েছে। কিন্তু সেই সময় বাংলায় জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে
সুরেন্দ্রনাথ প্রায় একক, নিঃসঙ্গ। নতুন করে গঠিতকর দেবার
পর সুরেন্দ্রনাথ বেশিকৈ বোলেনি। ৬ আগস্ট (১৯২৫) শেষ
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন “ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক।”

যায তাঁর জন্মের দেড়শত বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সুরেন্দ্রনাথের
জীবনের নানা দিক নিয়েই আলোচনা হচ্ছে বা হবে। কিন্তু তাঁর
নানা কীর্তির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে সাংবাদিকতা এতখান
ভুলে চলে গেছে না। সংগঠক সুরেন্দ্রনাথ, প্রচারক সুরেন্দ্রনাথ,
রাজনীতিক সুরেন্দ্রনাথকে মূলত পাণ্ডা বেতে পারে সাংবাদিক
সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে।



রুচিশীল ও মনের মত বিভিন্ন স্বাদের বই পেতে হলে কলকাতা পৌরসভার প্রকাশিত বই পড়ুন ও পড়ান

ছোটদের জন্য

আমাদের বিনামূল্যের

আমাদের সূত্রাং

কৃষির খেয়া

(নিঃশেষিত)

সাধারণের জন্য

চুক্তির সংগ্রাম ও কলকাতার পার্শ্ব

শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি-পাঁচ বিজ্ঞানী

(নিঃশেষিত)

C. V. Raman Birth Centenary Issue

Anthology Number 1924-1947

Netaji Birthday Com. Vol. Cent. eve-tribute

C. M. Gazette-Netaji Centenary Issue

Calcutta Steps into 300 years

(নিঃশেষিত)

Glimpses of Calcutta

Mayors

Calcutta(নিঃশেষিত)

Calcutta-a Glimpse

Calcutta-a set of Pictures

Calcutta at a Glance

C. M. C. Year Book

C. M. Gazette-A tribute to Rabindranath

(নিঃশেষিত)

Compendium on Assessment & Collection

Building Permit Manual

মাসিক পত্রিকা

পুরাণী (সাধারণ সংখ্যা)

পুরাণী (বিশেষ সংখ্যা)

কলকাতা সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞানতে হলে পুরতথ্যসমৃদ্ধ পুরাণী নিয়মিত পড়ুন ও পড়ান।

উল্লিখিত বইগুলি কলকাতা পৌরসভার তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ এবং

রেকর্ড বিভাগের কাউন্টারে সাবা বছর পাবেন।

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ : ১, হগ স্ট্রিট, হগ বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০ ০৮৭

সামান্য কিছু সতর্কতা

ম্যালেরিয়া

তাড়াতে পারে

- জ্বর হলেই রক্ত পরীক্ষা করান ও পুরোমাত্রায় ওষুধ খান
- ম্যালেরিয়ার মশা কেবল পরিষ্কার জলে জন্মায়—খোলা চৌবাচ্চা, হাঁড়ি-কনসি বা ড্রামে ধরা জল সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন পরিষ্কার করুন
- বর্ষার জল বাড়ির ছাদে বা আনাচে-কানাচে জমতে দেবেন না
- জলের ট্যাঙ্ক ঢেকে রাখুন যাতে মশা ঢুকতে না পারে
- শোয়ার সময় অবশ্যই মশারি টাঙান

॥ ম্যালেরিয়া জীবন নেয় সাবধানের মার নেই ॥



তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ
কলিকাতা পৌরসভা

কলকাতা
দূরশ্রী

২২/২০০৩
W



ফজলুল হক বিশেষ সংখ্যা



**কুচিশীল ও মনের মত বিভিন্ন স্বাদের বই পেতে হলে
কলকাতা পৌরসংস্থার প্রকাশিত বই পড়ুন ও পড়ান**

ছোটদের জন্য

রামচন্দ্রের জন্ম

Raman Birth Centenary Issue

Anthology Number 1924-1947

Netaji Birthday Com. Vol. Cent. eve-tribute

C. M. Gazette-Netaji Centenary Issue

Mayors of Calcutta

Calcutta-a Glimpse

Calcutta-a set of Pictures

১৫.০০

Calcutta at a Glance

৩৫.০০

C. M. C. Year Book

২৫.০০

Compendium on Assessment & Collection

২০০.০০

Building Permit Manual

২০০.০০

কলকাতা সম্বন্ধে বিশদ জানতে হলে পুরতথ্যসমৃদ্ধ পুরস্রী নিয়মিত পড়ুন ও পড়ান

উল্লিখিত বইগুলি কলকাতা পৌরসংস্থার তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ এবং

রেকর্ড বিভাগের কাউন্টারে সারা বছর পাবেন।

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ

১, হগ স্ট্রিট, হগ বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০ ০৮৭

কলকাতা
পুরাণী

ফজলুল হক বিশেষ সংখ্যা



সম্পাদক ● অমলেন্দু ভট্টাচার্য

কলিকাতা দূরশ্রী

কলিকাতা পৌরসংস্থার বাংলা মুদ্রণত্র

বর্ষ ২১ □ সংখ্যা ১০

২৭ জানুয়ারি, ১৯৯৯ □ ১০ মাঘ, ১৪০৫

সহ-সম্পাদক

প্রশান্ত সেনগুপ্ত

সহযোগী

অরুণকুমার রায় ও সোণা বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক

বিশেষ আদিকারিত

সংবাদমাধ্যমে, প্রচার ও প্রকাশনা

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, কলিকাতা পৌরসংস্থা

২৭ বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ১ হুগ ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০৮৭

দূরত্ব : ২৪৬-০৯০৬, ২৪৪-০৪৭১ / এক্সটেনশন : ২৬৭২, ২৫৪০, ২৬১১

মুদ্রক

বসুমতী কম্পোজিশন লিমিটেড

১৬৬ বিশিণবিহারী গাঙ্গুলী ট্রিট

কলিকাতা-৭০০ ০১২

দাম : ১০ টাকা

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয় ৫

আবুল কাশেম ফজলুল হক : সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী ৬

‘পের-য়ে-বঙ্গাল’ ফজলুল হক * ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

ফজলুল হক : অন্যতম জননেতা * বিনয় চৌধুরী

স্মৃতির আলিঙ্গন * প্রহ্লাদচন্দ্র চন্দ্র ১৪

ফজলুল হক : ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারতের প্রেক্ষাপটে
এক নতুন বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন * অমলেন্দু দে

ফজলুল হক স্মরণে * কাজি বিদ্যাল ২৮

আবুল কাশেম ফজলুল হক * হামিদ আব্দুল হালিম ৩১

প্রজাবল্লু আইনের সংস্থায় : ফজলুল হক * নেশাল মজুমদার

শিল্প-সংস্কৃতি দরবী ফজলুল হক * গবেশ মুখোপাধ্যায়

আমজনতার হক সাহেব * দিলীপ বানার্জি ৪৬

ফজলুল হক : একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক * সলিল গাঙ্গুলি ৫১

আজকের বাংলা *

বঙ্গীয় আইনসভায় ফজলুল হকের ভাষণ *

কলকাতার মেয়র হিসেবে প্রথম বক্তৃতা

জন্মস্থানবর্ণ ও আমার কাউন্সিলর ভায়রা,

আমাদের আপাত বার্ষিক ও হুজুরার মধ্যে ইদর সর্বদাই ভবিষ্যতে কতিপুনের ব্যবস্থা রাখেন। সেই জন্য মাত্র সাতই বৎসর আগে আমি যে পুরস্কারসহে বক্তৃতা হুজুরসিলাম আজ ইদর ক্রমায় তা দিয়াছেন। পতবারে আমার পরাজয় ব্যতিক্রমী আজকের সাফল্যের দ্বারা তৈরি করে দিয়েছে বইলে কোনও সম্ভাব্য অসুখায় আমি এই সাফল্য লাভ করতে পারতাম না। গত বছর হারি আমায় সবচেয়ে বেশি বিলম্ব ছিলেন আজ তাঁরাই আমায় সবচেয়ে বেশি সমর্থন। যদিও আমার পক্ষে তাঁদের সবায় হারা থেকে কাউকে আশা করা উচিত নয় তবু আমি বিপিত বন্ধু বসিনীরঞ্জন সরকারের নাম বলব, যিনি সর্বপ্রথমে আমাকে সমর্থনের প্রতিক্রিয়া দিয়েছিলেন এবং সম্মানের সঙ্গে তিনি কথা রেখেছেন। অন্যান্য যেসব শোষ্ঠী আমাকে সমর্থন করেছে তাদের প্রত্যেককে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। কংগ্রেসের দুই শোষ্ঠী যেভাবে সিদ্ধান্তের দ্বারা বিবাদ সরিয়ে রেখে এক হয়ে আমায় সমর্থন করে গেছেন তা প্রশংসনীয়। মুসলিম শোষ্ঠী পতবারের হতই এবারও মেয়র নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমার শিখরে গড়িয়েছে। ইদরবে ইচ্ছা অনুযায়ী হুজুরা দেববন্ধু কিতুরঞ্জন দাশের এক দৃশ্য পরে ভারতীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিত্ব ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁদের মেয়র ও ডেপুটি মেয়রকে নির্বাচিত করেছে।

এসকল আছেন হারি মনে করেন, ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলিমরা শুধুমাত্র বিবাদ করার জন্য ও একে অপরের দল কাটার জন্য বাস করত। তাঁরা কানপুরের কথা বলেন, মির্জাপুরের ভয়াবহতার কথা বলেন, হাটী ও অন্যান্য জায়গার কথা বলেন। এরা ভারতবর্ষে সর্বত্র বলায় যাতে কোনও ভাল কথা কুঁজ পান না। এরা বলেন, ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ অন্ধকার এবং এই দুই সম্প্রদায় কখনই সাধারণ সমঝোতায়ে পৌঁছিতে পারবে না।

এখানে আমার ভালমিকে (ডেপুটি মেয়রকে দেখিয়ে) একজন হিন্দু কায়দা আছেন। আমি বলতে চাই হিন্দু-মুসলিমের সমঝয় বা সমস্যায়ে একই প্রচেষ্টার সঙ্গে দৃঢ়তা হুজুরা বা আমাদের উভয় পক্ষের মতুত্বির প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য ইদরের অভ্যন্তর।

আমাদের উভয়ের মধ্যে ভুলত হাই হোক বা কেন, আমাদের মধ্যে আপাত বিরোধ হাই থাক না, পাশাপাশি আন্তরিক ঐক্যও আছে বা ভারতীয় সমাজের বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রশংসিত। এবং আমি মনে করি, কলকাতার শান্তিরক্ষণের সেবার দ্বারা দিয়ে আমি দেশাত্মকর সত্যিকার সেবা করতে পারব। এই ইচ্ছা শুধুমাত্র আমার নয়, আজ হারি আমাকে সমর্থন করেছেন সকল কাউন্সিলরদের দ্বারা কাজ করেছে। আমি আশাবশিত যে আমার বন্ধু কে সি রায়চৌধুরী অনেক অসুবিধার মধ্যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও আমার সমর্থন বক্তা রেখেছেন।

ভ্রমহীনচরণ, আমি আমার বক্তব্য বীথয়িত করতে চাই না। কারণ সময়ের দ্রুততা। আমি বলতে চাই, যে বিষয়ে অনেক বক্তাই বক্তব্য রেখেছেন সেই ঐক্য ব্যতীত হুজুরা হুজুরা সমবেত প্রচেষ্টায় যেখানে শুধুমাত্র কলকাতাসীলর ভাল কন্ডাই লভা নয়, হুজুরা বা আমাদের মতুত্বির বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দ্বারা ঐক্য গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ হুজুরা হুজুরা। এই ঐক্য হুজুরা অপ্রদুত বা আদর্শ দিনে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতাদের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার জন্ম মেয়ে, তাঁরা কীভাবে কীভাবে মিলিয়ে ভারতবর্ষকে সেই ঐক্য ভবিষ্যতে দিয়ে থাকবে যেখানে সত্য জগতে ভারতবর্ষ উন্নত ও অগ্রগামী বেশ হিসাবে বীকৃতি লাভ করবে।

আমি এই আসন থেকে আপনাদের সহযোগিতা ও সাহায্য প্রার্থনা করছি। আমি এক মুহূর্তের জন্য বিদ্যুত হরি না এই দায়িত্বের গুরুত্বের সম্বন্ধ। কলকাতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় মহর, তাকে ঠিক পথে দিয়ে দ্বারার ভার আমাদের দিতে হবে। এটা এখনই এক কাজ যে কঠিন হুজুরার দায়িত্বকে ও তার সামনে চুপ হয়ে যেতে হবে। কিন্তু আমি নিজেই কতিপাসীলর হয়ে করছি কারণ যে ঐক্যবদ্ধ পক্ষি আজ আমাকে এখানে এনেছে এটা নির্ভরজ্ঞান ঐক্য কারণ হারি সমবেতভাবে আমাকে বসিয়েছেন তাঁরাই লভ রাখবেন যাতে আমি এই চেষ্টারের দ্বারা রাখতে পারি। আমার আগে যেসব পৌরবর বক্তিত্ব এই আসন অলঙ্কৃত করেছেন সেই দ্বারা যেন আমরা অকুণ্ড রাখতে পারি। আমি যে সময়ের জন্য এই আসনে আসীন হব, সেই সময়ে আমাদের প্রথম দিতে হুজুরা ভারতবাসী হিসেবে নিজেই দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা চালানোর যোগ্য।

আমি আমার আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আমার সমস্ত সাধুবাদ জানানোর জন্য। শুধু আপনাদের এই অভিনন্দন নয়, আমি চাই আপনাদের সহায় সাহায্যসিদ্ধি। যদি কোনও অসন্তর্ক মুহূর্ত বা কোনও সময়ে আমি কারও মনে কোনও কষ্ট দিতে থাকি তার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি। কারণ আমিও যোগ-ক্রমের দায়িত্ব। আমার তরফে আমি যতদূর দিয়ে ভবিষ্যতে মিলগুটিতে কাজ করার অগ্রিম প্রতিক্রিয়া দিচ্ছি সঙ্গে সঙ্গে আমার এ আশা হুজুরা অলঙ্কৃত হুজুরা না হারি ঐক্যবদ্ধভাবে আমাকে সমর্থন জানিয়েছেন তাঁরাও সন্তর্ক দৃষ্টি রাখবেন যাতে আমার কার্যকালে সমানভাবে উদ্ভাসিত হুজুরা হয়। আমি জানা করি, আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টায় আমরা কলকাতা শহরের জন্য সত্যিকার হিন্দু ভাল কাজ করতে পারব এবং এই শহরের ভবিষ্যৎ দ্বারাও অনেক উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। (১৯০৮ সালের ৪ মে কলকাতা সিটিমিলিয়াম থেকেই প্রকাশিত মেয়র হিসেবে প্রথম বক্তৃতা বঙ্গবন্ধু।)

মম্বাদকীম

আবুল কাশেম ফজলুল হকের একশো পঁচিশ বছর পূর্ণ হলো ১৯৯৮ সালের ২৬ অক্টোবর। ফজলুল হক ছিলেন অবিভক্ত বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী। তিনি 'শের-এ-বাংলা' নামে পরিচিত ছিলেন। গরিব মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভালোবাসা। শ্রমিক-কৃষকের প্রতি তাঁর ছিল স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি। গরিব কৃষকের স্বার্থে ভূমি-সংস্কার আইন, চাষী-খাতক আইন, ঋণ সালিশী বোর্ড প্রভৃতি আইন প্রণয়ন হয়েছিল তাঁর আমলে। রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার কোনও স্থান ছিল না ফজলুল হকের কাছে। তিনি ছিলেন প্রকৃতই দেশপ্রেমিক। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশভাগের তিনি ছিলেন বিরোধী। ষাট বছর ধরে তিনি রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন। এর মধ্যে চল্লিশ বছরই তাঁর কেটেছে কলকাতায়। তিনি কলকাতা যেমনও ছিলেন।

বর্তমানে সাম্প্রদায়িকতার বিঘ্নবশে যখন চারিদিক-কে কলুষিত করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে তখন এই ব্যক্তিত্বকে শ্রদ্ধা করতে আমরা প্রকাশ করছি ফজলুল হক বিশেষ সংখ্যা। নতুন প্রজন্মের কাছে উত্তরাধিকার হিসেবে, তাঁর সম্পর্কে ধ্যানধারণা গড়ে তোলার জন্যই আমাদের এই প্রচেষ্টা।

এই সংখ্যা প্রকাশে পৌর প্রতিনিধি দিলীপ ব্যানার্জির সক্রিয় সহযোগিতা আমরা পেয়েছি। এই সংখ্যায় অনেকেই লিখেছেন ঘাঁরা সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব। এছাড়াও ঘাঁরা লেখা দিয়ে সাহায্য করেছেন তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

আবুল কাশেম ফজলুল হক : সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

আবুল কাশেম ফজলুল হক ১৮৭৩ সালের ২৬ অক্টোবর বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ফাখী মুহম্মদ ওখাজেব আইনজীবী ছিলেন। ফজলুল হক পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। বেলাঘী ছাত্র ছিলেন। ১৮৯৫ সালে রনিত পাশে কৃতিত্বের সঙ্গে এম এ পাশ করেন। ১৮৯৭ সালে আইন পাশ করে সার্ব আভিভোব প্রুখার্কির অধীনে শিক্ষানবিশি করেন। ১৯০১ সালে বরিশাল কোর্টে ওকালতি শুরু করেন। একই সালে রাজকোষে কলেক্ট অধ্যাপনা করেন এবং বরিশাল পৌরসভার কমিশনার নিবাচিত হন। ১৯০৬-১১ পর্যন্ত তেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরি করেন। ১৯১১ সালে চাকুরি ছেড়ে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত হন। ১৯১২ সালে স্যার সলিমুল্লাহর আদ্যে মুনসিম লিগে যোগদান করেন। ১৯১৩ সালে বরীদ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিবাচিত হন। একাধিকবার ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত অবিরত বাংলার এবং ভারতের আইনসভার সদস্য ছিলেন। রাখে ১৯০৪-০৬ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য ছিলেন। ১৯১৮ সালে একই সঙ্গে সর্বভারতীয় কংগ্রেস ও মুনসিম লিগের দীর্ঘ নেতৃত্ব ছিলেন। ১৯১৯ সালে মুখ্যত রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং জালিয়ানওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের প্রীর শিক্ষা করেন। ১৯২০ সালে ফেলকুর সঙ্গে ‘বেঙ্গল প্যাকেজ’

চুক্তি সম্পাদন করেন। ১৯২৪ সালে দ্বৈত পাসনকালে স্বয়ং সময়ের জন্য শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন।

১৯২৯ সালে কৃষক প্রজা দল গঠন করেন। ১৯৩০-৩১ সালে লন্ডনে গোল টেমিল বৈঠকে যোগ দেন। ১৯৩৫ সালে কলকাতা কংগ্রেসনেব মেম্বর নিবাচিত হন। ১৯৩৬ সালে কৃষক প্রজা দলের সভাপতি হন। ১৯৩৭ সালে নতুন পাসন সংস্থার অনুসারে বাংলার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন কৃষক প্রজাদলের সঙ্গে মুনসিম লিগের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা হবার কলে। ১৯৪১ সালে জিন্নার সঙ্গে হুজুরিয়ার হওয়ার মুনসিম লিগ কোয়ালিশন থেকে সরে পড়ার। মন্ত্রিসভার পতন হলে ১৯৪১-এর ডিসেম্বর মাসে প্রোগ্রেসিভ ফেদলিশন গঠিত হয়। পাসনতান্ত্রিক সংকটের কলে ১৯৪৩ সালের ২৮ মার্চ প্রোগ্রেসিভ ফেদলিশনের পতন ঘটে।

১৯০৭ সালে ফজলুল হক মুনসিম লিগে যোগ দিয়েছিলেন—লক্ষী অধিবেশনে। লক্ষীবাগী তাঁকে শের-এ-বাংলা উপবিত্তে ভূষিত করেন। ১৯৪০ সালের ২০ মার্চ মুনসিম লিগের লায়ের অধিকরণে এক ঐতিহাসিক প্রজ্ঞা উত্থাপন করেন। পরে যা পাকিস্তান প্রস্তাব নামে পরিচিত লাভ করে। ফজলুল হকের মন্ত্রিসভার আমলে কন পালিশী বোর্ড গঠন, প্রজাবহু আইন ও মহাজনী আইনের হযো জনকল্যাণ

মূলক আইন পাশ হয়েছিল।

১৯৪৬ সালের নিবাচনে কৃষক প্রজা দলের শোভনীয় পরাজয় হলেও ফজলুল হক নিজের হুটি কেন্দ্রে থেকে জীবী হয়েছিলেন।

১৯৪৭ সালের ২০ জুন বাংলার আইনসভার সদস্যরা এক বিশেষ অধিবেশনে মিলিত হয়ে ভারত বিভাগের পক্ষে ভোট দিতে মিলিত হন। ফজলুল হক ওইদিন ইচ্ছাকৃতভাবে অনুপস্থিত থেকে ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন।

ফজলুল হক কখনই সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। একজন শিক্ষাবিদ, সুবক্তা, সুপণ্ডিত ছিলেন। আইনজীবী হিসাবেও তাঁর নামঘণ ছিল। দুরচেতা ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ ছিলেন। বাংলার বরিশ কৃষক সাধারণকে শোষণমুক্ত করতে চেষ্টাছিলেন।

শেখভাগের পরও কিছুকাল কলকাতায় ছিলেন। ১৯৪১-৪৩ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের আজলতাকটে মেন্যালে ছিলেন। ১৯৪৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হন। পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য ছিলেন। পাকিস্তানের স্বরষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন ১৯৪৫ সালে। ১৯৪৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হন। ১৯৬২ সালের ২৭ এপ্রিল ঢাকার তাঁর মৃত্যু হয়। ফজলুল হকের একমাত্র পুত্র এ কে ফজলুল হক বর্তমানে গণস্বাস্থ্যন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিমন্ত্রী।

‘শের-য়ে-বঙ্গাল’ ফজলুল হক

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বাংলার বাব-বলতে সচরাচর আমরা বুঝি অন্যায়বন্দা শিক্ষাবিধি ও বিদ্যাব্যয়ি আভ্যুদায় মুখোপাধ্যায়কে। কিন্তু সর্বভারতীয় সমাবেশে মুসলিম লিগের ১৯৩৭ অবিকেননে লন্ডনে শহরের জনাঙ্গীর্ণ মণ্ডপ পদমন্ড করে উঠেছিল কক্সল হকের নামে ‘শের-য়ে-বঙ্গাল’ জয়জয়ন্তিতে। এই মুসলিম লিগের ল্যাঙ্কোর অধিবেশনে (১৯৪০) সূচকুর জিহাদ সাহেব (তখন লিগের সর্বম্বর সভ্য) ঘাড়াই করেছিলেন এই কক্সল হককে ‘পাকিস্তান’ প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য। দেশভঙ্গের সময় পাকিস্তান গঠন বিষয়ে সেই প্রস্তাব অবশ্য পুরোপুরি মানা হয়নি। কিন্তু তা ছাড়া ভিন্ন কথা। তন্মু কক্সল হক সাহেবের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ‘সরস কলা দাক তাঁর বহু বিভিন্ন বিতর্কিত আর সঙ্গে সঙ্গে বর্ণবাহর জীবন ও জীবিত। মুসলিম লিগের উল্লেখ শুনেই তাঁরা প্রকৃত হতে পারেন, তাঁদেরই জানা বরকার যে একটি সময় ছিল আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে, যেমন ১৯১৬ থেকে বঙ্গ বঙ্গ, বঙ্গ কংগ্রেস আর লিগের যথো দ্বন্দ্ব ছিল অল্প। ১৯১৬ সালে লন্ডনে কংগ্রেসে ‘বিশ্ব-মুসলমান চুক্তি’ পুস্তিত হর আর বিপিনচন্দ্র পাল লিগের সভার ভাষণ দেন। কক্সল হক তখনই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে

সুপরিচিত; ১৯১৮ সালে বঙ্গ কংগ্রেস ও লিগ উভয়েরই অধিবেশন হয় এলাহাবাদে, তখন হক সাহেব একই সাথে লিগের সভাপতি এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক! পাঠীর অসহযোগ আন্দোলন থেকে দূরে থাকলেও জনজীবন থেকে কক্সল হকের অবস্থান কখনও দূরে থাকেনি। কলকাতা কংগ্রেসেশনের পক্ষ থেকে এই জন্মবার্ষিকী প্রতিপালন খুবই সঙ্গত এবং আত্মকের মনে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যে ব্যক্তি পাসনমূলক আইনের প্রবর্তক, সেই আইন অনুসারে কলকাতার প্রথম নির্বাচিত ‘মেয়র’ হলেন সেনেবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস তাঁর ‘চেপটি’ হলেন হসেন শাহী সোমুবার্ণি (মিনি তখন কংগ্রেসী!)। তখনই কংগ্রেসেশনের প্রধান কর্মকর্তা হলেন তরল ভট্টাচার্য সূত্রাচরণ বসু আর সহকারী হিসাবে সেনেবন্ধু নিয়ে এসেন নোয়াখালির প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা হাজি আমদুর রহিমকে। ঘাই হোক সেনেবন্ধু ডিরোয়ারের পর থেকে বিশ্বে-মুসলিম দ্বৈতী সাধনে কুচক্রিয়া নানা বাধা সৃষ্টি করল। তার সূত্রাচরণ বসাবস না হবার মাগুল সুবে আসলে গোটা দেশকে বিভেদ হয়েযে এবং আতঙ্ক হয়ে। কক্সল হকের মতাদা (কিং বিতর্ক সত্ত্বেও) এমন ছিল যে তিনি একবার ‘মেয়র’

নির্বাচিত হলেন। এখ উল্লেখ করছি এজন্য যে বাংলায় চিত্রায়িত কল্যাপির প্রাথমিক একবার সূত্রাচরণকে ‘মেয়র’ নির্বাচনে (বোম্বাই ১৯২৭) রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রায় অপরিচিত এক ‘লিবারল’ বিজয়কুমার বসুর কাছে হারতে হয়েছিল। কক্সল হকের সঙ্গে তুলনীয় না হলেও আর একজন কংগ্রেস লিগ উভয়েরই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ডেপুটি মুসলমানকে কলকাতা ‘মেয়র’ পদে বসিয়েছে; তিনি হলেন আবদুর রহমান সিদ্দিকি, অব্যাহতি হয়েও কলকাতারই মানুষ। কক্সল হকের সর্বভারতীয় ব্যক্তিত্বের চেয়ে ঢের বেশি অন্তর্যম পরিচয় হল তাঁর ‘বাঙালিয়ানা’, তার অন্তিম বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে বোম্বাইর বাংলাদেশে বেশি খেচা যায়। সেখানকার প্রখ্যাত বিদ্বান সাল্যাকুতবী আব্দুল-এর তাহারে কক্সল হক ছিলেন “এই উপমহাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা” এবং তাঁর সময়কালের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব মুসলিম নেতা বলে অভিহিত কলমে অভ্যুত্তি হয়ে না।” (প্রতিঃ “বাংলাদেশ: জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতা গণতন্ত্র, ‘জালা ১৯০০, পৃঃ ৬০)। অনেক স্বত্বাঙ্গাটা হক সাহেবের জীবনকে বিস্তৃত বর্ণন করেযে তখন অতি স্বল্পকাল ঘটনাপ্রবাহে বিরোধী দৃষ্টান্তের পক্ষ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের



১৯০৭ সালে বর্ধমান-এ ১৯০০ সালে জন্মলব্ধ

মুখ্যমন্ত্রী হবার সময় (১৯০৪) সবাই তখনেই তাঁর সাহসী ভাষণ: (খাব মুলা দিতে হয়েছিল): “বুই বাংলাদেশ বাঙালি জিবকাল এক বাঙালিই থাকবে।” এবছির বিবৃতি পশ্চিমবঙ্গ বিবল কিছু বাংলাদেশের বিদ্যানুগামী মহলে আকণ্ঠে শোনা যায়। বুঝই আনন্দেব কথা হবে যদি অন্তত বুই বাংলায় “শেব-ডে-বঙ্গাল” ফকলুল হকের ১২০তম জন্মবার্ষিকী সেন্সোহে প্রতিশাসিত হয়।

“বর্ধেনী বুর্গে” যে জেলায় গৌরবময় অবস্থানের জন্য তাকে “পুণো বিশাল” বলা হয়েছিল পূর্ব বাংলার সেই বহির্ভাগ জেলায় প্রাচ্য সম্পন্ন পরিবারে ফকলুল হক-এর জন্ম হয়। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে পাল করে আইন ব্যবসায় প্রতিশ্রুতিব জলে ফকলুল হকের বসবাস সত্ত্বেও প্রাচ্যের সঙ্গে সম্পর্ক, বাংলার প্রাচীন জীবনের নড়ি নকশের জ্ঞান, জাতিময়

নির্দেশের সত্ত্বের সঙ্গে খোলা মনে পর্বত বাবজার অভ্যন্তর মানুষ্টি যে দেশের সমসাময়িক জীবনে বড় ভাঙনা পাবেন, তা ছিল বুঝই খাড়াবিক। স্বভাবত তেজস্বী ফকলুল হক ১৯০৬ সালে মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠা ব্যাপাবে লিপ্ত ছিলেন আর সত্ত্বত তাঁরই মতো মুসলিম পুর্বসম্প্রদায়ের মনে ইংবেজ শাসনের বিশেষ বিজ্ঞাত বুদ্ধিব কথা লিগ প্রতিষ্ঠার পূর্বে আপা খাঁর নেতৃত্বে “রাজতত” মুসলিম নেতাদের বড়লাট দিওঁর কাছে পেশ করা বিবৃতিতে বর্ণিত হয়েছিল। বারি হোক হক সাতের কিছুকাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি করে ১৯১১ সালে সক্রিয় রাজনীতি ক্ষেত্রে নামেন। অনতি বিলম্বে এই উপমহাদেশের প্রধান রাজনীতিবিদ্যের মধ্যে স্থান তিনি পান।

এটা মনে রাখা উচিত যে তখনও পর্বত আবদুল রসুলের “বর্ধেনী” বুর্গের নেতাদের

মতো ব্যতিক্রমকে বাম দিলে বাংলাব মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব ছিল নবাব আবদুল লতীফ, সৈয়দ আমীর আলী (ইংবেজ শাসনে “প্রিভি কাউন্সিল”-এর) প্রথম ভারতীয় সদস্য) কিংবা ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ-এর (যিনি বর্ধেনী আস্থালনে “আকুট”, হবার লক্ষন দেখাতেই ইংবেজ সরকার বিপুল অর্থ সাহায্য করে মতিগতি বদলিয়ে দেয়) মতো অভিজাত শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি হতে। এঁরা এদেশবাসী হতেও অনেকই “বাংলাভাষী” ছিলেন না, যা দেখা যায় “সার” আবদুল রহিমের মতো বহু গুণাবিত মানুষের ক্ষেত্রেও। ফকলুল হক ছিলেন অসামান্য জ্ঞানের মানুষ, আর কিছু পরিমাণে অধির মতিত্বের জন্য খোসারং দিতে হলেও তিনি আত্মীয় দ্বাখা উঁচু রেখেই দেশের জীবনে স্থায়ী অবস্থান রেখে গেছেন। গত একশো বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও ভারতীয় জননেতার মধ্যে তাঁর স্থান অকটা। নানা অবস্থার কারণে এটা

তুলে যাওয়া হয় আর এজন্যই তাঁকে স্বপ্ন
করা আশ্রয়ের মিলে বিশেষভাবে সন্তোষ
কর্ষণ।

১৯১০ সালে তৎকালীন বেঙ্গল
লেক্সিকোনিট ডায়ালেক্টের সদস্য হিসাবে
বাংলা ও চিত্রাঙ্গীদাস ব্যাতি তিনি
অর্থন করলেন। ১৯১০ সাল থেকে
উদারপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী
মনোভাব নিয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ
উভয় সংগঠকে কাছাকাছি এনে প্রগতিশীল
রাজনীতির আসরে দ্রুত সাহেবের স্থান
নির্দিষ্ট হতেছিল। ১৯২০-২২ সালে মহাত্মা
গান্ধীর আহ্বানে (এবং বিশেষ করে
বেলাকং সমস্যা বিষয়ে গান্ধীজী
মুসলমানকে 'কোম' খেবার ফলে)
মুসলিম সমাজ বিশুল সাড়া দিলেও কল্লসুল
হক সেই আন্দোলনে যোগ দেননি।

'অসহযোগ' নীতির ফলে শিকারক্ষেত্রে
(রাজনীতির 'বকটের' কাহণে) লক্ষ্যপন
মুসলমান সমাজের কতি তেবেই হুত্বো
সেবিনের উদ্বোধনা থেকে তিনি যুগে
ছিলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রত্যয়ে রাজনীতি
ক্ষেত্রে অগ্রগামী পরিচয় তাঁর ছিল। ১৯২০
সালে বেশকিছু চিত্রগ্রহণ কল স্বরাষ্ট্রা পার্টি
পঠন করে আইন সভায় নির্বাচনে
অংশগ্রহণের নীতি প্রণয়ন করে বাংলার
মুসলমানদের কাছ থেকে সাড়া পেয়ে
'বেঙ্গল প্যাক্ট' নামে এক চুক্তি সম্পাদন
করেন। আইনসভা ইত্যাদিতে এবং
সরকারী কর্মস্থানে মুসলমানের নাযা
অধিকার বীকায় করে বাস্তবিকই তখন
মুসলমানদের ঊচ্চ জ্ঞাত করেছিলেন। প্রদেশ
কংগ্রেসে অনেকে বিরোধিতাকে পরাস্ত
করেও তিনি ১৯২৩ সালের শেষ দিকে
কোকোনো কংগ্রেসের অধিবেশনে
'বেঙ্গল প্যাক্ট'-এর সমর্থন সাংগ্রহ করতে
পারলেন না। যেটা দেশের জন্য একটি
অনুগ্রহ চুক্তি গ্রহণের আহ্বানে 'বেঙ্গল
প্যাক্ট' শিকের উঠল। নার-কা-ভদ্রান্তে
সর্বজনপ্রিয় চুক্তির তার বেগুতা হল লাল্য
লালপত হাম ও জলার আন্দোলির জুতে,
যদিও সবাই জানত যে দুজনের মতভেদ
এক বেশি যে সবকিছু ভেঙে যাচ্ছে, আর
তাঁই হল।

কল্লসুল হকের মতো প্রায় সবাই তখন
উগ্রদ্বীর হয়ে বেশকিছু সাক্ষ্য চাইলেও
দেশের দুর্ভাগ্য যে এভাবে বাংলায় হিন্দু
মুসলিম মৈত্রী খোঁচাঘান হয়ে উঠে গেলো
দেশকে নতুন বাস্তব দিগাহি হতে পারল
না। হিন্দু জাতিবাদের ও তাদের সহায়ক প্রেরণী
কংগ্রেসের নেতৃত্বের ব্যাকায় এই দুর্বলতা
হটল। বেশকিছু মোহনীয় নেতৃত্বও বার্য
হল। 'জমি দাব, লালস তার' বলে
আওরুজ তখনও জোবদায় হয়নি। কিন্তু
বাংলার চাচী (যার বেশের মেকনও আর
যায়েব মহো মুসলমান সংখ্যাগুরু) দেশের
মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যোগসূত্র হারিয়ে
ফেলল। আবস্ত হম এরই অবশ্যাব্যতী
কলস্বপ্ন হিন্দু মুসলিম একোয় গড়ে বাধার



'বৃন্দোঁ যুগে' যে জেলার
সৌরবময় অবস্থানের জন্য
তাকে 'পূণো বিশাল' বলা
হয়েছিল পূর্ব বাংলার সেই
বহিরাশাল জেলার গ্রামে
সম্পন্ন পরিবার কল্লসুল
হকের জন্ম হয়।



পর বাবা। ১৯২০ সালে বেশকিছু দুত্বায়
পর বাংলার স্বরাষ্ট্রা পার্টি 'বেঙ্গল প্যাক্ট'
বাতিল করে বেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
সাংস্কারিক নস্ট্রীতি বিশুলভাবে বাহ্যত
হল, আর বীকার না করে উদায় নেই যে
ক্রমায়ে উভয় পক্ষেরই বহু দুর্বলতা প্রকাশ
হতে থাকার পরিণামে ধর্মের ভিত্তিতে
দেশকে খণ্ডিত করার অস্তিগাপ দাখ্য পেতে
নিতে সবাই বাধ্য হলো।

কল্লসুল হকের মতো মানুষকে বেংলায়
১৯২৯ সালে নিবিলবস কৃক প্রজা পার্টি
নামে নতুন কল পঠন করতে। তাঁকে দেখা
হল 'নবযুগ'-এর মতো সাংস্কারিক
পরিচালনা করতে, যেখানে দুজক্ক

আমুন ও কাচী নজরুল ইসলামের মতো
বিবল বিদ্রোহী স্থান পেয়েছিলেন।
কংগ্রেসের মধ্যে বেশকিছু নেতৃত্ব যে বহু
সংখ্যক বাহালি মুসলমানকে বাহানীতি
ক্ষেত্রে দেখা দায়, তাঁরা অনেকে কৃক
প্রজা পার্টি দিকে আকৃষ্ট হলেন। বর্তমানে
প্রায় বিস্মৃত অথচ বিবাহিতা, বাহিতা,
জনসেবার আগ্রহী এবং সঙ্গে সঙ্গে লাহিতা
গুণসম্পন্ন যুগ্মত্ব কবিরের মতো মানুষকে
এঁকেব মহো বটা বার। আমার মনে হয় যে
বর্তমানে জাতিবাদের অসহযোগ
পশ্চিমবাংলায় মুসলমানের অবস্থানে যে
অকৃত নিস্কৃততা দেখা দিয়েছে, সে
তুলনায় প্রাক্ত স্বাধীনতা অবিকল বাংলায়
মুসলমানদের অবস্থান বুঝে উল্লেখযোগ্য।
মুনিয়াটি বাব দিয়েই বলি যে পূর্বকর
বহীদ ব্যবস্থাপক সভার প্রথম ভারতীয়
অধ্যক্ষ ছিলেন 'সার' সৈয়দ শামসুল হক,
যিনি ছিলেন প্রমুখ কংগ্রেস নেতা মাজেস্ত
প্রসাদের আইন ব্যবসায়কালে তাঁর
'সিনিয়র' ('Senior'), এবং তাঁরই
বাড়িতে (নিষ্ঠাবান হিন্দু হতেও) বাস
করার অধিকতা জীবনমুহুর্তে কর্তব্য করে
বহু গুণ কীর্তন করেছেন। মনে পড়ে
'সার' আকিমুল হক-এর কথা তিনি
ব্যবস্থাপক সভার অধ্যক্ষ হয়েছেন,
বড়লার্টের কাউন্সিলের সদস্য হয়েছেন,
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও
অন্যান্য পথ অলাংকৃত করেছেন আর
আজকের রাজনৈতিক জগতে চিত্রাঙ্গীদাসের
আবহাওজাওও ভরসা করি বিস্মৃত হবেন
না অন্তত তাঁর দেখা (১৯০৭/০৮ সালে
প্রকাশিত) "The Man Behind the
Plough" হয়ের জন্য। আমার ব্যক্তিগত
যুগ এই যে কল্লসুল হক মুসলিম লিগে
একই সঙ্গে আকাজিক ও এবং অনাকাজিক
হয়ে একটা অল্পত অবস্থানে ছিলেন হলেই
হতো স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে বাংলার
মুসলিম লিগের সম্পাদক, চিত্রাঙ্গীদ
বিবেকবান সদস্যরী আসুল হাসিদের সঙ্গে
বহু হলে একযোগে কাজ করতে পারেন
নি। এবং তাঁর প্রকৃতির মানুষ; হক
সাহেবের মহো একটা অশার্য হারিতা,
নীতি নির্ধারণে শৈথিল্য, দ্বাভ চরিত্রের

মানুষ হতেও কৌশলীত্বের দ্বারা গড়ে তুল
পথে যাবার প্রবণতা ছিল (সেই সঙ্গে
হাযুলি রায়নীতির উল্লেখ থাকার মানসিক
সম্পত্তি সন্দেহও)। হা হাযুলি সাহেবের মতো
হতাশত সত্যসহ জনসেবকের মানসিকতায়
সঙ্গে ভাল রাখতে পারেনি। এটাই দেখা
দিয়েছিল যখন শব্দ নবুব সঙ্গে মিলে
হাযুলি সাহেব (এবং কতকটা হোসেন
সোহরাওয়ার্দি) ভারত বিপ্লবীকরণ সত্ত্বেও
বাংলায় নেতৃত্ব দাবার যে অতি বিলম্বিত
প্রচেষ্টায় নামলেন। হক সাহেবের মানসিক
সাদুতা ছিল সেই প্রকাশে, কিন্তু তা
কার্যকরী ছিল না। এব বহু কারণ আছে, যা
হুসনি তা নিয়ে হা হতাশ বুঝা, তাহাড়া
সেদিনের অসিদ্ধ অবস্থায় যাব আর পাঁচ
মতামত 'নেটিং' হাকো গণগোলের ভয়
এবং অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী কুটিলতার
সামনে ওঠা লড়াই বিনা সম্ভব ছিল না।
সে লড়াইয়ের জন্য কংগ্রেস তৈরি ছিল
না, ইচ্ছুকও ছিল না। আরহা বামদলী
বলে এ নিয়ে বড়াই করার অধিকারী নই;
আমরাও দেশ বিভাগের যে অসিদ্ধাপ
তারক ঠেকাবার কাছে হেঁটই সহায়ক হতে
পারি; এর 'যারজায়ে' আমরাও
'অশীদার'।

মোটামুটিভাবে কলকাতা হকের
সমন্বায়ক এবং কতকটা তুলনীয়
করেছেন মুসলিম নেতায় কথা মনে
পড়ছে। শ্রুতির উপর নির্ভর করে প্রত্য
সিঁধে চলেছি। তাই বিবরণ সম্পূর্ণ হবে
না, তুল ত্রুটিও থেকে যাবে। প্রথমে মনে
আসবে আমার সিঁধে সন্ধানীয় বক্তৃ
নগলের অলী সাহেবের কথা। সঙ্গে সঙ্গে
তাই শামসুদ্দিন আহমদ, সৈয়দ
জালালুদ্দীন হাযুলি (প্রায় পশু হারেও বেশ
কিছুকাল বাহাদুর সত্যর তেঙ্গুটি
শ্রীকর), ডকলতার 'জালা মিঞা' প্রমুখ
হুসনীর সাংসদের কথা। মনে পড়ছে
১৯৩৫ সালের শাসন সংস্থার অনুযায়ী
১৯৩৭-এর নির্বাচনে কলকাতা হক
সাহেবের কৃষক প্রজা পার্টি প্রকৃত সাক্ষ্য
পাবার পর তিনি হাইকোর্টের বার
লাইটেরিতে এলেন আর শব্দেত্র নবু
বহাং উল্টে এসে আসিচ্চন কখন, সবাই

উল্লসিত হয়ে যেত। অনেকেই আশা
ছিল যে কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে হক সাহেব
হিস্ট্রিয়া গড়বেন, কিন্তু তা হল না।
কংগ্রেসেরই অলীয়া এর ফল কারণ, আর
শীঘ্রই দেখা যেনে বাংলায় কংগ্রেস
নেতৃত্বের প্রায় অটল কৃষক বাহাবিরোধী
মনোভাব। Bengal Agricultural
Debtors Act-এর মতো আইনেও
কর্মিদার মহাজনদের স্বার্থবক্ষায় ব্যস্ত
কংগ্রেসের সার ছিল না; বাংলার
হেমনতী জনতার মধ্যে এভাবে এমন এক
বিস্তী বাহাবানের বীজ বপন করা হয়েছিল।
(হেতীপ্রমোহন সেনগুপ্ত, সূত্রাবতন্ত্র নবু
হতো নেতা হাকো সত্ত্বেও) যে ভারী কৃষক
কুটে উঠল বাংলা আর পাড়াগে (উভর
প্রদেশেই মুসলিম সিঁধ বেশ কিছুকাল দুর্বল
হওয়া সত্ত্বেও) আর দেশবিভাগের সাজা
আমাদের মাঝার ব্যক্তের মতো গড়ে
হাবীনতার আনন্দ আর উদীপনাকেই
তুলিয়ে নিতে পারল।

একরকমের অল্পত অধিরমতি সত্ত্বেও
কলকাতা হকের তেজস্বী আত্মবিশ্বাস
আত্মবিশ্বাস তাকে এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ত্বিত
করেছিল, সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হিসাবে
অন্যভাবেও আবেগপ্রবণতা তুল পথে
ঠেলে দিলেও তিনি কখনও নিজস্ব
স্বকীরতা হারাননি। মুসলিম সিঁধে
থেকেছেন, আবার থাকেননি, সিঁধের
১৯৪০ লাহার অধিবেশনে তিনিই
পাকিস্তান প্রস্তাব উপস্থাপনের তার পান
(যদিও 'পাকিস্তান' বিষয়ে সেদিনের
পত্রিকায়না পর বিকৃত হয়ে যায়), অথচ
কিহাদ-এর অযাব একদারকল্প মনতে
পারলেন না বলে তার পূর্ণ আছা পেলেন
না। দেশ ভাগের পর স্বত্বটি বহিরাশলে
সিঁধেও চুপচাপ থাকেনি। কিহাদ-এর মৃত্যু
আর লিয়াকত আলী খানের হত্যাকাণ্ডের
পর দেশের বাঁচানোর জন্য মহলান
ডালাসি প্রমুখকে নিয়ে দূতত্বচী নকলেন
আর লিয়াকত হাযিরে দুখাবাহী হলেন
১৯৫৪ সালে। তখনই উর্দু ভাষা বাংলার
ওপর চাপাবার সিঁহাট লড়াইয়ের সূচনা
আর সেজন্যই কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকার
হক সাহেবের দুখাবাহি ব্যয়িত করে দেয়।

পূর্ণ পাকিস্তানে তৎকালীন বৈরশাসন
কলকাতা হক কিহা আবুল হাযিরের মতো
মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারল না, কিন্তু
ওদেরই অলসতা প্রত্যাবে গড়ে উঠেছিল
এমন পরিস্থিতি যা হটল বাংলাদেশের
"তিথিবিকার-উদার-অভ্যুদয়",
বোম-ত্রুটি সত্ত্বেও যা এই উপমহাদেশে
ইতিহাসের নতুন অধ্যায়ের সূচনা নির্মাণ
করল।

হাবীনতাপূর্ণ বাংলার বাহাদুর সত্যর
দুখাবাহী হাকাকালে (তখন বলা হত
'প্রধানমন্ত্রী'), কলকাতা হক নানবিক
থেকে বার্ষ মনোরথ হলেনও এমন
শ্রুতিবাহিতাও সাহস যেথিয়েছিলেন যা
আজকের মনে বিশেষভাবে শ্রবণীয়। পুথ
সংকেতনে এখানে জানাই ২ জানুয়ারী
১৯৪২ তারিখে আতিথাতার্ব অবরনত
লার্ট Sir John Herbert-এর উল্লেখের
জ্বায়ে হক সাহেবের চিঠির কথা। সরকারী
কাজে লার্টসাহেবের হস্তক্ষেপ মনতে
পারলেন না বলেছিলেন অল্পত, উল্লেখের।
'হকের প্রয়োজনে' বাংলার জনজীবনে
দুঃখ দুর্দশা বিকটভাবে বাড়ানো হচ্ছে বলে
তার প্রতিবাদ। দেশভেদে অসন্তোষের
আগুন তখন ছড়িয়ে পড়েছিল, আর তারই
প্রতিবাদি হক সাহেবের চিঠিতে। "As
the head of the Cabinet I cannot
possibly allow this attitude on your
part to go unchallenged...I have
detected your personal interference
in almost every matter of
administrative detail. You should
allow Provincial Autonomy to
function honestly rather than as a
cloak for autocratic powers as if
the province was being governed
under section 93 of the Act"
অনুবাদের মরকার নেই কিন্তু উক্ত, সংসদীয়
নীতিসম্মত ভাষার এমন চপচটাবতে
অহত্বারী যেমন লার্টসাহেবের বণ্ডবে যে
প্রতিম হুদে উঠেছিল সন্দেহ নেই। হক
সাহেবকে এর দ্বন্দ্বও বিতে হয়েছিল,
তাকে অবশিষ্টলিয়ে হুদিতও হয়েছিল।
কিন্তু পরাবীনতার দুখে এ ধরনের সংসাহস

যেখানকার মতো মানুষ উভয়দিকের মধ্যে একান্ত বিতর্ক।

এই সপ্ত মনে পড়বে স্বাধীনতাশূর্য
মুগ্ধেই ২১ মার্চ ১৯৪৭ তারিখে বঙ্গীয়
বায়োপাক সভার অধ্যক্ষ (speaker) সৈয়দ
নওশের আলী সাহেবের আশীর্বাদমণীর উক্তি
যা এ দেশের সংসদীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে
সিঁথিত থাকে উচিত। বায়োপাক সভার
পরাক্রান্ত সভাপতি বায়োপাক যে চৌধুরী
লাটসাহেব গুপ্তন করেন, তাকে নাকচ করে
দিয়ে তিনি অকুতোভয় ঘোষণা করেন :
"The Ministry is the creature of
the House; The House can make
or unmake The Ministry and the
Governor is but the registering
authority of the decision of the
House"। দেশ যখন পরাধীন, দুর্ভাগ্যলীন
কড়াভক্তি ঘন কঠোর, তখন এই উজ্জ্বল
বায়োপাকই দেশের মানুষের মুখে বল
এনেছিল। এই 'নির্দেশ' ছিল বলে
স্বাধীনতা পরবর্তী বিধানসভার অধ্যক্ষ
বিজয়কুমার বায়োপাক প্রসঙ্গের
অনবিকার চ্যালেঞ্জ। বায়োপাক নৈতিক
সম্মতি পেয়েছিলেন। কলম্বু হুকে স্মরণ
করার সঙ্গে আমাদের অসংখ্যই স্মৃতি
বহু নওশের আলী সাহেবকেও অভিমান
জানাই।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও দেখাওঁ অত্যন্ত দীর্ঘ
হয়ে গেল। তবুও অবশেষে আদার মনের
ব্রত প্রকাশ করতে চেয়েই একটি কথা
জানতে চাই। কলম্বু হুকে মতো
দেশব্রতী বায়োপাক কথা আচ্ছন্ন ভারত
রাষ্ট্রে এবং বায়োপাক শাসিত পশ্চিমবঙ্গেও
মুসলমানদের কেমন যেন সংকুচিত ও
এখনও মুগ্ধ বকিত অবস্থান দেখে ভী
ত্ব আর ভয় হয় যে এখানে (বিশেষত বি
জে পি কেন্দ্রে বহাল গভার্নার হুকে) কার্বত
'কমিশনারপত্নী' মুসলিম স্ট্রিট গিয়ে
'বিশুদ্ধবোধ'—গ্রই আবিপত্য কেন চলবে।
বিলম্ব আনন্দ পেয়েছিলাম যখন বঙ্গ
খানেক আগে কলকাতা কংগ্রেসের
সংবর্ধনা জানার পশ্চিমবঙ্গের প্রায়ের
হেসে, অর্থ পশু অবস্থায় দুটি কাঠের পা
নিচে যে ইংলিশ গ্যালেণ্ড গভার্নার নিয়ে পার

হয়েছে সেই মসুম নবমানকে। তার এই
চমকপ্রম সাহসে যেন বেবেছিলাম মুসলিম
জনসাধারণেরই অগ্রগতির সূচনা। কিন্তু
তার এখনও অনেক দিহিরে; পাঁচজন
বায়োপাক মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে একজন
মুসলমান হলেও জীবনের সর্বকেন্দ্রেই
তার যেন পশ্চিমবঙ্গ। এর সংসদে
কেনন করে হবে তা ভিন্ন প্রশ্ন, কিন্তু
কেন এমন হতে থাকবে? সবাই বাবেই
ভাবিত হইছে বলে তো মনে হয় না।

আসল সংযুক্ত সমস্যার সমাধান নয়
জানি, কিন্তু এটা কি চিন্তার বিষয় নয় যে
১৯২৬ সালে লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভ
করেন মাত্র ২১ জন মুসলমান? ১৯৩৭
সালে লোকসভার নির্বাচিত হন মাত্র ১৬
জন মুসলমান; ১৯৬২ সালে ২০;
১৯৬৭ সালে ২৮; ১৯৭১ সালে ২৪;
১৯৭৭ সালে ৩১; ১৯৮৪ সালে ৪৪;
১৯৮৯ সালে ২৭; ১৯৯১ সালে ৪০!
'টেলিগ্রাফ' বৈমিত্তিক ৭ এপ্রিল ১৯৯৮
তারিখে একটি প্রবন্ধে দেখি যে ১৯৯৮
সালের নির্বাচনে মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব,
গুজি, রাজস্থান আর তামিলনাড়ু
কুড়িটা রাজ্য থেকে একজন মুসলমানও
জেনেননি। এটা ঘটনাই যদিও সারা দেশে
নতকরা হারো হল তাদের জনসংখ্যা। শুধু
মুসলিম নয়, এভাবে বকিত উল্লসি
জাতি উপজাতির কম বেশি পরিমাণে
'বলিত' হারা। সরকারী ও সরকার
নিয়ন্ত্রিত সংস্থা মুসলিম অনুপাত হল
ইন্ডিয়ানদের মধ্যে নতকরা মাত্র দুই;
ডাক্তারদের মধ্যে তারা নতকরা ২.৪;
'আই-এ-এস' নতকরা ২.৮৫; আই
পি এস, নতকরা ২; ইন্ডিয়ান ট্যাক্স
অফিসার নতকরা ৩.০১; ক্রাস ওয়ান
অফিসার নতকরা ৩.৩; ব্যাংক কর্মচারী
নতকরা ২.৮। বাকিরা থাকেনায়ে এর
চেয়ে একটু ভালো অবস্থা: নতকরা প্রায়
চার! এটাই কি চলবে?

পশ্চিমবঙ্গের লোকপত্নী মুসলিম ও
অন্যান্য বক্তিতা যে ক্রমাগত শিথিলেই
হয়েছে এটা কি ক্রিয়? জাতি বায়ামিক ও
উচ্চ বায়ামিক পরীকার কলকাতা বার হবার
পর বছরের পর বছর দেখে আসছি যে

প্রথম পক্ষ কি একেবারে সকল প্রার্থীরা
প্রায় সকলে বর্ণ হিন্দু—মুসলমান ও
হিন্দুদের তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর দু'
একজন হিটলে-হাটলে থাকতে পারেন।
তারি খারাপ লার এখন বেশি সাহিত্যিক
নির্ভী প্রভৃতির সন্দেশে বায়োপাক
মুসলিম উপস্থিতি একেবারে অত্যন্ত কম।
বাংলা আভাষের দুটি প্রধান কীর্তিতে
৭০/৭২ জনের মধ্যে মাত্র একজন
মুসলিম।

বঙ্গীয় জন্মক উপলক্ষে উৎসবে
বাংলা আভাষে আত্মপন (১০-৪-৮৮)
করলেন পুনিব্যাগী উৎসবে চিত্রসজ্জা
শ্রীকৃষ্ণ, বাবের মধ্যে মাত্র একজন
মুসলমান আর বাকি সবাই বর্ণ হিন্দু শুধু
নয়, 'শিখ'! ১৪ যে ১৯৮৮ তারিখে
আভাষেরি কবি সন্দেশে ডাকলেন ৪১
জনকে হারা সবাই উৎসবের হিন্দু!
পশ্চিমবঙ্গ সরকার সূচ্যচক্রের 'স্বতন্ত্রকার্য'
'কমিটি' নিয়োগ করলেন (৯ ফেব্রুয়ারি
১৯৯৭)। যার সভা সংখ্যা বহিষ, বার
মধ্যে একমাত্র মুসলমান হলেন বিধানসভার
অধ্যক্ষ পরাবিকারী হামিম জাকুল হালী।
হাজো কাছ কাগজটা নেই কিন্তু মনে
পড়বে যে ব্রজী কলম্বুহুটী উপলক্ষে
গানের বিলাট আসরে হুতো বাংলাদেশ
থেকে নিমন্ত্রিত দু' একজন থাকলেও
পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান একজন নেই।
হুতো—হুতো কেন, এটাই
'বায়ো'—কিছু কী উৎসবের বাতাস! এর
সঙ্গে কত কথাই জড়িত রয়েছে যা কি
আমাদের ব্রত দেব না?

ঐতিহাসিক কাগজেই স্মৃতি কবিত
"heart unity" ("হৃদি সে হৃদি
মিলান") আজও হটেনি। এর আভাস
দিয়ে স্বাধীনতা তে কতবার সবাইকে ডাক
দিয়ে গেছেন, কিন্তু (যাঙ্গ, যখন নিবহি
ও ডিসেম্বর, বায়ী মসজিদ অংসের 'স্বতি'
মনে রেখে) জোর করে আনা করতে
চাইছি স্বাধীনতা কবিত "স্বাধীনতারবর্ষ"
একদিন আমরা সবাই খালি করব—কলম্বু
হুকে হুতো গোবে গুণে তরা অর্থ বৃহৎ
ও মধ্য মানুষকে এ জন্য 'স্মরণ' করছি,
অভিমান জানাছি।

ফজলুল হক : অন্যতম জননেতা

বিনয় চৌধুরী

ফজলুল হক সাহেব ১৮৭০ সালের ২৬শে অক্টোবর বরিশাল জেলার চাখার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কাজী ওয়াজেদ আলী। অধিতক খালের ও পরবর্তীকালে অন্যতম প্রখ্যাত জননেতা। ১৮৮৯ সালে বরিশাল জে ফুল থেকে এটুল পাল করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে অনার্স সহ বি এ পাস করেন। ১৮৯৫ সালে এম এ ও ১৮৯৭ সালে এম এফ পাস করেন। ওকালতিতে কিছুদিন লিঙ্কানবিশী করার পর ১৯০০ সাল থেকে স্বাধীনভাবে আইন ব্যকসা শুরু করেন। ১৯০১ সালে মহাক্ষা অনিশিষ্টাধ্যাপক পদের সঙ্গে তাঁর পত্রিকার ঘটায় ফলে বরিশাল নগর ইউনিবিসিয়াল নির্বাচনে এবং বরিশাল জেলা বোর্ডের নির্বাচনে জয়লাভ করেন। ১৯০৫ সালে ঢাকার মুসলিম ব্রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগদান করেন এবং যোরাই দিয়ে মহম্মদ আলী জিন্নার সাথে পরিচিত হন। এর পরই ঢাকার মুসলিম লিগ জয়লাভ করে। ১৯০৬ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদলাভ করেন। পরে সমগ্র বিভাগে আর্টিস্টাই প্রেক্ষিত্যেরে পদে থাক করেন। ১৯১১ সালে প্রেক্ষিত্যেরে পদে উন্নীত না হওয়ার সরকারি চাকরি ত্যাগ করেন। এতপর কলকাতা রাইজকোর্টে ওকালতি করতে থাকেন। এক বছরের মধ্যেই দলের খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯১০

সালে বর্ষীয় প্রাথমিক সেক্রেটারি ও নিখিল ভারত মুসলিম লিগের জয়েন্ট সেক্রেটারি পদ লাভ করেন। সুবল হিসাবে তাঁর খুবই খ্যাতি ছিল। ১৯১৬ সালে কলকাতায় টেইলর ও কারমাইকেল হাওয়াসে স্থাপন করেন। লন্ডোনে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের যুক্ত অধিকলনে যোগ দেন। ১৯১৭ সালে ভারতীয় প্রেস আর্ট-এর বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন। ১৯১৮ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লিগ সভাপতি এবং নিখিল ভারত কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারি হন। ১৯১৯ সালে রাউলট আর্ট-এর বিরুদ্ধে, কলেজ ভেদমহার সভ্য সভাপতিত্ব করেন।



১৯৩৭ সালে ফজলুল হক সাহেব কৃষক-প্রজা পার্টির নামে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা অনেকে নির্বাচিত হন।



জামিতানওয়ালাবাং ইত্যাকারের কংগ্রেস বিরোধিতা তুলত করিণি সন্যাস ছিলেন। ১৯২১ সালে নজরুল ইসলাম ও মুক্তাব্দর আহমেদের যৌথ সম্পাদনে “নবদুগা” পত্রিকা প্রকাশিত হয় ফজলুল হক সাহেবের আর্থিক সাহায্যে। ১৯২৪ সালে কৃষক দ্বারের জন্য লিঙ্কানবিশী পদে বৃত্ত হন। ১৯২৬ সালে কৃষক আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং ঢাকার প্রজা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯২৭ সালে বর্ষীয় কৃষক-প্রজা পার্টি স্থাপন করেন ও তার সভাপতি হন।

১৯৫০-৫১ সালে গোল টেবিল চৈত্রে অনায়ে প্রতিদ্বিবি হিসাবে যোগ দেন। ১৯৫৫ সালে কলকাতা কণ্ঠেত্রলনের মেঘে নির্বাচিত হন কিন্তু বিপাক বলের বিরোধিতায় পদচ্যুত হন।

১৯৫৭ সালে ফজলুল হক সাহেব কৃষক-প্রজা পার্টির নামে নির্বাচনে প্রতিদ্বিতা করেন। তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা অনেকে নির্বাচিত হন। পরে কংগ্রেসের সহকর্তার তিনি প্রতিদ্বিতা পঠন করেন এবং অধিতক খালের প্রধানমন্ত্রী হন। তখন দুখান্দী না হলে প্রধানমন্ত্রীর কলা হত। এই সময় শুশু খালার নয়, মুসলিমস্বয়ম পাঠাব, সিদ্ধ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কোথাও মুসলিম লিগ জিততে পারেনি। পাঠাবে সেক্ষেত্রার যামাং খানের ইউনিট পার্টি

জোড়ে; সিকুতে খুতো হল জোড়ে এল
উণ্ড-পন্ডির সীমান্ত গ্রন্থেলে কাংসে
জোড়ে।

এই শটকুটি ছিল ১৯২১ থেকে
১৯৩১ সালের ঐতিহাসিক ভূখণ্ডের ভূখণ্ডের
সমষ্টি। এই সমষ্টি কৃষক ও শ্রমিকদের
ভূখণ্ডের ভূখণ্ডের হয়। কৃষকের উৎপাদ
পাল্লার-বাম খুই পড়ে যায়। তারা
ভীষণভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। চন্দ্রকুটি
হয়ে সুন্য বাড়ায় বন শোর জমাও কৃষকের
পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই শটকুটিতে
কৃষকের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা পুঞ্জীভূত হয়। এই
প্রতিফলন এই নির্বাচনে পড়ে। এই সময়ে
কলকল হক সাহেব কৃষকের হাথের যে
সব কাজ করেন তা ইতিহাসের পাতায়
কর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি স্বপ্ন সাক্ষিনী
বোর্ড গঠন করে, এই স্বপ্ন ছাড়া বেওয়ার
বাবুয়া করেন তখনে বহু কৃষক বেঁচে যায়।
তিনি আইন করে চন্দ্রকুটি হয়ে সুদের
বাবুয়া রূপ করেন। চন্দ্রকুটি হয়ে সুন্য এক
বছর পরে আসলের সাথে মূল হত, ফলে
আসল ক্রমশ থেকে বেত, সুন্য এই বর্ষিত
হাথের আসলের উপর গননা করা হতো,
ফলে সত্যিকারের আসল ৩-৪ গুণ হয়ে
বেত। তাই শোর বেওয়া অসম্ভব হতো।
কন সাক্ষিনী বোর্ড-এর আইনে প্রকৃত
কনের শতকরা ৪০ ভাগের উপরে যা সুন্য
জমেনে তা কৃষকেরা ছাড় পাবে। সুদের
হার কোনমতেই শতকরা ১০-১৪ বেশি

১৯৪১ সালে জিয়ার সাথে

বিরোধ শুরু হওয়ায় তিনি
লিগ থেকে বহিষ্কৃত হন।

ফকলুল হক সাহেবের
কৃষকের হাথের এই সব কাজ
কংগ্রেস ও লিগের জমিদার
জোক্তদারদের পক্ষ হয়নি।

১৯৪১ সালে জিয়ার সাথে



১৯৪০ সালে মধ্যবর্তী কলকল হক সাহেব কৃষকের হাথের উপর গননা করা হতো। পরে এসে
জমেনে কলকল হক

হবে না। এই কল কৃষকেরা যে কতখানি
উপকৃত হয়েছিল তা আমি নিজে
অনেকগুলি স্থান সাক্ষিনী বোর্ড ঘুরে ঘুরে
সেবেছি। এছাড়া বর্ষীয় প্রকাশের আইনের
সম্মোদন করে কোর্টা প্রজ্ঞাকে জাতির বহু
বেওয়া হয়। এছাড়া ফকলুল হক সাহেবই
কৃষকের অসহায় অনুসন্ধানের জন্য
“ল্যান্ড কমিশন” গঠন করে। এই ল্যান্ড
কমিশনই বর্ষাকালের ফসলের তিন ভাগের
দুভাগ ও মালিকের এক ভাগ বেওয়ার
জনা অনুমোদন করে। এরই উপর তিরি
করে ইতিহাসিক “তে-ডালা” সংগ্রাম
পড়ে ওঠে অবিভক্ত বাংলার সর্বমুখ কৃষক
সংগ্রাম।

১৯৪১ সালে জিয়ার সাথে বিরোধ
শুরু হওয়ায় তিনি লিগ থেকে বহিষ্কৃত
হন। ফকলুল হক সাহেবের কৃষকের হাথের
এই সব কাজ কংগ্রেস ও লিগের জমিদার
জোক্তদারদের পক্ষ হয়নি। কৃষিক সন্তোষও
ফকলুল হকের কাজকর্ম পক্ষ করেনি।
ফলে এই তিন পক্ষই তাঁর বিরুদ্ধে বহুবার
শুরু করে। অবশেষে ফকলুল হক

সাহেবের কোমলপিন সন্তোষের গঠন হয়
এবং নাজিমুদ্দিনের লিগ সন্তোষ হয়। পরে
আবুল কাশেম ও সারওয়ারি নাজিমুদ্দিনকে
সচিব সন্তোষের সন্তোষের গঠন করে।
সেই বিতর্কের পর তিনি দোকার নিয়ে
আবার ওকালতি শুরু করেন। দুস্তারটি
সন্তোষের তিনি এফজান কলনেতা নন।
এই সময়ে আবার প্রকাশ পায় তাঁর প্রতি
হিন্দু-মুসলমান আস্থা কতখানি ছিল।
আমার মনে আছে অনেক রিকিউরি দারা
আমনে এসেছিল, তারা আবার কিরে
দাখল জমা তৈরি হয়। কিন্তু মাত্র ৩৭ দিন
পর এই ইতিহাস জোড়ে নিয়ে গভীরের
শাসন জারি করা হয়। ১৯৩৯ সালে
পূর্ববঙ্গের গভীর নিবৃত্ত হয়।

২৭ এপ্রিল ১৯৩২-তে তাঁর জীবন
অবসান হয়। কং প্রতিষ্ঠার অধিকারী এই
অনন্যসাধারণ মানুষ, অসহায় অনেক কাজ
হাশের মানুষ হতে পারতেন, যদি তিনা ও
ডেভার হাথ হাথ অসম্ভব না থাকত।
তবু তাঁর অবদানের জন্য তিনি চিরস্মরণীয়
হয়ে থাকবেন।

স্মৃতির অলিন্দে

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র

আমূল কাশেম ফজলুল হক
(সংক্ষেপে ফজলুল হক)
আমার বাবা নির্মলচন্দ্রের বড়
হিসেন আর সেই সুযোগে আমি তাঁর
সান্নিধ্যে প্রথম আসার সুযোগ পাই।
তিনি আমার বাবার চেয়ে প্রায় ১০
বছরের বড় হিসেন। কিন্তু কংগ্রেসে
একসঙ্গে প্রথম জীবনে ভাগ করার দরুন
গাড়ি বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ফজলুল
হক সাহেব বহীদ প্রাথমিক কংগ্রেসের
সভাপতি না হলেও অনেক উচ্চ পদ
পেয়েছিলেন। কংগ্রেসের সহকারী বহীদ
প্রাথমিক সম্মেলনের সভাপতি
হয়েছিলেন তিনি ১৯২০ সালে
হেবিনীপুরের অধিবেশনে। নির্মল চন্দ্র
বেশ কিছু সময় বহীদ প্রাথমিক কংগ্রেস
কমিটির কোষাধ্যক্ষ হিসেন আর পরে
সভাপতিও হন। বেশবন্ধু চিত্তবল্লভের
মৃত্যুর পর বহীদ কংগ্রেসের পঞ্চপ্রধান
নেতা (বিশ্ব কাইত)-এর অন্যতম
হিসেন নির্মল চন্দ্র, অন্যেরা হলেন
বিদ্যনচন্দ্র চার, নরহা বসু, নলিনী সরকার
ও তুলসী গোস্বামী। বহিও ফজলুল হক
পরে কংগ্রেস ছেড়ে কৃষক প্রজা পার্টি
(কে পি সি) প্রতিষ্ঠা করেন, তবু
আমার বাবার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক
ভুল হয়নি।

ফজলুল হক সাহেব ১৯৩৭-এ
অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী বা প্রিভিয়ার

হন। তখন ওই সময়ে চিফ মিনিষ্টার বা
মুখ্যমন্ত্রী বলা হত না। নির্বাচনে মুসলিম
লিগের সঙ্গে লড়াই হওয়া সত্ত্বেও
কংগ্রেস কৃষক প্রজা পার্টির সঙ্গে মিলে
সরকার গড়ে তুলে না হওয়ার ফজলুল

ফজলুল হক সাহেব খাঁটি
বাঙালি, বাঙাল ভাবার টান
হিল কথার। শ্যামবর্ণ।
পরনে পাঞ্জাবি, পায়জামা
আর চুপি। কথা প্রসঙ্গে
বললেন, গাঁয়ে ঘরান যাই,
লোকে বলে চাউল নাই। কী
খাব? আমি বলি, চাউল
নাই তা কী হয়েছে? কসু,
কসু খেতে পার না?

হক সাহেব মুসলিম লিগের সঙ্গে
কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। এটি
সরকারে হিন্দু ভবিষ্যত প্রতিনিবিয়া
হিসেন আর হিসেন অর্থমন্ত্রী নলিনীচন্দ্র
সরকার।

এই সময় আমার পিতৃবন্ধু ডাক্তার
অজিতলাল রাহাচৌধুরী তাঁর অধি নিবাস
টাকীতে একটি হাসপাতাল স্থাপন করেন।
তাঁর ইচ্ছা হল যে ওই হাসপাতাল
বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হক উদ্বোধন
করেন। তিনি নির্মল চন্দ্রকে দিয়ে হক
সাহেবকে নিমন্ত্রণ জানান। হক
সাহেবও সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

তখন ছিল বাবাসাত-বসিরহাট লাইট
বেলওয়ে, কলকাতা থেকে টাকী যাবার
প্রস্তুত বাহন। ছোট লাইন, ছোট ছোট
কামরা, বিচ্ছিন্ন করে ট্রেন ধীরে ধীরে
চলে। এই গাড়ির একটি প্রথম শ্রেণীর
কামরার ফজলুল হক সাহেব, নির্মল চন্দ্র
আর আমি উঠলুম। কামরা ছোট হলে কী
হবে? বেশ সুসজ্জিত, বসিওযালা সোফা,
আলো-পাখার সুবন্দোবস্ত। তখন এত
সুখস্বপ্নর বাজবাড়ি ছিল না, ব্যাক কাট
বেদরুমীর কথা তাবাই বেত না। অল্প
কিছু বাকী পাশের কামরায় উঠল।

আমি এখানে শ্রোতা, বড়রাই
কথামারা বলতে লাগলেন। অন্তরম
কথামারা। ফজলুল হক সাহেব খাঁটি
বাঙালি, বাঙাল ভাবার টান ছিল কথার।
শ্যামবর্ণ। পরনে পাঞ্জাবি, পায়জামা আর
চুপি। কথাপ্রসঙ্গে বললেন, গাঁয়ে ঘরান
যাই, লোকে বলে চাউল নাই। কী খাব?
আমি বলি, চাউল নাই তা কী হয়েছে?
কসু, কসু খেতে পার না? (আমি তাঁর

ভাষার সঠিক অনুশীলন দিতে পারছি না, এ জন্যে আমি দুঃখিত।)

আমি মনে মনে ভাবসূত্র, কত? কত আবার কী? শব্দটা শুনে হাসি গেল। পরে মনে পড়ল কত মানে লাভ। (পরে মনে হচ্ছে যে আবে এক চুখাময়ী প্রবুচ্চর সেন খাদ্যভাবের সময় বলতেন, কাঁচকলা খাও। এ জন্যে তাঁকে উপহাসাশ্রম হতে হতছিল, কিন্তু হক সাহেবের জনপ্রিয়তা কমেনি।) তিনি প্রায়ের লোকসেবের প্রামা ভাষায় কোথগমা করে ভাষণ দিতেন।

এক সময় নির্মাল চক্কু ভিক্সান কলেন, হক সাহেব, আপনি টি-মুসলিম লিগকে ইলেকশনে হানিয়ে দিলেন। এখন আবার ভাষের নিয়ে কোয়ালিশন সবকার কবেছেন। তেমন লাগছে?

—হড় কক্কট। বাইরের উমু-বলা মোহলমানরা আমাদের উপর হুডি ঘোষাতে চায়। এ আমি সহিব না। ফকলুল হক কারও বান্দা নয়। বাঙালি মোহলমানের ওপর পক্ষিতী মোহলমানবা নবাবি কবে, এ আমি মানব না।

পরবর্তীকালে হলও তাই। ফকলুল হক লাহোরে প্রথম পাকিস্তান প্রস্তাব তুললেন। তা পাস হল। তখন তিনি মুসলিম লিগের সভাপতি। কিন্তু ভিক্সান নির্দেশ তিনি অমান্য কলেন। তাঁর মন্ত্রিসভা ডেঙ গেল। এ সব পরের কথা।

কিন্তু পরে নমাজের সময় হল। ফকলুল হক সাহেব নিজ ট্রেনেব কামরাব মেজের ওপর একটা চান্দর বিছিয়ে পশ্চিম দিকে ঘুর করে নমাজ পড়তে শুরু কলেন। আমি তো তাক্কব। বাংলার প্রধানমন্ত্রী জগদীশ্বর আম্রা-র কাছে আস্থনিবেশন কলয়েন প্রকাশে! বাইরের দর্শক দুই হিন্দু। তাও ট্রেনেব কামরাব। হক সাহেব খাটি মুসলিম, আলাদাগত প্রাণ। আমি জন্য



১৯৫৫ সালে কলকাতা কলেজিয়েটের উদ্বোধন

কোনও উচ্চ পদবিচারীকে এমন করে প্রকাশে বর্হচর্চা করতে দেখিনি, অথচ পরে এই ফকলুল হক সাহেব হিন্দু মহাসভার নেতা ডঃ শাম্মাপ্রসাদ মুখার্জির সঙ্গে খিটখিট কোয়ালিশন মাস্তুলত কবেছিলেন, শাম্মাপ্রসাদবাবু ছিলেন সেই

মাস্তুলত প্রথমন্ত্রী। অবশ্য সে মন্ত্রিসভাও বেশদিন টেকেনি। শাম্মাপ্রসাদ আপেক্ষে পনত্যাগ করেন। হক সাহেবকে দাঁত থেকে প্রায় সবিয়ে দেওয়া হয় মিথ্যা আত্মসার নিয়ে। এ সব কাহিনী আত্মবিত্তাব

এক ঐতিহাসিক মিওনার্ড বর্ডন সাহেব অনুশূনিক বর্ণনা করেছেন তাঁর নতুন বই 'ব্রাদার এগেনস্ট দ্য বাক্স' প্রসঙ্গে। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, ফক্সনুল হক ছিলেন অব্যবহিতিক, চপল ঘড়ি; যাতে যা ভাবেন, সত্যকে তাব বিপরীত করেন। আমারও মনে হয় ফক্সনুল হক ছিলেন স্বাধীনচেতা, আত্মবিশ্বাসী মানুষ। তাই তাঁকে অনেক ব্যক্তিগতিক শাস্তি পেতে হয়েছিল। এসব আমার প্রত্যেক অভিভক্তার বাইরে। এখন সে-সব ইতিহাস হয়ে গেছে।

হাসপাতাল উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি ছিল পজনুশক্তিক। তার বিবরণ দেওয়া নিম্নরোজন। বর্ডগ্রাল ফক্সনুল হককে ট্রেনে নখাক পড়া আমার মনে জাকর হয়ে আছে।

এর কিছুদিন পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সভায় তাঁকে আবি ফের দেখি। আমি তখন ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক, এক প্রবান কর্মকর্তা। আমার সহপাঠী আবু সৈয়দ চৌধুরী ছিল বহীশ্র পরিচয়নে সম্পাদক। আবু সৈয়দ পরে স্বাধীন বাংলার প্রথম রাষ্ট্রপতি হয়েছিল। তখন এসব কথা আমাদের কখনার বাইরে ছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজ সরকারি কলেজ। সেখানে বাংলা সরকারের প্রধানমন্ত্রী ফক্সনুল হক সাহেব এসেছেন। এই সুযোগে আমি আমার ভাষণে ঘনি ভুলসান কলেজের একটা বক দল চাই। কলেজ ল্যাবরেটরি হলে (যেখানে সভা হচ্ছিল) মোটেই কাঙ্ক হলে না। সেদিনের সভার সভাপতি ছিলেন ডক্টর প্রবানাক ব্যানার্জি। তিনিও আমাকে সমর্থন করছিলেন। হক সাহেব আমাস বিলেন। কলেজে বড় হল হবেই। হাতডালিতে সভা কেটে পড়ল। পরে ক্যাম্পাস বিতে গিয়ে আমি সম্মোখশলে বললুম, প্রধানমন্ত্রী তো আমাস বিলেন, কিঙ্ক সভায় বাইরে গিয়ে তিনি ভুলস দাবেন না জে? অনেকেই হাসল। পরেয়দিন সংবাদপত্রে আমার কথাই

একটা খবর হয়ে গেল। ছাত্র ইউনিয়নের সম্পাদক প্রকাশো প্রধানমন্ত্রীর কথায় সন্বেহ করেয়ে। এ কথায় তিনি কুঙ্ক হয়েছিলেন কিনা জানি না। তাঁর বিচ্ছ গোষ্ঠীর অনেকেই উল্লসিত হয়েছিল। তাঁর আদার কথাই সভা হল। ফক্সনুল হক সাহেবের সত্বে প্রেসিডেন্সি কলেজে হল হয়নি। স্বাধীনতার অনেক পরে ওই হল তৈরি হল, বর্তমান জিরোজিও হল। হাতো ফক্সনুল হক সাহেব রাষ্ট্রনৈতিক জামাজোলে তাঁর কথা রাখতে পারেননি।

বড় কঙ্কট। বাইরের
উর্-বলা মোহলমানরা
আমাদের উপর হুঁড়ি
ঘোরাতে চায়। এ আমি
সইব না। ফক্সনুল হক
কারও ব্যান্দা নয়। ব্যঙালি
মোহলমানের ওপর পশ্চিমী
মোহলমানেরা নবাবি করবে
এ আমি মানব না।

এশ্বর ফক্সনুল হক সাহেবের সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। সেপিত্তাল হল, তিনি পূর্ব পাকিস্তানে চলে গেলেন। সেখানে তাঁর অনেক উদ্বানপতন হল। প্রথম তিনি আডডোকেট ফেনহায়েল হলেন। পরে লিখ-বিরোঘী ব্রুটের নেতা হয়ে মুসলিম লিগকে হারিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হলেন। কিঙ্ক 'অরডের চক' বলে তার পঁজডাল্লি বিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর বহ্লিপঙ্ক জেডে বেধে। তিনি বৃহবদী হল। এ-খবর আমার মনে হচ্ছে এই অভিযোগের পিছনে বাসিকটা সভা ছিল।

আমি এখন পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সাংস্কৃতিক বিভাগের সম্পাদক; একদিন দেখি কংগ্রেস ডবনে জতুলা বোম্ব মহানগরে হয়ে তুতুল বিতর্ক। কংগ্রেসের টাকার পুরো হিসাব দেওয়া হয়নি। জতুলাবাবু বললেন, পুরো হিসাব দেওয়া যাচ্ছে না, কাণথ পূর্ব-পাকিস্তানের নিবারণে মুসলিম লিগ-বিরোঘী ব্রুটকে অনেক টাকা দেওয়া হয়েছে। এ সব কথাও প্রকাশো হল যায না। লিগকে হাবাবার কাজে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসও সক্রিয় ছিল এ কথা বললে আঙ্ক আর হুতুগুতি গুটী করা হয় না। এ ধবনের কাজ অনেক বেশেই হটে। আমেরিকার গুত নিবারণে কম্যুনিষ্ট চীনের কাছে অর্থ দেওয়া হয়েছিল, এমন অভিযোগও উঠেছিল।

বাই হোক, পরে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ফক্সনুল হক সাহেবের সম্বন্ধোতা হয়। ১৯৫৫-৫৬ তিনি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হল। পরের বছর পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর। ১৯৫৮ সালে তাঁকে ওই সব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এ সব যেন আবু হোসেনি ব্যাপার!

কিঙ্ক নির্ঘলচক্রেয় সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব আটুট ছিল। একটি ব্যক্তিগত পত্রে এতুখিন হয়ে লিগের প্রকাশ করলে অন্যায় হবে না। পত্রেটি লেখা হয়েছিল ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২-তে। হক সাহেবের এক আত্মীয়ের চাকুরির ব্যাপারে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়কে বরাস জানে। তিনি নির্ঘলচক্রে অনুরোধ করেন এ পত্রে। কতটা অন্তরঙ্গ হলে এই ধরনের পত্রে বিদেশ থেকে লেখা যায় আর 'I am yours affectionately' বলে নই করা যায়। সেটি দেখাবার জন্যে আমি পুরো পত্রেটি এখানে উদ্ধৃত করছি। ইংরেজিতে খুব বিকট আত্মীয়দের মধ্যেই সভ্যতার 'yours affectionately' লেখা হয়। নির্ঘল চক্রেয় সঙ্গে ফক্সনুল হক সাহেবের এইরকম হুনিষ্ট সম্পর্ক ছিল।

A. H. Fazlul Haq

ADVOCATE GENERAL, EAST BENGAL)

27 K. H. Das Lane

Dacca

My dear Mirza,

You remember that on the last occasion I was in Calcutta, I spoke to you about my nephew A.B. Yusuf Ali, Registrar of Calcutta. Although he is in the best of health and physically quite young, he will have to retire very soon according to Governmental Rules. This retirement will mean a very substantial reduction in his income and it will be difficult for him to meet the needs of a large family on the small pension to which he means that he should have one or two extensions of service. He is quite fit and fully qualified for the post.

I shall be very grateful if you will take up the case with the Chief Minister and see that he seeks. It is not possible for me to visit Dacca at the present moment but I hope that some time will be sufficient to induce you to do your best for my nephew, Yusuf Ali.

With deep regards.

I am yours affectionately,

AH Fazlul Haq
(Advocate General, East Bengal)

ফজলুল হক : ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারতের প্রেক্ষাপটে এক নতুন বাংলা গড়ার স্বপ্ন যিনি দেখেছিলেন

অমলেন্দু দে

উনিশশো তের সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত সময়কালে ফজলুল হককে কখনও চোখাই, আবার কখনও উত্তরাই পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। তাঁর মানস গঠনে একই সঙ্গে মুসলিম সত্তা, বাঙালি সত্তা ও ভারতীয় সত্তার প্রভাব থাকার তাঁর চিন্তার ও কর্মে পরস্পরবিরোধী উপাদানের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর রাজনৈতিক জীবনে তার প্রতিফলন ঘটে। সিহিমে পড়া মুসলিম সমাজের উন্নতির কথা তাঁকে ডাবতে হয়। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন সমগ্র বাঙালি জাতির অগ্রগতিব চিন্তার মগ্ন। আর তার সঙ্গে এক ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারত গঠনের স্বপ্নও তাকে সবচেয়ে দানন করতে হয়। মুসলিম লিগ ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, উভয় সংগঠনের তিনি একজন বিপ্লবী নেতা ছিলেন। ১৯২৯ সালে নির্ধারিত কৃষক-প্রজা সমিতি ন্যায় একটি সংগঠন স্থাপন করে তিনি বাংলায় নিজের প্রভাব বিস্তারের জন্যে প্রয়াসী হন। এই সমিতির উদ্দেশ্য ও কর্মসূচীর মধ্যে এখানে উল্লিখিত তিনিই সত্তার প্রকাশ দৃষ্টি করা যায়। কিন্তু ঔপনিবেশিক আয়ালের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশে এই তিনিই সত্তাকে অবলম্বন করে চলতে গিয়ে তিনি তাঁর ডাবনাকে ছাপান করতে গিয়ে ব্যারে ব্যারে বামার সম্মুখীন হন, যদিও তাঁর উদ্দেশ্যকে

কার্যকর করতে তিনি কম প্রয়াস করেন নি।

১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ বহিত হবার পরে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কে ঘটেই তিক্ততা দেখা মিলেও, ফজলুল হকের ভূমিকার এক পরিষ্কার বাঙালি ঘননের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর পিতার সঙ্গে অধিনীকুমার দত্তের গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল। অধিনীকুমার ফজলুল হককে নিজের ছেলের মত ব্বেহ করতেন। আর অধিনীকুমারের সমর্থনলাভ করার ফলে ১৯১৩ সালে ফজলুল হকের পক্ষে ঢাকা বিভাগীয় কেন্দ্রের বর্ণ-হিন্দুদের প্রচারা আয়ে এমন একটি নির্বাচন কেন্দ্রে রায় বাহাদুর কুমার মহেন্দ্রনাথ মিত্রকে পরাজিত করে বেকল লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলের সদস্য হওয়া সম্ভব হয়েছিল। আর তখন থেকেই ফজলুল হকের রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত। জাতি সাম্প্রদায়িক সম্প্রদায় মধ্যেও পূর্ণ বাংলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঘনোভাবও ভঙটা প্রবল ছিল তার পরিচিত ফজলুল হকের নির্বাচনী সাফল্যেই পাওয়া যায়। ফজলুল হক প্রায় বাংলায় সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবোধের মধ্যেও যে ঔবার্যবোধের পরিবেশে জীবনযাপন করেন তা তাঁকে একজন পরিষ্কার মাগের বাঙালি হিসেবে পরিচিতি লাভের সুযোগ দান করে।

নির্বাচিত হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই

তাঁর ডাবনার আরও ব্যাপ্তি ঘটে। তখন তিনি একই সঙ্গে মুসলিম লিগ ও কংগ্রেসের মধ্যে থেকে মেনের সেবা করেন। এই সময়ে তিনি যমেশচন্দ্র দত্তের অর্থনৈতিক চিন্তাধারার দ্বারা গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হন। ভারতের অর্থনৈতিক দুর্বলতার চিত্রটি তাঁর কাছে সুস্পষ্ট হয়। ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের ফলেই যে ডাবত এক বহিষ্ঠ দেশে পরিণত হয়েছে তা তিনি উপলব্ধি করেন। কোন পথে ভারত মুক্তি অর্জন করতে পারে এবং ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে এক নতুন ভারত গঠন করা সম্ভব, এইসব প্রশ্নও তাঁর মনে গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করে। পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতোই এক নতুন ভারতের আবির্ভাব ঘটবে বলে ফজলুল হকের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। দারা বশেন, এই ধরনের সরকার স্থাপিত হলে সংখ্যাগুরু হিন্দুদের প্রাধান্যই স্থাপিত হবে এবং ব্রিটিশ শাসকের কব্জা চলে যেলে মুসলমান ও অনুরক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা কিম্বা হুজুর, তাঁদের সঙ্গে ফজলুল হক একমত হতে পারেননি। তিনি কখনও হিন্দুদের মুসলমানের শত্রু বলে মনে করেননি। তাছাড়া তিনি হিন্দু জমিদার, মহাজন, আইনজীবী প্রভৃতিও যে শোষণ ও গীড়ন করেন সে কথা বলতেও তিনি বিচ্যবোধ করেননি। পূর্ণ দায়িত্বশীল

সবকাল প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলমানদের সার্বিক উন্নতি হবে, এই কথাও তিনি স্পষ্টভাবে বলেন।

ফকরুল হক মনে করেন, নিজেদের প্রয়োজনেই হিন্দু ও মুসলমানকে এক সঙ্গে লেতে হবে। তিনি মুসলমানদের অন্য সম্পর্কিত সবে সম্প্রীতি বন্ধন ব্যবহৃত উপাধী হতেও বলেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে এই কথাও বলেন, যারা ইসলামের নামে গ-মুসলমানদের প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন, তাঁদের আচরণ শুধু নীতিগতভাবে নিন্দনীয় নয়, বাস্তবনৈতিক দিক থেকেও অসহনীয়। তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের পথকে সুগম করতে ঐকাত্মিকতার সঙ্গে চেষ্টা করেন। কংগ্রেস-বেলায়ও মুক্ত আন্দোলন এক নতুন ডাবাধেগের সৃষ্টি করলেও, কামাল আতাতুর্কির সংস্কারের ফলে এই আন্দোলনের ডিক্ অলগা হয়ে যায়। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক ক্রমশ জটিল হয়ে পড়ে। ফকরুল হক কংগ্রেস থেকে দূরে সরে যান। তিনি মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত আন্দোলন সমর্থন করতে পারেননি। তিনি বিদ্যালয় বয়স্ক নীতির বিবোধী ছিলেন। বিদ্যালয় বয়স্ক করলে শিখিয়ে পড়া মুসলমান ছাত্ররা খুবই কতিপয় হবে, এই উদ্বেগও ফকরুল হকের ছিল। উল্লেখ্য এই, সর্বভারতীয় রাজনীতিতে যোগদান করলেও ফকরুল হকের ধর্মী প্রভাবনত বাংলাদেশের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। তিনি লক্ষ করেন, সর্বভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রের প্রণয় করে অবশ্যই নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করেন। তিনি মুসলিম লিগের কর্মসূচিতে সক্রিয় ছিলেন না। এই পরিহিতিতে ফকরুল হক ব্যক্তিগতভাবে সাধারণ মানুষের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

১৯২৯ সালে ধনডাঙ্গি মুন্সিরা এক ভয়াবহ আর্থিক দুর্যাস করলে পড়ে। এই ব্যাভারম্যনা ভয়াবহও আঘাত করে। কৃষি পণ্যের দুল্য দ্রুত হ্রাস পায়। বিভিন্ন ধরনের কল ও জমির খাজনার বোকা

বহির কৃষকদের দুর্বলতা প্রকট হয়। ভয়াবহ সবকাল কৃষি পণ্যের দুল্য হ্রাসের কথা ভেবে ভয়ের ও জমির খাজনার বোকা লামব করতে সক্ষম হয়নি। তারা ভবিষ্যৎবে এই বহনের কোন নির্দেশ দেখনি। কিন্তু তুলনামূলকভাবে শিল্প হ্রাসের দুল্য হ্রাস পায়নি। তার ফলেও কৃষকদের দুর্বলতা বৃদ্ধি পায়। কৃষকদের ব্যাক্য দুর্যাস পূর্বকাল হ্রাসে কল ও জমির খাজনা বিতে এবং ঋণ শোধ করতে বাধ্য করা হল, বহিও তাদের আয় দ্রুত হ্রাস পায়।

এই সময়ের 'নিবিলব কৃষক সমিতি' গঠন করে ফকরুল হক কৃষক প্রজাদের সংগঠিত করে তাদের সমস্যা দূর করতে প্রসার দন। অল্প অল্প করে আগে থেকেই তিনি প্রজা আন্দোলনের সূচনা করেন। ১৯১৫ সালে তিনি বরিশালের মুসলমান ও নন্দপুর কৃষকদের সর্ববন্ধ করতে চেষ্টা করেন। তাদের বিভিন্ন জেলায় তিনি এই আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি সভা-সমিতি করে ও পুস্তিকা প্রকাশ করে জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচার সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করেন। তাঁরই সক্রিয় প্রচেষ্টায় পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রজা আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২৯ সালে তিনি এই আন্দোলনকে আয়ও সুদৃঢ়ত্ব দান করেন। বাংলার আর কোন নেতা বা লল এই সময়কালে এমনভাবে কৃষক ও প্রজাদের সংগঠিত করতে এগিয়ে আসেননি। কল্যাণ, এক উদার অসাম্প্রদায়িক মনোভাব অবলম্বন করে ফকরুল হক কৃষক প্রজা সমিতি গঠন করেন। এই সমিতির কর্মসূচি পর্বতোচ্চা করলেই তাঁর উদ্দেশ্য সহজে বাস্তব করা সম্ভব। এই কর্মসূচি অবলম্বন করে ১৯৩৬ সালে এই সমিতি নির্বাচনী ইচ্ছার দলনা করে সমগ্র বাংলায় প্রচার করা হয়। বর্ষ বর্ষ নির্বিশেষে এক নতুন বাংলা গঠনের আকাঙ্ক্ষা এই ইচ্ছারই ব্যক্ত হয়। ফকরুল হকের প্রতিশ্রুতি মুসলিম লিগ দ্বিতীয় স্তরে হয়। দ্বিতীয় দায়করাও উদ্বিগ্ন হন। কিন্তু পশ্চিমা ফকরুল হককে পরাজিত করতে চেষ্টা

সমর্থন পত্তি নিজেই করেন। কিন্তু ফকরুল হক গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষকে, বিশেষ করে কৃষক শ্রেণী ও বহির জনসাধারণকে, এক নতুন ডাবাধার উদ্বীণ করতে সক্ষম হন। এই নির্বাচনে ফকরুল হক চিরযুগী দুর্যাসনত বিনোদনের গাধির প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মুসলিম লিগকে বাংলার মুসলিম সমাজের বৃহত্তর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁর নির্বাচনী পর্বের বিচ্ছিন্ন পথ প্রস্তাব করেন। দ্বিতীয় জেলায় পুস্তিকা দিয়ে তৈরি প্রচারণা মুসলিম লিগ নেতা নজিমুদ্দিনকে পরাজিত করেন। এই নির্বাচনে কংগ্রেসও বাংলার সাক্ষা লাভ করে।

হক-কংগ্রেস ছিলিত যন্ত্রিতা গঠনের পক্ষে অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের কেন্দ্রিত নেতৃত্ব হক-কংগ্রেস কোয়ালিশন যন্ত্রিতা গঠনে সক্ষম না হওয়ায় ফকরুল হককে বাধ্য করা হয় মুসলিম লিগের সঙ্গে যন্ত্রিতা গঠন করতে। তার ফলে বাংলার মুসলিম লিগের প্রভাব দ্রুতবর্ধিত বৃদ্ধি পায়। কংগ্রেসের কেন্দ্রিত নেতৃত্ব অবিশ্বাস্যভাবে ও কৃষকদের অজব বাংলার জিলাহ-পশ্চিম প্রজাব বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়। তখন থেকেই বাংলার সাম্প্রদায়িকতাবাদীর প্রভাব হ্রাস ও পছদে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। মুসলিম লিগের পক্ষে ফকরুল হককে মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করা সহজ হয়। ১৯৩৭ সালে হক-লিগ যন্ত্রিতা গঠনের সময় থেকেই খুবই দ্রুত মুসলিম লিগ বাংলায় এতটা শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, ফকরুল হকের পক্ষে তাঁর নিজের কলকে ভাঙি রাখাও কঠিন হয়। এই পরিহিতির জন্য কংগ্রেস নেতৃত্বের গাধির যে খেচর রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাংলার মুসলিম রাজনীতির দ্বিতীয় প্রকৃতি সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের কোনও দৃষ্টি ব্যাঘাণ ছিল না। ১৯১৫ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত ফকরুল হক গ্রাম বাংলার কি কর্মসূচি নিয়ে প্রচার অভিযান চালান সে সম্বন্ধে

কোনও পর্যালোচনাই কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব করার প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপিত করেননি। ফকরুল হক প্রচলিত নিবাহী ইত্তাহার পর্যালোচনা করে বাংলায় কংগ্রেস নেতৃত্বাও ফকরুল হককে প্রধানমন্ত্রী করে মন্ত্রিসভা গঠনের পক্ষে কোনও জোড়ালো বক্তব্য কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে রাখতে সক্ষম হননি।

১৯০৭ সাল থেকে ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত মুসলিম লিগ রাজনীতির মধ্যে থাকতেও ফকরুল হকের পক্ষে তাঁর বিরোধী জিয়ারতুল্লাহের প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে জিয়ারতুল্লাহ ও কার্ণে আমূল পরিবর্তন ঘটে। এত সময়ে 'সাম্প্রদায়িক ঐক্যের' প্রতীক হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯০৭ সাল থেকে এবং মুসলিম লিগকে সাম্প্রদায়িক পক্ষিম্পন গড়ে তোলেন। ১৯০৭ সালের নিবাহনে কংগ্রেস পক্ষিম্পনী রাজনৈতিক দলরূপে অবিচ্ছিন্ন হয়। সমগ্র মুসলিম জাতির মাত্র ৪.৬ শতাংশ ভোট মুসলিম লিগ পায়। কংগ্রেস নেতৃত্ব প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় অ-কংগ্রেস মুসলমান সদস্য অর্থাৎ মুসলিম লিগের মুসলমান সদস্য রাখতে সক্ষম হননি। মাদ্রাস, বোম্বে, সেন্ট্রাল প্রভিন্স বিহার, ওড়িশা ও ইন্ডিয়াটে প্রভিন্স-এ কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। বিহার, ওড়িশা ও সেন্ট্রাল প্রভিন্স আইনসভায় মুসলিম লিগের কোন সদস্য ছিলেন না। অন্যান্য কংগ্রেস সাংসদগণিত প্রদেশের আইনসভায় মুসলিম লিগ সদস্য ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস তাঁদের মন্ত্রিসভায় নেয়নি। কিছুদিন পরে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় গঠিত হয়। কংগ্রেস গঠিত মন্ত্রিসভায় আইনসভায় মুসলিম লিগ সদস্যরা স্থান না পাওয়ায় কংগ্রেসের সঙ্গে লিগের বিরোধ তীব্র হয় এবং এই বিরোধের ফলে জিয়ারতুল্লাহ পক্ষে মুসলমানদের মধ্যে লিগের প্রভাব বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। ১৯০৭ সালের নিবাহনের পর কংগ্রেস মুসলিম জনসাধারণের সঙ্গে



ফকরুল হক সেরি ট্রেনের কামের ভ্রমণে তিনি মুসলিম লিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করে

সাংযোগের কর্মসূচি গ্রহণ করে। কিন্তু কংগ্রেসের এই জনসাংযোগের কর্মসূচি সফল হয়নি। অন্যদিকে এই কর্মসূচি কংগ্রেসের সঙ্গে লিগের বিরোধকে আরও প্রসারিত করে। জিয়ারতুল্লাহ এই অভিযোগও করেন, কংগ্রেস মুসলমানদের মধ্যে ছোট ছোট দল উপস্থাপন করে মুসলিম সম্প্রদায়কে বিভক্ত করার চেষ্টা করছে। জিয়ারতুল্লাহ লিগের পক্ষি বৃদ্ধি জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করে তা কার্যকর করতে অগ্রসর হন। জনসাংযোগের মাধ্যমে তিনি মুসলমানদের মধ্যে লিগের প্রভাব বৃদ্ধি করেন। কংগ্রেস হল হিন্দুদের সংগঠন। এই বক্তব্যের সমর্থনে জিয়ারতুল্লাহ বন্দোবস্তের সনদ, দ্বিধা পতাকা, শিকার ক্ষেত্র বিদ্যাক্ষিপণ পরিকল্পনা এবং হিন্দী-উর্দু বিভক্ত বৃত্তান্ত হিসেবে উল্লেখ করেন। সহজেই মুসলমান জনসাধারণকে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে জিয়ারতুল্লাহ সুপারিশকৃতভাবে এই বিষয়গুলো তুলে ধরেন। একই সঙ্গে জিয়ারতুল্লাহ মুসলিম দলগুলোকে লিগের পতাকায় ভুলে সমাবেশ করার কর্মসূচিও গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, জিয়ারতুল্লাহ প্রভাবে পঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী স্যার সিকন্দর হায়াৎ খান, বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফকরুল হক এবং অসমের প্রধানমন্ত্রী স্যার মুহম্মদ সামুদ্রাও তাঁদের সমর্থক মুসলমানদের মুসলিম লিগে যোগদান করতে নির্দেশ দেন। জিয়ারতুল্লাহ

নেতৃত্ব মুসলিম লিগের পক্ষ থেকে বিভিন্ন প্রদেশে ইসলাম বিপ্লব এই শ্লোগান উচ্চারিত হয়; ব্রিটিশ রাজ-এর চেয়ে 'কংগ্রেস রাজ' আরও খাপসা এই কথাও সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করা হল। ১৯০৮ সালের মধ্যেই জিয়ারতুল্লাহ তাঁর কর্মত্যা সংহত করতে সক্ষম হন। তিনি এই দাবিও করেন, ভারতের সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক সংগঠন হল মুসলিম লিগ এবং কংগ্রেস কেবলমাত্র হিন্দুদের পক্ষ থেকে কথা বলতে পারে। মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু জিয়ারতুল্লাহ সঙ্গে সীমাসংঘ আসার চেষ্টা করলে জিয়ারতুল্লাহ তাঁর এই দাবি ভাঙবে যেনে নিতে বলেন। কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষে জিয়ারতুল্লাহ এই দাবি যেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। বাম্প্রদেশপ্রসারের ডায়ায় এই প্রত্যাবর্তন যেনে নিলে তা হল কংগ্রেসের অতীতকে অগ্রাহ্য করা, কংগ্রেসের ইতিহাসকে বিকৃত করা এবং কংগ্রেসের ডাবিয়ারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা। ভারতের সমগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ভারতের ঐক্যের ভিত্তির উপর স্থাপিত। কংগ্রেস নেতাদের পক্ষে তা অগ্রাহ্য করা কখনই সম্ভব ছিল না।

১৯০৭ সালের নিবাহনের পরে পঞ্জাব, বেঙ্গল, অসম ও সিন্ধু প্রদেশে অ-কংগ্রেস

সরকার গঠিত হয়। ১৯৩৮ সালে অসমে কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনে সক্ষম হয়। পঞ্জাব, বেঙ্গল ও সিন্ধু প্রদেশে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে মুসলিম লিগের প্রভাব ছিল না। পঞ্জাবে শাখা সিন্ধুয় হাজাং খান-এর নেতৃত্বে এবং সিন্ধু প্রদেশে খান বাহাদুর আল্লাহ বক্স-এর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। পঞ্জাবে ন্যাশনাল ইউনিয়নিস্ট পার্টি সিখ, হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের আর্থিক স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। সারা সিন্ধুয় শাখাং খানের নেতৃত্বে এই পার্টি পঞ্জাবের আইনসভা ১৭৫ আসনের মধ্যে ১৬টি আসন দখল করে মন্ত্রিসভা গঠন করে। ১৯৪২ সালে তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তিনি ছিলেন সমস্ত সম্প্রদায়ের মন্ত্রিসভার প্রধান। তাঁর পরে শাখা বিজয় হাজাং খান ডিওয়ানা ইউনিয়নিস্ট মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব দেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ জলাফালীন পঞ্জাব সরকারের স্থায়িত্ব ও আনুগত্যের প্রতি তীক্ষ্ণতর সরকার বুঝে গুরুত্ব আরোপ করেন। ভারত ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধীনে ও বেশি সৈনিক পঞ্জাব থেকেই সংগৃহীত। আল্লাহ বক্স-এর মন্ত্রিসভা কংগ্রেস সমর্থনের উপর নির্ভরশীল ছিল।

১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাস থেকেই জিন্নাহ পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে মুসলিম লিগের প্রভাব বিস্তারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কিন্তু তখনও তাঁর পক্ষে এই দুটো প্রদেশে লিগের প্রাধান্য স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। এই অবস্থায় মুসলমানদের মধ্যে কংগ্রেস বিদ্রোহী মনোভাব জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে ‘পীরপুর রিশোন্ট’ নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা মুসলিম লিগের পক্ষ থেকে প্রকাশ করা হয়। ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে পীরপুরের হাজা এই রিশোন্টটি রচনা করেন।

কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে মুসলমানদের প্রতি অবিচার ও ভীষণ উপর পীড়ন করা হচ্ছে এই ধরনের অভিযোগ করে এক দীর্ঘ তালিকা এই রিশোন্টে উল্লেখ করা হয়। ‘বিদ্রোহের দ্বিধা’ নামে যে শিখা বিহরক

পরিচালনা কংগ্রেস স্ট্রোক প্রতিলেপ-এ প্রবর্তন করে তা ইসলাম-বিদ্বেষী বলে এই রিশোন্টে অভিযোগ করা হয়। এই দ্বিধা মুসলমানদের জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপনের জবাবা উর্দুভাষী শিক্ষকদের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা দেই। এই অভিযোগও করা হয়, মুসলমান ছাত্রদের হাত ছোঁতে হবে ‘হন্দেমাতরম’ সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করতে এবং মহাশা পাখীর ছবির সামনে প্রজ্ঞা প্রদর্শন করতে বাধ্য করা হচ্ছে। উল্লেখ্য এই, মুসলিম লিগ ‘হন্দেমাতরম’ সঙ্গীতকে



তিনি তখনও হিন্দুদের

মুসলমানের শত্রু বলে মনে

করেননি। তাছাড়া তিনি হিন্দু

জমিদার, মহাজন,

আইনজীবী প্রভৃতিও যে

শোষণ ও পীড়ন করেন সে

কথা বলতেও তিনি

বিধাবোধ করেননি।



ইসলাম বিদ্রোহী বলে চিহ্নিত করে।

কংগ্রেস শাসিত প্রদেশে মুসলমানদের প্রতি অন্যায্য অবিচারের তালিকা অভিভাব্ধিত করে সাজান হয় এমন সমালোচনাও কোন কোন বইল থেকে করা হয়। ১৯৩৭-১৯৩৯ সালে কংগ্রেস সরকারদ্বারা হিন্দু বৃদ্ধিকোণ থেকে সামাজিক ও শিক্ষা বিহরক সমস্যার দিকে তাকার এমন অভিযোগও পাওয়া যায়। মুসলিম লিগ এই বিষয়গুলো অবলম্বন করেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চালায়। ‘পীরপুর রিশোন্ট’ প্রচারে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে জিন্নাহ প্রকাশোই বলেন, ‘কংগ্রেস ক্যাসিয়ার’ নামের আঘাত লেগে সাম্প্রদায়িক শান্তির সমস্ত আশাই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে’। তার কিত্তিরি পরেই ‘পীরপুর রিশোন্ট’ প্রকাশিত

হয়। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে বিহারেও মুসলিম লিগ ‘বিহারেও মুসলমানদের কিছু অভিযোগ’ এই শিরোনামে ‘লবিফ রিশোন্ট’ প্রকাশ করে। ১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ‘কংগ্রেস শাসনে মুসলমানদের দুর্বস্থা’ এই শিরোনামে ফকরুল হকও একটি রিশোন্ট প্রকাশ করেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এইসব অভিযোগের তীব্র নিন্দা করা হয়। কংগ্রেসের সমর্থক দৈনিক কাগজেও তার সমালোচনা করা হয়। কিন্তু মুসলিম সম্পর্কের দ্রুত অবনতি ঘটায় দ্বিজাতিতত্ত্বের ও পাকিস্তান আন্দোলনের প্রদায় ঘটে।

হত-লিগ মন্ত্রিসভার আমলে ফকরুল হক লিগ রাজনীতির প্রবর্তা হওয়ায় তাঁর নিজের বড়ো দলটি দুর্বল হয়ে পড়ে। এইভাবে তিনিই বাংলায় নিজের প্রভাব অটুট রাখতে চেষ্টা করেন। জিন্নাহকে অপছন্দ করেও তাঁর পক্ষে তখন জিন্নাহ বিদ্রোহিতা করা সম্ভব ছিল না। অন্য দিকে ফকরুল হককে সঙ্গে বেবেই জিন্নাহপন্থীরা বাংলায় তাঁরই ক্ষমতা সুদূর প্রাচীর করেন। তাই তখনও তাঁরই কাছে ফকরুল হকের প্রয়োজনীয়তা তৃপ্তিই দাতারি। এই কারণেই ১৯৪০ সালের ২০ মার্চ মুসলিম লিগের প্রকাশ্য অধিবেশনের সভাপতি জিন্নাহ ফকরুল হককে দিয়ে ‘লাহোর প্রস্তাব’ উপস্থাপন করেন। ২৪ মার্চ এই প্রস্তাব গৃহীত হল, যা ‘পাকিস্তান প্রস্তাব’ নামে খ্যাত। জিন্নাহ তাঁর ভাষণে গুজরাহ সঙ্গে বলেন, হিন্দু ও মুসলমান দুটো পৃথক জাতি। উভয়েই বর্ধিত দর্শন, সামাজিক ইতিহাসিতি, সাহিত্য, জীবন সম্বন্ধে বৃদ্ধিভি এবং জীবনধারা সম্পূর্ণ আলাদা। এই দুটো জাতি একটি বাইরে বসবাস করলে, যেখানে একটি জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং আর একটি জাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে সবসময়ে অসুখোষ ও বিতর্ক হওয়া থাকবে। এই কারণেই মুসলিম জাতির জন্য একটি পৃথক বাইরে একান্ত প্রয়োজন।

হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর বেড়ায়ে মধ্যযুগের সময়কাল থেকে বাংলায় জীবনবাসন করে; আর আউল, বাউল,

ক্রিষ্টিয়, খ্রীষ্টন ইত্যাদি লোকসংকৃতির
থাকা যেভাবে প্রাচ্যের সামান্য মানুষের
ঘরে ঔপার্জিকের পরিবেশ সৃষ্টি করে,
তাতে ধর্মতত্ত্ব এবং পারম্পরিক
সমন্বীলতার একটি পরিচয়ও আঁট
থাকে। অন্যদিকে দ্বন্দ্ব ও হিন্দু সমাজের
ইংবেদী নিষিদ্ধ উল্লেখ্যের বিশিষ্ট
ব্যক্তিত্বও যে ধর্ম সমাজ সংস্কার
আন্দোলনের পরিচালনা করেন তার ফলেও
সমসাময়িক উন্নয়নমূলক ওষাধার ব্যাপ্তি
হটে। চক্ৰবর্তী, হুজুর মানস এই
পরিবেশই বিকশিত হয়। স্বতন্ত্রতাই
কিন্তুই গুণিতিকের সঙ্গে তাঁর ভাবনার
ঘনত্ব পার্থক্য ছিল। তা সত্ত্বেও রাজনীতির
প্রাচ্যের চক্ৰবর্তী হুজুর যেভাবে নিজের
অভিভাব বজায় রাখার জন্য মুসলিম লিগের
সঙ্গে কোয়ালিশন প্রতিষ্ঠা করেন করে
সম্মত হয়, তাতে অসাম্প্রদায়িক চক্ৰবর্তী
হুজুর সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রবল
হিসেবে পরিচিত হয়। কিন্তু তাঁর মত উয়ার
প্রচারক মানুষের জন্য এই অর্থনৈতিক
অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করে
বেশিদিন চেষ্টা সফল হয়নি। বাংলার
কৃষকদের কথা তিনি কখনই ভুলে যাননি।
বাই তাদের সমর্থনের সাহায্যে গ্রাম
বাংলার নিজের প্রভাব পুনরুদ্ধার করতে
চক্ৰবর্তী হুজুর অগ্রসর হন।

উল্লেখ্য, ১৯০৬ সাল থেকে সংগঠিত
কৃষক আন্দোলনের সূচনা হয়। তার
ফলে ভূমি সংস্কারের সাময়িক ও
রাজনীতিক উৎসর্গ সম্বন্ধে প্রমাণকালে
চক্ৰবর্তী সম্মততা দেখা দেয়। স্বাধীন
প্রাথমিক কৃষক সভার নেতৃত্বের বিভিন্ন
ফোরাম কৃষকরা সংগঠিত হয়। ১৯০৭
সালের নির্বাচনে কৃষকসভা সাধারণত
কংগ্রেস ও কৃষক প্রজা সমিতির প্রার্থীদের
সমর্থন করে। ত্রিশুভা ও নোয়াখালী জেলার
কৃষকসভা নিজ প্রার্থীও পূর্ত করার।
কৃষকসভা মুসলিম লিগ প্রার্থীদের সমর্থন
করেনি। বাংলার কংগ্রেস নেতারা এই
বিষয়ের গুরুত্ব ও উপলব্ধি করতে
পারেননি। কৃষকসভাও যে নির্বাচনী
কর্মসূচি অনুসরণ করে তাতে কংগ্রেসও
কৃষক-প্রজা সমিতির একসঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

পঠনের অনুকূল পরিবেশিত তৈরি হয়।
এখানে আরোই উল্লেখ করা হয়েছিল
কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এই পরিবেশের
সুযোগ গ্রহণ না করে বাংলার সাম্প্রদায়িক
লক্ষ্যের বৃদ্ধির সহায়ক হয়।

বাংলার মুসলিম সমাজের ছিল
সংখ্যাগুরু। হিন্দু সমাজের তুলনায়
মুসলমান কৃষকদের সংখ্যা ছিল বেশি।
স্বতন্ত্রতাই মুসলমান কৃষক ও বাউকেন
সংখ্যাই ছিল বেশি। অন্যদিকে মুসলিম
সমাজের জমিদার মহাজনদের তুলনায়
হিন্দু জমিদার-মহাজনদের সংখ্যাও বেশি
ছিল। হিন্দু সমাজের কৃষকদের মধ্যে
তদন্বীতি হিন্দু। কৃষকদের সংখ্যাই ছিল
বেশি, বর্ষ হিন্দু কৃষকদের সংখ্যা খুবই কম
ছিল। বর্ষ হিন্দু জমিদার-মহাজনদের
সংখ্যাই ছিল বেশি। বাংলার এই
আর্থ-সামাজিক পরিবেশে কৃষকদের শ্রেণী
স্বার্থের সমস্যাকে হিন্দু-মুসলিম
সাম্প্রদায়িক বিবাদের রূপ বেঁধেই সহজ
হয়। শ্রেণী বিবাদের সাম্প্রদায়িক বিবাদের
ফলে প্রচার করা সম্ভব হয়। তাতে স্বার্থবান
গোষ্ঠী ও কোন কোন সংবাদপত্রের তুমিফা
লভ করা যায়। হুজুর-লিগ প্রতিষ্ঠা পঠনের
পরে মুসলিম লিগ এই শ্রেণী বিরোধকে
হিন্দু জমিদার-মহাজন এবং কংগ্রেসের
বিরুদ্ধে প্রচার ও আন্দোলনে ব্যবহার
করে। একই সঙ্গে হিন্দু
জমিদার-মহাজনদের দ্বারা শোষিত ও বর্ষ
ভেদ প্রচার, পীড়িত তদন্বীতি হিন্দুদের প্রতি
সমন্বিত্বিত প্রদর্শন করে মুসলিম লিগ
নেতৃত্বক মুসলিম-তদন্বীতি হিন্দু ঐক্যের
আবেদন জানান। এইভাবে বর্ষ হিন্দু
জমিদার-মহাজন ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে
মুসলিম লিগ আন্দোলন পরিচালনা করে।
কলা বাড়লো, বাংলার কংগ্রেসের নেতৃত্ব
উল্লেখ্য হিন্দুদেরই প্রাধান্য ছিল। তাঁরা
বাংলার কৃষক শ্রেণীর সমস্যার গুরুত্ব
উপলব্ধি করতে পারেননি।

১৯০৬ সালে নির্বাচনী ইচ্ছাযবে
চক্ৰবর্তী হুজুর মুসলিম লিগের উদ্ভাব
করার উদ্দেশ্যে রতগুণো প্রতিদ্বন্দ্বিতা
নির্দেশিলেন। ১৯০৮ সালে তিনি প্রজাবর্ষ
আইনের সংশোধন করে স্বাভাবিক

অনেকটা সুবিধা করে দেন। অবশ্য এই
সংশোধিত আইনের দ্বারা শ্রেণ্যবর্ষ,
ভাণ্ডারী ও উদ্বোধনী প্রজাবর্ষের কোন সুবিধা
হয়নি। তা সত্ত্বেও এই আইনের ফলে
দলনী বৃদ্ধির দায়িত্ব ও কোর্স প্রজাবর্ষ
সকলেই খুবই উপকৃত হয়। মুসলিম লিগ
পায়। বাবানা বৃদ্ধি গণিত বাবা হয়।
বাজনার দায়িত্ব স্বাভাবিক সম্পত্তি নিলামে
বিক্রি করার ও প্রেরণ করার ব্যবস্থা বহিত
হয়। আবেদন বা বাউকেন প্রণ
করাকে কৌতুক্যবী অপব্যব বলা হল।
আরও কিছু সুবিধা ১৯০৮ সালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা
ভূমি ব্যবহার সংস্কারের সূচনা দিলে
কিন্তু সার ট্রান্সি ট্রান্সিভে চেয়ারম্যান
করে একটি ভূমি সারের কমিশন নিয়োগ
করে। ট্রান্সিভে কমিশন পঠনের পরই
কৃষকসভা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারি
প্রচার বিরুদ্ধে প্রমাণকালে প্রচার অভিযান
চালায়। কৃষকসভা ট্রান্সিভে কমিশনের কাছে
একটি মেমোরান্ডামও দেয়। কৃষকসভা
ভূমি ব্যবহার আন্দোলন পরিচালনা করে জমিতে
কৃষকের অধিকার সুরক্ষিত করে,
বর্ষ-কর্ষ নির্দেশের কৃষক শ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ
করে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রাধান্যের
বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামকে নতুনালী
করতে প্ররোচিত হয়। এই ভাবেই কৃষকসভা
বাঙালি সমাজকে সাম্প্রদায়িক বিবাদের
বোঝে দখল করতে চেষ্টা করে। কিন্তু
বাংলার জমিদাররা ভূমি ব্যবহার বুল
কর্তব্যে বজায় রাখার জন্য বহুশক্তির
হিলেন। তাঁরা ট্রান্সিভে কমিশনের কাছে যে
বক্তব্য রাখেন তাতে বলা হল, বর্ষ
ক্রিয়াকর্মী বন্দোবস্ত বিলোপ করে মহাবিভ
শ্রেণীর অভিভাব দিয়ার করা হয়, তাহলে
বাংলার এক সামাজিক অভ্যুত্থান হবে,
যার ফলে কমিউনিস্টদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত
হবে। বাংলার কংগ্রেস সংগঠনে
জমিদারদের প্রভাব ছিল। তাঁরা কৃষকদের
দায়িত্ব কখনো কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূচি
করে। বাংলার কংগ্রেস নেতৃত্ব ভূমি ব্যবহার
পরিচালনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে
ভূমি সংস্কারের কোন কর্মসূচি গ্রহণ করে
স্বাভাবিক উল্লেখ্য করতে সক্ষম হয়নি।

কক্সবন্দী হক তুহি সংস্কারের ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেও মুসলিম লিগের রাজনৈতিক কর্মসূচিকে কার্যকর করতে গিয়ে বাংলায় মুসলিম প্রচারিত ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদকেই পতিলাধারী করতে সহায়তা করেন। তার ফলে নিজেদের ও নিজের দলকে বাঙালি মুসলমানদের কাছ থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। ১৯৪০ সালের মধ্যে বাংলায় মুসলিম লিগের প্রভাব বৃদ্ধি পায় এবং মুসলিম লিগ মুসলমান জনসাধারণের দলে পরিণত হয়। আরেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলায় লিগ সংগঠনে

জিহাদমুহিবদের প্রাধান্য ছিল। অযাওয়ালি লিগ নেতৃত্ব কক্সবন্দী হকের বিরোধী ছিলেন, আর তাঁরাই ছিলেন লিগের মূল পরিচালক। বাংলায় লিগপন্থী মুসলমান বুদ্ধিভীরবীরা পাকিস্তান প্রস্তাবকে সংকুচিত ক্ষেত্রে প্ররোধ করে 'হিন্দু সংকুচিত' ও 'মুসলিম সংকুচিত' যে পৃথক সে কচা সাধারণ মুসলমানদের মতো প্রচার করেন। এইসম প্রচারে কক্সবন্দী হক বিপর্যয় ঘোষণা করেন। সাম্প্রদায়িক মনোভাব থেকে বাঙালি সংকুচিত এই ব্যাখ্যা তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণের পর তিনি কবিগুরু প্রতি বড়ীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে যে তাষণ বেনে ডাঙেই বাঙালি সংকুচিত সম্বন্ধে তাঁর ভাবনায় প্রকাশ ঘটে। পাকিস্তান প্রস্তাবের অব্যবহৃতও তাঁর কাছে শূন্য হয়।

১৯৪১ সালের জুলাই মাস থেকে হক-জিহাদ বিরোধের সূত্রপাত হয়। জিহাদকে 'শৈরাজ্যিক আচরণের' বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ করেন। একটি সম্মেলন সিদ্ধ প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী আলাহ বকর ও জিহাদের নেতৃত্ব অবীকার করেন। জিহাদের নির্দেশে বাংলায় মুসলিম লিগের ডোয়ারা কক্সবন্দী হকের নেতৃত্বে পরিচালিত মন্ত্রিসভার পতন ঘটতে চেষ্টা করেন। তাঁকে বিতাড়িত করে লিগ সদস্যরা মন্ত্রিসভা গঠনে উৎসাহী হন। হক তা বুঝতে পেরে তাঁদের বকবৃত্তি ব্যর্থ করার ব্যবস্থা করেন। ১৯৪১ সালের ২৭ নভেম্বর জে সি হাওয়ার ব্যক্তিগত একটি বৈঠকে পরৱর্তক বসু, কক্সবন্দী হক, জ

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, শরফুদ্দিন আহমেদ, খান বাহাদুর হাসেনে জাকিলখান, বেহেস্ত নব্বত প্রমুখ নেতৃসভা মিলিত হয়ে কর্মপন্থা নির্ধারণ করেন। পরৱর্তক বসু একটি মসিলা বসান করে মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যবস্থা করেন। এই মসিলা ডিভি কনবই প্রোগ্রেসিভ ফোয়াসিলন পার্টি গঠন করা হয় এবং কক্সবন্দী হককে এই পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ২৮ নভেম্বর হক-লিগ মন্ত্রিসভার শেষ বৈঠক বাসে। হক লিগ সদস্যদের মনোভাব বুঝতে পারেন।



হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর ঘেঁড়ায়ে মধ্যযুগের সময়কাল থেকে বাংলায় জীবনযাপন করে; আর আউল, বাউল, জিকির, কীর্তন ইত্যাদি লোকসংস্কৃতির ধারা ঘেঁড়ায়ে গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে ঐক্যবোধের পরিবেশ সৃষ্টি করে.....



১ ডিসেম্বর লিগ সদস্যরা পত্রপ্রাণ করার কক্সবন্দী হক পরিচালিত মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। ৩ ডিসেম্বর তিনি প্রোগ্রেসিভ ফোয়াসিলন পার্টির নেতৃত্ব গণ গ্রহণ করে কৃষক প্রজা পার্টি, কংগ্রেসের একাংশ ও হিন্দু মহাসভার সক্রিয় সহযোগিতায় পুনরায় মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১০ ডিসেম্বর হককে মুসলিম লিগ থেকে বহিষ্কার করা হয়। ১২ ডিসেম্বর কক্সবন্দী হক-শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি মন্ত্রিসভা মন্ত্রিকৃত্যের গ্রহণ করে। লিগপন্থীরা তাঁদের প্রধান দ্রষ্টা হককে ডিহিত করেন। মন্ত্রিসভার গারিহ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে কক্সবন্দী হক হিন্দু মুসলিম ঐক্য সূচক করতে কয়েকটি কর্মপন্থা গ্রহণ করেন এবং

বিভাজিত তত্ত্বের বিরোধিতা করে একটি ডাঙব্রীজ জাতীয়বোধ বিকশিত করতে চেষ্টা করেন। ইসলামের মূল নীতি অবলম্বন করেই তিনি সাম্প্রদায়িক বিরোধে ধুর ধরতে উদ্যোগী হন। ১৯৪২ সালের ২০ জুন কলকাতার টাউন হলে তিনি 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্মেলন' করেন। তাঁর আয়োজিত সভায় কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, কৃষক প্রজা পরিষদ, লিবারেল ফেডারেশন ও প্রোগ্রেসিভ মুসলিম লিগ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। এইভাবে তিনি মুসলিম লিগকে বাংলার জনসাধারণের কাছ থেকে, বিশেষ করে মুসলিম জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেন। মুসলিম লিগ নেতৃসভা তীব্র ভাষায় এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের সমালোচনা করেন। জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি মোলানা আবুল কালাম আজাদ এই সম্মেলনের সাক্ষাৎ করেন। একটি বার্তা পাঠান।

এই সম্মেলনের পরেও বিভাজিত তত্ত্বের সমালোচনা করে কক্সবন্দী হক জাষণ দেন। তিনি কৃষকদের হার্বিক অগ্রহিকার নিয়ে ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ ও ঐক্যবদ্ধ ভারতের ভাবনা প্রচার করেন। তিনি প্রকাশ্যে জিহাদ, মুসলিম লিগ ও পাকিস্তানের বিরোধিতায় অকণীর্ণ হন। জিহাদের নীতি পন্যন্ত করার উদ্দেশ্যে কক্সবন্দী হক অবিলম্বে ডাঙব্রীজের হাড়ে বাবীনতা অংশের গারিও উপাধন করেন। কক্সবন্দী হক, জা: খান সাদেব ও আলাহ বকর একসঙ্গে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে অবিলম্বে ডাঙব্রীজের হাড়ে কচতা অংশের গারি করেন। ১৯৪২ সাল থেকে জিহাদ বদন বিভাজিত তত্ত্বকে অবলম্বন করে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের গারিকে জোয়ারো করে তোলে, তখন কক্সবন্দী হক সর্বভারতীয় ঐক্যের প্রতিকেই হিন্দু-মুসলিম বিরোধের সমস্যা ঘিমাংসার কথা ভাবেন। এই গবেষী বাংলায় মুসলমানদের অগ্রগতি সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। কক্সবন্দী হকের এই তুহিল জিহাদকে মুক্তিভারত করে তোলে। ব্রিটিশ সরকারও কক্সবন্দী হকের

হতিমতি দেখে উদ্বিগ্ন হয়। বুকের প্রয়োজনে তলগায়ে গরিব না পালন করাও জনা ভারত সরকার বাংলা ও সিন্ধু মন্ত্রিসভার উপর তদারকি হয়। ভারত সরকার সিন্ধু দুখায়েী আত্মা বন্ধকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করে, বাংলায় দুখায়েী কলসুল হককে পশুত্যাগ করাও চিত্রা করে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নরহত লোক করে এবং দুসলিম লিগের তীব্র কংগ্রেস বিরোধিতার সঙ্ঘবীন হয়ে, মধ্যস্থতা পাঠী এই সিদ্ধান্তে এসেন যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সমাপ্তি ঘটলেই হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধান সম্ভব হবে। জিন্নাহ স্পষ্টভাবেই বলেন, ভারতে 'হিন্দু শাসক প্রতিষ্ঠার' জন্যই কংগ্রেস এই কথা বলেছে। জিন্নাহ আরও বলেন, পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবি যেহে নিলেই হিন্দু-মুসলিম সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হবে। তিনি এই কথাও বলেন, 'পাকী স্বাধীনতা কলতে কংগ্রেস রাজ প্রতিষ্ঠাই হবে করেন।'

১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট কংগ্রেস 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গ্রহণ করে। ভারত সরকারের বিরুদ্ধে 'প্রকাশ্য বিরোধ' ধর্মের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই প্রস্তাবকে মনে করে: ১) আগস্ট কর্তৃপক্ষ কংগ্রেস নেতাদের কারাগারে নির্যাস করা হয়। দুখাই স্পষ্ট ডাইলরর লর্ড সিন লিখলো কংগ্রেসের উপর আঘাত হানেন। জিন্নাহ কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়' প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাঁর হতে, এই প্রস্তাবে মুসলিম স্বার্থ রক্ষার কোনই ব্যবস্থা নেই। অন্যভাবে কলসুল হক মহোদয় পাঠী পরিচালিত আন্দোলনের বিরুদ্ধে কোন বিবৃতি নিতে অস্বীকৃত হন। তিনি জিন্নাহর হতে ব্রিটিশ সরকারের হাতিয়ার হতে লক্ষ্য করেনি। কলসুল হকের এই মনোভাবও ব্রিটিশ সরকার ও জিন্নাহকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। তাই ব্রিটিশ শাসকরা কলসুল হককে দুসলিম জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে দুসলিম লিগ নেতাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন। তৎকাল দুসলিম রাজনীতির পরিচালনাও ছিল দুসলিম লিগ রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত। ১৯৩৭ সাল থেকে হক-লিগ

মন্ত্রিসভার সুযোগ গ্রহণ করে বাংলায় প্রায়ে-৫৫০ ও হকসল শহরে দুসলিম লিগ প্রায়ে বিস্তার করে তাহ ডিত আলগা করা সম্ভব ছিল না। কলসুল হক নিজে ১৯৩৭-১৯৪০ সালে যেভাবে দুসলিম লিগ রাজনীতির হস্তবৃত্ত প্রবর্তনা হন তার মাধ্যমেই বাংলায় দুসলিম লিগের গণপ্রতিষ্ঠা এই সময়কালে সূচ্য হয়। হিন্দু মহাসভার নেতা ডঃ শ্যামপ্রসাদ মুখার্জিকে নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করার লিগ নেতাদের শতক সাধারণ দুসলিমদের মধ্যে কলসুল হকের বিরুদ্ধে প্রচারা করাও সম্ভব হয়। স্যার অ্যান্ড্রোয়া মুখোপাধ্যায়ের সহকর্মী কলসুল হকের সঙ্গে শ্যামপ্রসাদ মুখার্জি গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল। তাঁর রাজনৈতিক দলের হলেও তাঁদের মন্ত্রিসভায় একসঙ্গে চলতে অসুবিধা হয়নি।

বাংলায় কংগ্রেসের সক্রিয় সাহায্য না পাওয়ায় কলসুল হক দুসলিম লিগের বিরুদ্ধে নিজের পক্ষি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হননি। আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও তাঁকে নানা অসুবিধার সঙ্ঘবীন হতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে বাংলার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কলসুল হক কৃতকার্য হননি। বাবা-মায়ের মূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়। গ্রাম বাংলার দুর্ভিক্ষের পশুজনিত শোনা যায়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'প্রাঃপ্রসিত দুসলিম লিগ' দুসলিম জনমতকে প্রত্যাখ্যাত করতে কার্য হয়। জাপানি আক্রমণের আশঙ্কায় ব্রিটিশ সরকার নদী-মাড়ক বাংলায় বৌকল স্ফাচল বন্ধ করে খেতাবার বাসাবাহনের সমস্যা জটিল হয়। বাবা হস্তের হাতিবি দেখা দেয় ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কিনিমসপত্রের মূল্য স্পষ্ট বৃদ্ধি পায়। গ্রামের গরিব, জেলে, বিনয়কর ও কারিগর বাবা বৌকর টলর নির্ভরশীল হয়ে ভীতিকা নিবাহ করতে তারা কষ্টবীন হয়ে নিঃশ্ব ও দুঃ হয়ে পড়ে। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ১৯৪০ সালের জানুয়ারি মাসের মধ্যেই বাংলার জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুরবস্থা প্রকট হয়। বাংলার ইংরেজ গভর্নর, বিলিটরি কর্তৃপক্ষ ও আফগানিস্তান মন্ত্রিসভাকে এভাবে এমন কতগুলি নীতি নির্ধারণ করে যায়

কলে মুনাফাখোর ও হস্তবৃত্তার অবাধ লুণ্ঠনের সুযোগ পায়। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময়ে কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের গ্রেপ্তার করার কলে জনসাধারণের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী বিকোত দেখা দেয়। এই আন্দোলন ঘনঘন উদ্দেশ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতা যেভাবে ক্ষুদ্র করা হয় এবং নিশীড়নকূল আইন প্রচোদ করা হয়। তা ব্যক্তিগতভাবে কলসুল হক পছন্দ করেননি। অখ্যাত প্রাঃপ্রসিত সরকারের দাবিতে থেকে এইসব আইন অগ্রাহ্য করেই তিনি সরকারের বিরোধীতার দ্বারে অতিমূল্য হবেন। কলসুল হকের উভয় সন্তানের অবাধ উপলব্ধি করেই লিগ নেতা নাজিমুদ্দিন ১৯৪২ সালের ২০ মার্চ আইনসভায় অভিযোগ করেন, হক মন্ত্রিসভা করণ্যরত ব্রুক ও অন্যান্য দলের বেশপ্রাচুর্যক কাজ ঘনন না করে তাদের প্রতি সন্তানবৃত্তিণীল। এমনকি শরণ্যেস্ত্র বসুর মুক্তিও জন্যও এই মন্ত্রিসভা ভারত সরকারের নিকট আবেদন জানাচ্ছে। এই মন্ত্রিসভা অক্ষমতার ভারত আক্রমণের পশু সূচ্য করে নিজে এবং দুঃ প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করেছে। করণ্যরত ব্রুক প্রঃপ্রসিত কোয়ালিশন পার্টির অন্তর্ভুক্ত একটি দল এবং হক পরিচালিত মন্ত্রিসভার তাদের মন্ত্রীও রয়েছে। নাজিমুদ্দিন এই অভিযোগও করেন যে, 'বেশপ্রাচুর্য' সূতাবস্ত্র বসুর ভারত সরকার বিরোধী ভাষণ অক্ষমতার রেডিও দ্বারকত নির্মিত প্রচারা করা হতোও তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে এই মন্ত্রিসভা কার্য হেছে। কলসুল হক মহোদয় সনে নাজিমুদ্দিনের প্রচারিত কুংসার জ্ঞান ঘেন এবং শরণ্যেস্ত্র বসুর প্রতি অগ্রহা প্রকাশনের জন্য তাঁর সমালোচনা করেন। একই সময়ে কলসুল হক এমনভাবে সূতাবস্ত্রের সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করেন যাতে তাঁর প্রতি অগ্রহা প্রঃপ্রসিত না হয়, আইনের পরিধি লম্বিত না হয়, আর দুসলিম লিগ নেতাদের মুখোন্দ ও বুনে দেওয়া যায়।

এক অবাধ্যতাবিক পরিহিতিস হযো কলসুল হককে দুখায়েী হিসেবে গরিব

পালন করতে হয়। ব্রিটিশ সরকার প্রবর্তিত শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে তাঁর পক্ষে বাংলার গুরুতর সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়নি। বাংলার সমর্থ সাধারণ জন হাবার্ট ইংরেজ অফিসার ও উচ্চপদস্থ ভারতীয় অফিসার তাঁর সঙ্গে অসহযোগিতা শুরু করেন। এই সময়ে ডঃ শ্যামপ্রসাদ মুখার্জি কক্সলু হকের পক্ষে গাঁজন এবং মুসলিম লিগ নেতাদের অভিযোগের উত্তরে বলেন, কক্সলু হক প্রদর্শিত পণ্ডেই বাংলা বা ভারতকে হক করা সম্ভব। লিগ হস্তীরা যেসব দুর্নীতির সঙ্গে লিপ্ত ছিলেন ডঃ মুখার্জি তা উন্মোচিত করেন।

ব্রিটিশ সরকার কক্সলু হককে সরিয়ে দিয়ে মুসলিম লিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করা গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। বিধানসভার অভ্যন্তরে ইউরোপীয়ান সদস্যরা লিগকে সমর্থন করেন। তাঁরা মূলতঃ হক মন্ত্রিসভাকে আক্রমণ করে ও এই মন্ত্রিসভার পদত্যাগ বাধি করেন। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে বেকল সেমিসেমিটিক কন্ট্রোলিং হাউস আসনই মুসলিম লিগ দখল করে। হুগলীয়া পরাজিত হন। হক মন্ত্রিসভা মুসলমানদের সমর্থন হারিয়ে কেনে। ২১ মার্চ এই মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। ২৮ মার্চ রাতে গণধর্ম সাধারণ জন হাবার্ট কক্সলু হককে ডেকে নিয়ে পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য করেন।

১৯৪০ সালের ২৪ এপ্রিল মুসলিম লিগ নেতা স্যার নাজিমুদ্দিন নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। একই দিনে বিল্লিতে একটি সভার আয়োজন করে জিয়াহ পাকিস্তান হাউসে ঘানচিট্র জলসম্মেলন ডুলে করেন। এই সভায় জিয়াহ কক্সলু হককে 'বিশ্বাসঘাতক' বলে তীব্র ভাষার নিশা তর্কন। কক্সলু হক মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের পথ সহজ হয়। এভাবে জিয়াহর ঘনোবাসনাও পূর্ণ হল।

অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কক্সলু হককে সরিয়ে দেওয়া এবং লিগের নেতৃত্ব 'সাম্প্রদায়িক ও প্রতিদ্বন্দ্বিপন' মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা

প্রভৃতি দল কুড় হলেও তারা শেষ পর্যন্ত কক্সলু হকের সঙ্গে মিলিত হয়ে কোন কার্যকরী পদা উত্থাপন করতে পারেননি। তখন থেকে কক্সলু আইনসভার ভেতরে ও বাইরে লিগের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীকণে অবতীর্ণ হন। তিনি বিভিন্ন বক্তৃতায় তীব্র ক্রোড ও বৃণ প্রকাশ করেন। তিনি বিভিন্ন বক্তৃতায় পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং ঐক্যবদ্ধ স্বাধীন ভারত ও বাংলার মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তৎপর হন। কিন্তু মুসলিম লিগের 'ওওয়ানিসী' তাঁকে ও তাঁর

তিনি কৃষকদের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ ও ঐক্যবদ্ধ ভারতের প্রচার করেন। তিনি প্রকাশ্যে জিয়াহ, মুসলিম লিগ ও পাকিস্তানের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন।....

স্বাধীন-স্বতন্ত্রের নানাজায়ে অসমানিত ও নিরুদ্ভীত করতেও তিনি তাঁর ধ্যান-ধারণা থেকে বিচ্যুত হননি। তিনি কি অবস্থায় পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য হন, তা তিনি নিজেই ১৯৪০ সালের ৪ জুলাই বিধানসভায় এক দীর্ঘ ভাষণে ব্যাখ্যা করেন। এই ভাষণটিকে উৎকালীন ঘটনাবলীর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলা যায়।

নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভা গঠিত হ্রণ করার পরেই সাম্প্রদায়িক বিষয়ে ক্রমাগতই বাঙালি জীবনকে দুর্বৃত করে। কক্সলু হক বাঙালির স্বার্থ বিনাশকারী মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বর্ধে ওঠেন। ১৯৪০ সালের জানুয়ারি মাস থেকে বাংলার মুর্ভিকের

সূচনা হলেও নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার সময়কালেই মুর্ভিক এক উদার হ্রণ ধারণ করে। তার সঙ্গে মহম্মারিও বিভিন্ন ছানে হুর্ভিক পড়ে। ১৯৪৪ সালের যে মাস পর্যন্ত এই মুর্ভিকের ব্যাপকতা ও প্রকটতা ছিল। ৩৬ লক্ষ মোক এই মুর্ভিকের কবলে গ্রাণ হওয়ায়। এই বিপর্যয়ের সময়েও মুসলিম লিগ নেতারা পাকিস্তানের গণিতে সোচ্চার ছিলেন।

মুর্ভিকের পরবর্তীকালে মুসলিম লিগের প্রচাণ আরও বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৪ সালের মার্চ মাসে কলকাতা ক্যান্সোনেলের নির্বাচনে অংগগ্রহণ করেন। নন-অফিসিয়াল কংগ্রেস (বসু গ্রুপ) ও হিন্দু মহাসভা একত্রে নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়ে অনেকগুলো আসন লাভ করে। এই নির্বাচনের পর এই দুটো গ্রুপের ঐক্য অটুত থাকেনি। এপ্রিল মাসে মেঘের নির্বাচনে ঘাওরাডি স্বাধসগী আনবীলাস পোদার মুসলিম লিগ ও নন-অফিসিয়াল কংগ্রেস হোটে মেঘের নির্বাচিত হন। মেঘের পনে হিন্দু মহাসভা প্রার্থীকে ইউরোপীয়ান গ্রুপ সমর্থন করা সত্ত্বেও এই প্রার্থী পরাজিত হন। এই নির্বাচনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দুটো আসন লাভ করে।

'ভারত ছাড়' আন্দোলনের সময়ে বন্দী কংগ্রেস নেতারা মুসলিম লিগ পরিত্যক্ত পাকিস্তান আন্দোলনের তীব্রতা লক্ষ করে বুঝি উকির হন। মহাসভা গান্ধী জিয়াহব সঙ্গে আলো-আলোচনা করে হিন্দু মুসলিম সমস্যা সমাধানের প্রার্থী হন। ১৯৪৪ সালের যে মাসে মুক্তি অর্জন করে মহাসভা গান্ধী জিয়াহব সঙ্গে আলোচনা করতে চান। গান্ধী জিয়াহ আলোচনার সূত্র হিসেবে চক্রবর্তী রাজন গোপালাচাট্টী একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তৈরি করেন। জিয়াহ সম্মত হলে গান্ধীজী এই বাস্তবৈতিক চরুলা গ্রহণে প্রস্তুত ছিলেন। ১৯৪৪ সালের ২১-২৭ সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ে জিয়াহর 'মালাবার ছিল' বাড়িতে গান্ধী-জিয়াহ আলোচনা আলোচনা হলে। এই সময়কার তাঁদের প্রাথমিকীতে দুজনের চিন্তার একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। জিয়াহ বিচ্ছিন্নতাবাদ অবলম্বন করে পাকিস্তান গণিতে অনেক

হাকেন। অনানিকে গান্ধীজীর পক্ষে
বিচ্ছাদিত তত্ত্ব মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি।
তিনি তৃতীয় পক্ষ এই যৌক্তিকভাবে
বোম্বের দুই জনকে প্রতি গুরুত্ব আবেশ
করেন। তা না হলে পশ্চিম পাণ্ডিত্যে
বন্দবাস করা সম্ভব হইবে না। গান্ধীজী
গান্ধীজী মর্শ্বনা তবলবন করে পাকিস্তান
প্রত্যাব অস্বাভাবী পাকিস্তানের অঙ্গলে
প্রাণবলবলবনে কোঠের মাধ্যমে সেই অঙ্গল
তমতেই অন্য অঙ্গল থেকে পৃথক হবার
অধিকার যেনে নিতেও সম্মত হন। আর
হাসীনতা অঙ্গলবন পরেই সীমানা নির্ধারণ
বণ্ডেট ও শেখ ভায় হুয়ে হবি লিগের
প্রত্যাব অস্বাভাবী পাকিস্তান অঙ্গলে
বসবাসকারী জনসাধারণ দেনতায় করা
উচিত, রাজ্যজীর এই তর্শ্বনা জিহায়ে হেনে
নিতে প্রসীকৃত হন। তাই গান্ধী-জিহায়ে
আলোচনা গার্হ হয়। তাইসবর লর্ড
ওয়েলস এই অঙ্গলবহা লঙ্ক করে সিদ্ধান্ত
করেন যে, তৃতীয় লক্ষ ব্রিটিশ সরকারই
‘কেলমায়’ ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গলবহা
জাঙ্কতে পারে। তখন থেকে ব্রিটিশ
সরকারের উপর কংগ্রেস ও লিগ
নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

১৯৪০ সালের এপ্রিল মাস থেকে
১৯৪৬ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত কলকাতা
হক একটানা মুসলিম লিগের বিরোধিতা
করেন। এই সময়ে ভারতের রাজনীতিরও
অনেক পরিবর্তন হয়। ১৯৪৬ সালের
নির্বাচনে মুসলিম লিগ বাংলার্দেপ, পঞ্জাব
ও সিন্ধুপ্রদেশে একক বৃহৎ লগে পরিণত
হয়। আর অন্যান্য প্রদেশেও লিগের
কাজটা প্রকৃত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কেন্দ্রীয়
আইনসভার নির্বাচনেও লিগ সাক্ষ্য লাভ
করে। জিহায়ে বন্ধ করে ঘোষণা করেন,
নির্বাচনে কলকাতা প্রদেশ করেছে যে
মুসলিম ভারত পাকিস্তান হাবির লগাকে
এবং লিগই মুসলমানদের একমাত্র
সংগঠন। কংগ্রেস কেলমায় লর্ড হিন্দুদের
প্রতিনিধিত্ব করে। এই নির্বাচনে কলকাতা
হক লিগ প্রতিদ্বন্দ্বিতিক পরিণত করে জয়ী
হয়েও তাঁর পূর্বের প্রত্যাব বন্ধন থাকেনি।

পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে
মুসলিম লিগ বহুপ্রতা বর্জন করতে গার্হ

হয়। কিন্তু লিগ নেতৃত্ব এই দুটো প্রদেশে
তথাকথিত আইন অন্যান্য আশেপাশের
হাবরক্ত অব্যাহততা সৃষ্টি করে। তাবতেব
বিত্তির হানে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বা এই তথ্যবহ
পরিণতিতে সৃষ্টি করে। ১৯৪৬ সালে ১৬
আগস্ট মুসলিম লিগ ‘ডাইবেই আকলন’
ঘোষণা করে কলকাতায় জনসভা করে।
সেমিন্ট অলকাতায় দ্বন্দ্বা যাবে। কলকাতা
হক এই দ্বন্দ্বা প্রতিবোধ করতে ও
প্রতিবেদী হিন্দুদের-বন্ধা করতে চেষ্টা
করেন। কিন্তু লিগের ও সরকারের
সাহায্য না পাওয়ায় তাঁর মন ডেকে যায়।
তিনি বিধানসভার সরকারের ও লিগের
নিষ্কৃতপ্রত্যাব সমালোচনা করেন।
সাম্প্রদায়িক বিষয়ে এখন পরিণতিতে সৃষ্টি
করে যায় কলকাতা কংগ্রেস ও লিগ নেতারা
দেনতায়ের মাধ্যমে সমাধানের পথ খুঁজতে
শুরু করেন। ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে এই
দুই দলের আলোচনাতেও বোকা যায়
ভারত বিভাগ অনিবার্য।

এই সময়ে মুসলিম লিগের দ্বন্দ্বা থেকে
অনেকে কলকাতা হক মুসলিম লিগে
যোগদান করতে অনুবোধ করেন। ১৯৪৬
সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি পুনরায়
লিগের সদস্য হন। কিন্তু লিগে যোগদান
করেও তাঁকে জিহায়েপহীনের বিরুদ্ধে
সংগ্রাম পরিচালনা করতে হয়। তিনি
প্রকাশ্যেই সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার
সমালোচনা করেন। ইতিমধ্যে বিহার ও
বাংলার দ্বন্দ্বা পরিণতিতে জটিল করে
ডোলে। ১৯৪৬ সালে ২০ আগস্ট
ঢাকাতো দ্বন্দ্বা হয়। ১৪ অক্টোবর পূর্ববঙ্গের
নোয়াখালি ও ত্রিশুরা জেলায় এবং ২৪
অক্টোবর বিশ্ণুরে ভরাবহ দ্বন্দ্বা হয়।
কলকাতা হক দ্বন্দ্বায়ে মুসলমানদের
সাহায্যার্থে বিশ্ণুরে যান। ১৯৪৭ সালের
জানুয়ারি মাসে মহান্দা গান্ধী পাণ্ডিত্য
হাবলবন অঙ্গলবহ নোয়াখালি ও ত্রিশুরায়
পদব্রতা শুরু করেন। মহান্দা গান্ধী প্রার্থনা
সভায় সাম্প্রদায়িক বৈরিত্য প্রয়োজনীয়তার
কথা করতে গিয়ে হকরত মহান্দায়ে দ্বন্দ্বা
উদ্ধৃত করেন। তাতে মুসলিম লিগের পক্ষ
থেকে মহান্দা গান্ধীর সমালোচনা করা হয়।
তারা অভিযোগ করে, তিনি ইসলাম বর্নের

অজ্ঞাতরীপ দ্বন্দ্বায়ে হকরকেন কলকাতা
কলকাতা হক এই মহান্দায়ে দ্বন্দ্বা
করেন। মহান্দা গান্ধী বলেন, তিনি
নিজেকে বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত
মনে করেন না। কলকাতা হক গান্ধীজীর
সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তুলে দ্বন্দ্বা দ্বন্দ্বা
তৎপর হন। ২৭ ফেব্রুয়ারি হাইমজরে
গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটে।
তামপরেই তিনি নোয়াখালি-ত্রিশুরায়
মহান্দা গান্ধীর কাজকর্মের প্রশংসা করেন।
এই কথাও তিনি বলেন, সোহরাওয়ার্দী
মন্ত্রিসভার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত
মুসলমানরা কোন সুবিচার আদা করতে
পারেন না। জিহায়েপহীনের সঙ্গে কলকাতা
হক বিরোধের কোন দ্বন্দ্বাংসা হয়নি।
নিজের তুলে হকতে শেরে কলকাতা হক
নোয়াখালি-ত্রিশুরায় মহান্দা গান্ধীর
ভূমিকার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
করতে কোন সঙ্কোচ বোধ করেননি। কিন্তু
জিহায়েপহীনের আচরণে এই ধরনের কোন
পরিবর্তন লঙ্ক করা যায় না।

একটানা সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বা দেনতায়ের
সম্ভাবনাকে বৃদ্ধাধিত করে। তাতে কলকাতা
হক বিচলিত হন। তিনি বিতক্ত তাবতে
কমতায় মহান্দায়ে দ্বন্দ্বাধিতা করেন। তাই
একদমভ ভারত বন্ধায় দ্বন্দ্বায়ে তিনি আরও
কিছুদিন ব্রিটিশ দ্বন্দ্বায়ে টিকিতে রাখার কথা
বলেন। ভারত বিভাগ অনিবার্য হওয়ায়
কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে
বাংলাদেশে বিতক্ত করার দ্বন্দ্বা করা হয়।
মুসলিম লিগের দ্বন্দ্বায়ে দ্বন্দ্বা হওয়ায়
পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত করা। এই সময়ে
সার্বভৌম বাংলাদেশ পঠন করার প্রত্যাব
দেন। কিন্তু কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা
বিতক্ত ভারতে বিতক্ত বাংলা দ্বন্দ্বাধিক
পরিণতি মনে করে বাংলাদেশে জাঙ্ক করে
পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে, আর
পশ্চিমবঙ্গ ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার দ্বন্দ্বা
করে। অনানিকে লিগ দেনা মৌলানা
আকরাম খান ও নাকিমুজিবের সমর্থকরা
পাকিস্তান রাষ্ট্রের বাইরে কোন দ্বন্দ্বাধীন
বাংলা প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা করেন। তাঁরা
সমগ্র বাংলা পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত
করার দ্বন্দ্বা করেন। জিহায়ে সোহরাওয়ার্দীর

'স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ' প্রস্তাবের বিরোধিতা করার সোহরাওয়ার্দীর পক্ষে আর এই প্রস্তাব নিয়ে বেশি দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয়নি।

১৯৪৭ সালের ৬ জুন ব্রিটিশ সরকার ভারত বিভাগের কথা ঘোষণা করে এবং ১ জুনের মধ্যে কংগ্রেস ও লিগ নেতারা ভারত বিভাগের এবং শ্রাব্য ও বাংলা বিভাগের প্রস্তাবের প্রতি তাঁদের সম্মতি জানান করেন। যে পরিবেশে দেশভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাতে ফকরুল হক গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি এই আশাও পোষণ করেন, বাংলাদেশ বিভক্ত হলেও এই বিভাগ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে যাবে। তিনি সীমানা কমিশনের কাছে স্পষ্টভাবেই বলেন, বাংলাদেশ এক ও অবিভাজ্য, তাকে বিভক্ত করা যায় না। কিন্তু দেশভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তাঁরা ধরে ধরে পশ্চিমবঙ্গের অভিমুখে পালিয়ে গেলেন। ফকরুল হক বহিলাসে ছুটু ঘুরে। তিনি হিন্দুদের কথা ভেবে গভীর বেদনা অনুভব করেন। তিনি হিন্দুদের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন। তিনি এই কথাও বলেন, যদি পাকিস্তানের স্বর্থ হয় হিন্দুদের উপর উৎपीড়ন, তবে একে একটি 'রাজনৈতিক ঘাটা' বলতে হয়। তখনও ফকরুল হক হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বজায় রেখে বাঙালি জাতিকে এক মহাবিশিষ্ট্য থেকে রক্ষা করতে উৎসাহী হন।

পাকিস্তান প্রস্তাব বাংলার যে নিমাতল কতি করেছিল তা করেনও তিনি ভুলতে পারেননি। তাঁর মনে হয়, দেশভাগের ফলে বাঙালি মুসলমানদের লাভের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হবে। তিনি আরও মনে করেন, হিন্দু ও মুসলিম কর্মজীবী ভারত ও পাকিস্তানে চলে গেলে সাম্প্রদায়িক মৈত্রী বজায় রাখার পক্ষে সম্ভাব্য হবে না। এমনকি তিনি তাঁর বনিষ্ঠ আত্মীয়দের পাকিস্তানে যেতে নিষেধ করেন। তাঁর নির্দেশনায় তাঁর কয়েকজন অন্তঃস-বনিষ্ঠ আত্মীয় পূর্ববঙ্গের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও পারিবারিক ক্রয়-ক্রয় দীক্ষার করে

ভারতেই থেকে যান। ফকরুল হক নিজেকে ফকরুল হক থেকে যান। তিনি কিছুদিন ফকরুল হক-এক ব্যক্তি হতে উত্তমব্রহ্মের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। তারপর পারিবারিক ও রাজনৈতিক কারণে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের আবির্ভাবের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লিগ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত হয়। ১৯৪৯ সালের ২০-২৪ জুন মৌলানা জামালীর নেতৃত্বে ঢাকায় পূর্ববঙ্গের তিনজন মুসলিম লিগ কর্মীর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানেই 'আওয়াজি মুসলিম লিগ' নামে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০ জুন ফকরুল হক এই সম্মেলনে উপস্থিত থেকে তাঁর ভাষণে বলেন, মুসলিম লিগ পার্শ্ববর্তী জনসাধারণের চেয়ে দুর্ভাগ্যবশত একই ব্যক্তি স্বাধীনতা পক্ষপতিত করা হচ্ছে। ১৯৫২ সালে 'মুসলিম' শব্দ বাতিলের দলের নামকরণ হয় আওয়াজি লিগ। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ভাষা আন্দোলনের ফলে মুসলিম লিগের প্রভাব ক্ষত প্রাণ লাগে। কয়েকটি দল একত্রিত হয়ে মুক্তফ্রন্ট গঠন করে নির্বাচনে মুসলিম লিগকে ক্ষমতাচ্যুত করার কথাও ভাবতে শুরু করে। পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আফিন নির্বাচনে হেরিয়ে যাবার চেষ্টা করেও ১৯৫৪ সালে নির্বাচনের বাধ্য করতে বাধ্য হন। ১৯৫০ সালের ২৭ জুলাই ফকরুল হক 'কৃষক-প্রমিত দল' গঠন করেন। এইভাবে তিনি নিজের কৃষক প্রজা সমিতির সমর্থনযোগ্যী করে সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৫০ সালের ৪ ডিসেম্বর ফকরুল হক, মৌলানা জামালী ও সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে মুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। তাঁদের বক্তৃতা ইতিহাসে বলা হল, কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব বাকবলে দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা, আর অবশিষ্ট ক্ষমতাসমূহ অন্য সমস্ত বিষয়ে পূর্ব অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত সরকারের থাকবে।

এই নির্বাচনে মুসলিম লিগ সম্পূর্ণভাবে

পরাজিত হয়। ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে ফকরুল হক পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রিসভার মুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় মুখ্যমন্ত্রী হন। পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। ৩০ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী ফকরুল হক ফকরুল হক-এক ব্যক্তি হতে উত্তমব্রহ্মের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। তারপর পারিবারিক ও রাজনৈতিক কারণে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

তবে তিনি তাঁর ভাষণে বাঙালির প্রাণের কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন: 'বাঙালি এক হৃদয় জাতি। তাঁরা একই ভাষায় কথা বলে এবং একই মূলস্রোত দেখে গলে পড়ে। তাঁদের আশ্রয় এক এবং ভীষণ ধারণার প্রণালীও এক। বাংলা অনেক বিষয়ে সারা ভারতকে পথ প্রদর্শন করিয়াছে এবং দেশ বিভাগ সত্ত্বেও জনসাধারণ তথাকথিত নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের উল্লেখ ব্যক্তিগত করেই নিয়েছে। ...দুই বাংলার মানুষের মানুষের কোন ভেদ নেই। এই কৃত্রিম সীমাবন্ধা আরি ঘনি না।'

ফকরুল হক কয়েকটি ভাষণে ফকরুল হক যে ব্যক্তি মনেতাব বাক্য করেন তাতে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে ঢাকার বিমান কক্ষে নামাব পথেই তাঁকে গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা করে। তাঁকে পদচ্যুত করে বাড়িতে অন্তর্ভুক্ত করে রাখা হয়। পঁয়তাল্লিশ দিনের মুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বাতিল করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানকে বিজয়ী করার স্বপ্নের ফকরুল হক লিপ্ত, এই অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে করা হয়। প্রচার করা হয়, তিনি হলেন 'ভারতের লে'। বঙ্গবন্ধু তাঁকে ক্ষমা করে পড়লেও ফকরুল হক বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে প্রবাহমান করেন। মিশীকৃত আর বিদেশপন্থীর বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তা, ঐক্য ও সংস্থার মুক্ত মনের দুর্ভাগ্য প্রতীক হিসেবে তিনি পূর্ববঙ্গের মানুষকে নতুন চেতনায় উদ্বীণ করেন। পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার সংগ্রামে পবিত্রকালে স্বাধীনতা সংগ্রামে স্ফূর্তিত হয়ে বিলাহত বিক্রান্তি উত্তেজিত অসারতা প্রমাণিত করে। বর্ষপাত পার্থক্য থাকলেও হিন্দু ও মুসলমান বাঙালি এক জাতি এই ভাবনাটি গুরুত্ব লাভ করে।

ফজলুল হক স্মরণে

কাণ্ডি বিশ্বাস

বাংলার ভাষা, বাংলায় সংস্কৃতি, বাংলার ভাষা ও সাহিত্য। বাংলার ইতিহাস অবিভাজ্য। এই অতিরিক্ত ভাষাকে কেউ কখনই বিভক্ত করতে পারবে না। কৃত্রিম উপায়ের বহির্ভূত সাম্প্রদায়িক উদ্ভবতা এবং পৈশাচিক হিংস্রতা নিয়ে বাংলায় এই সুখরান ঐতিহ্যকে জংস করার চেষ্টা হয়েছিল। ওরা আপাত আংশিক পরিমাণে সফল হয়েছে ঠিকই কিন্তু পরিশেষে বাংলারই ক্ষয় হবে। আর বাংলা বিধ্বস্ত—আমি যেনে কবি এই বিভক্ত বাংলা আবার ঐক্যবদ্ধ হবে। ১৯০৫ সালে ব্রিটিশ চক্রান্ত করে বাংলাকে ভাগ করেছিল—১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রূপ হয়েছিল—ভাঙা বাংলা আবার দৃঢ় হয়েছিল। আমি বলিত্ত বাংলাকে ঘানি না। আমি চাই সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত দৃঢ় বাংলা। আমি সেই সুদিনের অপেক্ষায় আছি।

কথাগুলি কেনও কবির কল্পনা জগতের বাণী নয়। ৩১ মার্চ, ১৯৪৩ পর্বত অনেকদিন হয়ে তিনি ছিলেন বঙ্গ প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী (তখন বঙ্গা হত প্রবাসমন্ত্রী)—শেখ-ই-বাংলা বলে তাঁর পরিচয়—সেই আকুল কালের কলকাতা হত এই কলকাতার মুখ দাঁড়িয়ে দৃঢ় করে ওই কথাগুলি বলেছিলেন। একজন

সাধারণ নাগরিক হয়ে ওই ভাষাপর্ব্বপূর্ণ বাংলাগুলি তিনি উদ্ধারণ করেননি—করেছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের দৃঢ়মুঠ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী (ওখানে বঙ্গা হত উল্লিখিত আলা)—এর দায়িত্বভার মাথায় নিয়ে। স্বরণ করা যেতে পারে স্বাধীনতা লাভের পরে পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হয় ১৯৫৪ সালে। মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম লিগ ওই নির্বাচনে ধরাশায়ী হয়—মাত্র ৯টি আসনে জয়ী হয়েছিল—নুরুল আমিন নিজে নান্দাইল বিধানসভা কেন্দ্রে তদানীন্তন ছাত্রনেতা খালেক নেওয়াজের কাছে ১২ হাজার ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। কলকাতা হত আর যৌলানা আবদুল হামিদ বান ভাসানির নেতৃত্বে গঠিত দৃঢ়মুঠ ওই নির্বাচনে অকল্পনীয় সাফল্য অর্জন করে। বঙ্গভাসানির জয়জনমিতে পূর্ব-পাকিস্তানের আকাশ-বাতাস হয়েছিল সুখচিত। জনগণের তরঙ্গ হয়েছিল অমনোবে গিঁড়ালিত। জনাব কলকাতা হকের নেতৃত্বে গঠিত হয় পূর্ব-পাকিস্তানের দৃঢ়মুঠ সরকার। শেখ মুজিবুর রহমান—পাশে তিনি বসবস্তু মাঝে খাত হয়েছিলেন—তিনি ছিলেন ওই মন্ত্রিসভার বরেনে কনিষ্ঠতম মন্ত্রী—তাঁর বস্তুয় ছিল সহবার এবং দুর্নীতি বরন।

কোটি কোটি মানুষের প্রাণ ঢালা ভালবাসা আর অকৃত্রিম স্রষ্টা নিয়ে শেখ-ই-বাংলা শুরু করেন তাঁর মন্ত্রিসভার কাজ। কয়েক ঘাস পরেই নিজ বাসগৃহে গড়ে দিয়ে তাঁর পাশে চোট লাগে। ডিকিংসার জন্য আসেন তাঁর কর্মজীবনের দুল দীল্যভূমি—এই কলকাতা শহরে। সেই শহর, তার লোকজন সবকিছু বেখে আবেখে আদৃত হয়ে যান তিনি। ডিকিংসা শেষে সুখ হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে কোয়ার কেবলই পূর্বে কলকাতাবাসী তামের দীর্ঘবনের নেতাকে এক সভায় সংবর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। সেই অভিনন্দন-জ্ঞাপন সভায় দাঁড়িয়ে সজল নয়নে, রুদ্ধ কণ্ঠে, প্রকল্পিত ওঠে শেখ-ই-বাংলা ওই কথাগুলি উচ্চারণ করেছিলেন। তিনি তখন হয়েও ভাবেননি ওই কথাগুলি এমন খয়তিয় হয়ে তাঁকে বিদ্ধ করবে। কলকাতা থেকে আকাশপথে পাড়ি দিয়ে তিনি ঢাকার ঘাটি স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেল এক অভাবিত বিপর্যয়কর ঘটনা। ঢাকার বিধান বন্দবেই পুসিগ প্রেত্তার কল মুহুর্ত-পূর্বে তিনি ছিলেন সখা গঠিত জনপ্রিয় দৃঢ়মুঠ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী সেই জনাব কলকাতা হকের। প্রেত্তারের সময় তাঁকে জানাবেনা হল—তাঁর মন্ত্রিসভাকে বহুভাঙ করা

চেষ্টা। শাক সংবিধানের ১২(ক) ধারা অনুসারে সেখানে বাণীপতিব পানসবাবস্থা চালি হয়েছিল। পাকিস্তানের বাঙালীরা কবানি থেকে নতুন পতনের ইচ্ছার মিথ্যা চাক্ষুষ এসে কপিত পূর্ব-বাংলার প্রশাসনিক দায়িত্বপ্রাপ্ত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু, অপমানিত, কুসং, বাকসং হক সত্যের জিজ্ঞাসা করেছেন—কেন তাঁর মন্ত্রিসভাকে বহুভাষী করা হল। আর কেনই বা তাঁকে স্বাধী করা হল। কতটি ব্যক্তিরই উত্তর শুনে তিনি আঁতকে উঠেন। কলকাতার সংবর্ধনা সভায় যে বক্তৃতা তিনি করেছেন তাই ফলে তিনি তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছেন—

পাকিস্তানের শাক (পতি) সংবিধানকে তিনি না-শাক (অপতি) করেছেন—এখন গুজরার অপরাধের জন্য পাকিস্তান সরকার ভনস্বার্থে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কোনও ঐতিহ্য, কোনও সংস্কৃতির কোনও ভাষা বা সাহিত্যের প্রতি এমন সহজ-সরল প্রত্যা নিবেশনের পতিপতি এমন নিষ্ঠুর হতে পারে দুনিয়ার ইতিহাসে তার কোনও প্রমাণ নেই। একজন প্রকৃত স্বয়ংস্বীকৃত এইভাবে তাঁর আবেশের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হল।

মনে পড়ে তাঁর বয়স এবং শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে কিছুমিনি পরে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। তখন ঘটনা আরও এক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। পূর্ব পাকিস্তান জমিদারি বনস আইন (Estate Acquisition and Tenancy Act—1954)-কে চালিয়ে জমিদার পূর্ব পাকিস্তানের জমিদারকুল পাকিস্তানের সর্বোচ্চ আদালত কেডারেল কোর্টে একটি মামলা বাতায় করেন। স্বাধী এলিজাবেথের আইন উপস্থিতি এন প্রিক্টে সরকার থেকে ওই মামলার কৌটলি নিয়োগ করা হয়। জমিদারদের পক্ষ থেকে কৌটলি নিয়োগ করা বেশবহু চিন্তারজনক মামলার অনুভূ পান্ডার প্রণীত বায়বায়নী পি আর কানকে। তাঁকে সাহায্য করতে সবে থাকেন

অশোক সেন (তারত সবকাবের প্রাক্কন মন্ত্রী) এবং সিদ্ধার্থবংকর বাব। এই আইন বিশেষজ্ঞদের ঢাকার সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উক্ত সভায় কলকাতা হক সত্যের একজন আইনজীবী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সভায় সিদ্ধার্থবংকর বাব বক্তৃতা প্রদানে বলেছিলেন বাংলায় যে সকল ঘনিষ্ঠীকে বাঙালি জাতি কখনওই তুলবে না তাঁদের মধ্যে যেমন আছেন দেশবহু চিন্তারজনক বাব, তেমনই আছেন সেব ই বাংলা কলকাতা হক। সেই পরিবেশ আবেগপ্রবণ কলকাতা হক সত্যেরকে পুনরায় বিচলিত করে দেয়। তিনি বলে ওঠেন বাংলায় জাতিসত্তা অস্তিত্ব, তাকে ভাষ করা যাবে না। সাবে সাবে পূর্ব-পাকিস্তান সরকার তাঁর কাছে ভৈতিক্ত তলন করে। তিনি

আমি ষ্ঠিত বাংলাকে মানি না। আমি চাই
সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত বৃত্ত
বাংলা। আমি সেই সুদিনের
অপেক্ষায় আছি।

অসতর্কভাবে কবানি বলে ফেলেছেন বলে মুখ প্রকাশ করেন—ও বয়স এবং ঘানসিক অবস্থা বিবেচনা করে তিনি বাঙালীতি থেকে অবসর গ্রহণ করলেন— এই কথা ঘোষণা করেন। আরও একবার জেলে বাওবার বেদনা থেকে হক সত্যের গোড়াই সেলেন। বাংলার প্রতি তাঁর সম্বোধন যে পরিমাণ করা সত্ত্ব নর সেই কথা বলার জন্য উপহারে দুটি ঘটনার উল্লেখ করতে হল। ইতিমধ্যে কটমিল অ্যাট, ১৯০২ অনুসারে কলকাতা হক সত্যের ১৯১৬ সালে ১০০ সন্যাসুত বেল কটমিলে ঢাকা দুপলিহ নির্বাচনী এলাকা থেকে

নির্বাচিত হন। শুভ হর তাঁর সংস্বীয় বাঙালীতিক জীবন। আকৃত্য তিনি সেই কাজে নিম্বন্ধে নিবেশিত বেষ ছিলেন। তার বিকৃত বিবরণ কেতাবের কোনও পুত্রের এখানে নেই। তাঁর স্মৃতিচারণ করতে দিয়ে মু-কট কথা বলতে চাই। একজন ছাত্র হিসাবে ঢাকায় টিকটুলিতে তাঁর বাসভবনে অনেকবার বাওবার সুযোগ আবার হয়েছে। অনেক কথা তাঁর মুখ থেকে শুনেছি—সে সব কথা এখনও স্মৃতিব কেতাব সংরক্ষিত আছে। শিক্ষার প্রতি তাঁর যে বিশেষ আগ্রহ ছিল— বিভিন্ন কবায় কীকে কীকে সে কথা আত্মপ্রকাশ করতে। পবাকীন ভাবেতে বন প্রদেশে পরিবর্ধীয় পানস বাবস্থা ঘন প্রচলিত হয় তখন শিক্ষার প্রথম ভারপ্রাপ্ত পরিবর্ধ ছিলেন প্রভাসচন্দ্র তিত্ত ১৯২১-২৬ সালে। ১৯২৪-২৬ সময়কালে শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত পরিবর্ধ ছিলেন কলকাতা হক সত্যের। তিনি বাংলার বিতীয় শিক্ষা পরিবর্ধ। ১৯৩৭ সালে তিনি ঘন মুখাধীকরণ সরকার পঠন করেন—তখনও শিক্ষা বিভাগকে তিনি শিক্ষার হাতে বেষেছিলেন। ১৯৩০ সালে বর্ধীয় প্রাথমিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিবিক্ত করার সময় পরিবর্ধে তুলুল বিতর্ক হয়। জমিদারদের প্রতিনিধি (ঘনাজক সন্যসই বিবু) শিক্ষাবিত্তবেষ জনা ওই প্রদেশের জীহ বিযোবিতা করেন। এবং শেষ পর্যন্ত ৫০ জন হিন্দু সন্যসই ওগাভ-অট্ট করেন—পরিবর্ধ কক থেকে বেষিবে ঘান। বাংলার আইন সভায় এই প্রথম প্রাথমিক শিক্ষা আইন বিবিক্ত হল (২৬/৮/১৯৩০) এবং তা হল হিন্দু-সন্যস বর্ধিত আইনসভায়, শুভম্বায় অহিন্দু সন্যসায়ের সন্যসপুট হয়ে। শিক্ষামন্ত্রী নাটিকুলিন উদ্বাপিত ওই প্রত্যবে হক সত্যের তাঁর সন্যসবে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন—এবং শিক্ষাপ্রসারে তাঁর কর্তব্য মনের পরিচর বেষেছিলেন। ১৯৫৬-৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনাভ্যত হুদ্যাবাস 'ঢাকা

হলের' জাহেজা এখন একটি সরকারি
কলেজের বিল্ডিং এখনও বর্ষক
চলানছিলেন—কমল হক সাহেব তখন
পরিচিতি পাকিস্তান স্বাধীনতার
উদ্দেশ্যে গভর্ন পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর।
হুজুরের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর জন্য
তিনি নিয়ে চাকি হলে এসে অনশনরত
হুজুরের পাশে বসেছিলেন এবং শেষ
পর্যন্ত তাঁর হাতের কমলালেবুর রস খেয়ে
হুজুরের অনশন বর্ষক এতদ্বারা
করেছিলেন। সে সময়ও
যেখেনি—শিকারী ওষা শিকার প্রতি
তার কী বড়ির আশ্রয়।

১৯৫৪ সালে পূর্ব-পাকিস্তানের
সাধারণ নির্বাচনের সময় যেখেনি বাংলার
কৃষকের অন্তরে তাঁর আসন কত
সুখভিত্তি, কত দুঃ। জমিদার শ্রেণীর
অমানবিক লাগল, সুখবোর মহাজনদের
হুমুযাতের ব্যবহার বাংলার কৃষককে
করেছিল নিঃশব্দ। বাংলার কৃষকের সকল
জমিজমা প্রায় খেনা ও সুখের ঘরে বসত
পড়ে যায়। কলকাতা হককে নেতৃত্ব
প্রদানর আইন সংশোধন এবং
গণ-পালিশী বোর্ড ও বাই-বালাসি
আইনের সাহায্যে বাংলার কৃষককে
তাদের হারানো জমি ফিরে পান। বাংলার
মানুষ কমল হককে শের-ই-বাংলা
উপাধিতে সম্মানিত করেছিলেন বাংলার
বার্ষিক তাঁর বক্তৃতি ভূমিকা দেখে। দ্বিতীয়
বিশ্বযুদ্ধের তাওবে ব্রিটিশ সরকার
বাংলার কমল হককে নেতৃত্ব
সরকারের উপর বিভিন্নভাবে চাপ দিতে
থাকে। বাংলা থেকে সৈন্যবাহিনীর জন্য
খাদ্য সাগ্রহ—প্রবেশক কলেক বহু করে
থিয়ে সেখানে সৈন্য বাবা প্রতীতি কাকে
বিল্ডিং কমল হক তাঁর বিবেকিতা
করতে থাকেন। ভারত হাড়ে
আফগানকে এখন কখন এবং নেতৃত্বকে
এতদ্বারা বিল্ডিং হক সাহেব
সাধানুসারে প্রতিবাদ করতে থাকেন।
মৌলানার সরকারি কর্মচারীদের উপর
অত্যাচারের তদন্ত করার জন্য কমল
হক সাহেব বিধানসভার ১৫ ফেব্রুয়ারি
১৯৫০ সালে এক বিবৃতি দেন। এতে

১৯৫৪ সালে

পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ
নির্বাচনের সময় দেখেনি
বাংলার কৃষকের অন্তরে
তাঁর আসন কত সুগভীর
কত দুঃ।

প্রত্যয়কে কৃত হয়ে গভর্নর প্যার জন
কমল হককে কাছে কৈকিতত তলব
করেন। পরের দিন হক সাহেব গভর্নরকে
যে চিঠি দেন তা থেকে তাঁর
বাহীনচোয়ার পরিচর পাওয়া যায়।
“আপনার সাথে পরামর্শ না করে
বিধানসভার আমি যে ঘোষণা করেছি
সেজন্য আমার কাছে কৈকিতত তলব
করেছেন। কৈকিতত পেওয়ার পরিচর
আমার নেই কিন্তু আপনাকে সাবধান
করে যেওয়া আমার কর্তব্য বলে আমি
হয়ে করি। যে অপোজন ওষা আপনি
ব্যবহার করেছেন, তবিয়েতে দুখাযাত্রীর
সঙ্গে পরামর্শে তা পরিহার করবেন
হলেই আপা রাত্রি।” এই চিঠিতে
কমল হক আরও জানিয়ে দেন চিঠির
ওষা সংশোধন না করলে “আগামীকাল
১৭ ফেব্রুয়ারি গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাতের
যে দিন বর্ষ করা আছে তা বাতিল বলে
গভর্নর হয়ে নিতে পারেন।” ২৮ মার্চ
গভর্নরের আদানে কমল হক তাঁর সঙ্গে
সেবা করতে যান এবং পূর্ব থেকে টাইপ
করা পদত্যাগ পত্রে তিনি সাক্ষর দিতে
থায় হন। ৩১ মার্চ জরিখে তাঁর
পদত্যাগের কলে পক্ষকালের জন্য
বিধানসভা মূল্যভূমি হয়ে যায়। জারি হয়
১৩ মার্চ। পরে ১৪ এপ্রিল
নাকিহুদিনের নেতৃত্বের মুসলিম লিগ
মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

কমল হক সাহেবকে অনেকে অধির

হয়েন মানুষ হিসাবে চিত্রিত করেছেন।
আমার মনে আছে হক সাহেবের
পর্বশবহিরোধী করেকটি বিবৃতি ১৯৫০
সালে ঢাকার পত্র-পত্রিকার প্রকাশিত
হয়। সাংবাদিকগণ হক সাহেবকে
কিভাবে করেন এটাই কি আপনার শেষ
বিবৃতি? তিনি উত্তর দেন—আমি এখন
শেষ হয়ে বাহিনি—এটা আমার শেষ
বিবৃতি কী করে হবে? সুকৌশলী
কৌশলিকের হাড়ে তিনি বিভিন্ন সময়
তাঁর রাজনৈতিক স্থান বদল
করেছেন—এই ধরনের বহু পুষ্ট
আছে। তাঁর সম্বন্ধে আগা কিছু অনুমান
করা যে করিন—সে কথা বহুবার
প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ
বিশেষ করে বাংলার কৃষক সমাজের
প্রতি তাঁর কতকো গভীরতা নিয়ে কোনও
মহলে কোনও সংশয় নেই। সেজন্য
১৯৫৪ সালে পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ
নির্বাচনে মৌলানা আব্দুল হামিদ খান
তাসানিকে সঙ্গে নিয়ে যখন তিনি আওয়দ
জানিয়েছিলেন—“আমি চতুর্থ পাবিশ
যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি—আমাকে সাহায্য
করুন—আমি বাংলার নিরস্ত্র মানুষের
জন্য একটি ভাল-ভালের ব্যবস্থা করব।”
গোটা পূর্ব-পাকিস্তানের আমজনতা সেই
আকৃষ্ট-পূর্বভায়ে লাড়া বিয়েছিলেন।
হক সাহেবের জীবনের আর একটি
উল্লেখযোগ্য ঘটনার উল্লেখ করে আমার
কথা শেষ করব। ১৯৫৪ সালে
পূর্ব-পাকিস্তানে নির্বাচনের পর হক
সাহেবের দুখাযাত্রিতে গঠিত হয় দুতমট
মন্ত্রিসভা। পশ্চিম মহাবনে বিস্তর
সমাবেশে নিবন্ধ সাংবাদিক
পদমণ্ডলীর কথা ভুলে গিয়ে প্রকাশ্য
সমাবেশে তাসানির হাতে জনগণের পক্ষ
থেকে যে চাকু উপহার হিসাবে ভুলে
যেওয়া হয়েছিল—সেই চাকু কলার হয়ে
শের-ই-বাংলা ঘোষণা করলেন আমার
কালের গারাগি জনগণের চেতনা এবং
মৌলানা তাসানির চাকু। জনগণ
সঙ্গেসাহেব তাঁকে অভিনন্দন জানালেন।
তিনি যে পুষ্ট সাহায্যকর করে রচনা
করে দেখেন—তার মূল্য অপরিমিত।

আবুল কাশেম ফজলুল হক

হাসিম আব্দুল হাসিম

আবুল কাশেম ফজলুল হক
বরিশাল (বাংলাদেশ) জেলার
সাতুড়িয়া গ্রামে ২৬ অক্টোবর
১৮৭০ সালে এক শিক্ষিত ও বর্ণিল
পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বিত্তশালী
পিতার একমাত্র পুত্র হিসাবে প্রাচুর্য
মধ্যে লালিত হন। শিক্ষিত ও রাজনৈতিক
মহলে 'শেখ বাংলা' এবং সাধারণ
মানুষের কাছে 'হক সাহেব' নামে
পরিচিত ছিলেন। পিতা কলী মহম্মদ
ওতাজেব বরিশালে সরকারি উকিল
ছিলেন।

ফজলুল হক ছাত্র হিসাবে অত্যন্ত
মেধাবী ছিলেন। ১৮৮১ সালে বরিশাল
জেলা স্কুল থেকে বৃত্তি সহ এন্ট্রাল পাশ
করেন। কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে
ভর্তি হন। ১৮৯১ সালে বৃত্তিসহ প্রথম
বিভাগে এক এ পাশ করেন। ১৮৯০
সালে একই কলেজ থেকে পলিত,
রসায়ন ও পদার্থ এই তিনটি বিষয় নিয়ে
প্রথম বিভাগে বি এ পাশ করেন। এ
সময় প্রেসিডেন্সী কলেজে আচার্য
প্রমুদচন্দ্র রায় অধ্যাপনা করতেন। আচার্য
প্রমুদচন্দ্র রায় ফজলুল হককে পুস্তক
সেই করতেন। ১৮৯৫ সালে ফজলুল হক
পলিতশাস্ত্রে এম এ পাশ করেন এবং
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পলিতের পরীক্ষক
নিযুক্ত হন। ১৮৯৭ সালে আইন কলেজ
থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বি এল ডিগ্রী লাভ

ফজলুল হক

সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও

দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন।

বরিশাল থেকে তাঁর

সম্পাদনায় বালক নামে

একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা এই

সময়ে প্রকাশিত হতো।

করে সার আশুতোষ মুখার্জির অধীনে
শিকানবিলি শুরু করেন। শিকানবিলির
শেষ কিছুকাল কলকাতা হাইকোর্টে
আইন ব্যবসা করেন। ১৯০১ সালে
বরিশাল আদালতে ওকালতি ব্যবসায়
যোগ দেন। একই সময়ে বরিশাল জাজচন্দ্র
কলেজে পলিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।
তখন জাজচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক ছিলেন
ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি—বিনি দেশ
দ্বারী হবার পর পলিতমবসের রাজ্যশাল
হয়েছিলেন। হরেন্দ্রকুমার ফজলুল হককে
খুবই স্নেহ করতেন। তাঁর প্রতিভা
কর্মকর্মতার দৃষ্ট ছিলেন। মহাত্মা
অহিনীকুমার কত এই সময় বরিশাল

মিউনিসিপ্যালিটির সেক্রেটারিয়ান ছিলেন।
মহাত্মা অহিনীকুমারের পরামর্শে ফজলুল
হক মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ও সফল নির্বাচিত
হন। মহাত্মা অহিনীকুমারের প্রেরণার
ফলস্বরূপ প্রতিষ্ঠানে কাজের প্রত্যক্ষ
অভিজ্ঞতা লাভ করেন। এ অভিজ্ঞতা তাঁর
রাজনৈতিক চেতনাকে বিকশিত করে।
ফজলুল হক সাহিত্য-সংস্কৃতির
ক্ষেত্রেও দক্ষতার পরিচয় রেখেছেন।
বরিশাল থেকে তাঁর সম্পাদনায় 'বালক'
নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা এই সময়ে
প্রকাশিত হতো। রাজবাহাদুর নিখারপল্লী
বাসের সময়ে দুঃসম্পাদনায়
'ভারত-সূত্র' সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ
করেন।

১৯০৫ সালে স্বদেশের সময় স্যার
সলিমুল্লাহ সাহিবো আসেন। ১৯০৬
সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকার অনুষ্ঠিত
নিখিল ভারত মুসলিম লিগ সম্মেলনে
যোগ দেন। ১৯০৬ সালে তেপুটি
খ্যাতিসম্পন্ন চাকুরি গ্রহণ করেন। পরে
হেজিরাটর অব ত্রেজিট সোসাইটি পথে
উন্নীত হন। ১৯১১ সালে সরকারি চাকুরি
থেকে সার আশুতোষ মুখার্জির পরামর্শে
হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় যোগ দেন।
শীঘ্রই তিনি আইনজীবী হিসাবে নিজেকে
প্রতিষ্ঠিত করেন। ফজলুল হক ডব্লু সি
বানার্জি, সার সুব্রহ্মনাথ বানার্জি,

নবমুখ্যমন্ত্রী সেন, মতিলাল ঘোষ, মহাত্মা জহিরীকুমার শর্মা, অমিতা মল্লিক, সামসুল হক, আবদুল রসুল, বিনিমিত্ত পাল প্রমুখ কর্মীরাই সার্বভৌমতা লাভ করেছিলেন। ১৯১২ সালে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগ দেন। ১৯১৩ সালে দলটি নিম্নোক্ত সংস্কার ফলে প্রথম বর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার (Bengal Legislative Council) সদস্য নির্বাচিত হন। সেই থেকে প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় আইন সভার (Central Legislative Assembly) (১৯০৮-০৯) সদস্য হিসাবে পরিচিতি রাজনীতিতে ফেলতে থাকে যার দিন পর্যন্ত সুবীৰ্ণকাল বৃত্ত ছিলেন।

এও দীর্ঘকাল একমিত্রমে আর কেউ পরিচয়ী রাজনীতিতে বৃত্ত ছিলেন বলে জানা নেই। ১৯১০-১৬ বর্ষীয় প্রাথমিক মুসলিম লিগের সম্পাদক পদে সভাপতি (১৯১৬-২১) সভাপতি হয়েছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ এ সময় ছিল। ১৯১৮ সালে তিনি একই সঙ্গে সর্বভারতীয় মুসলিম লিগের সভাপতি ও জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯২৬ সালে 'সফৌ-পার্টী'-এর অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৯১৯ সালে কৃ-খ্যাত বাঙালী আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। জাতিয়নওয়ালাবাদ হত্যাকাণ্ডের (১০ এপ্রিল ১৯১৯) ভয়েদের জন্য গঠিত বৈ-সরকারি কমিটির সদস্য ঘনোনিতি হন। ওই কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন মতিলাল বেক্ত ও মেনবু চিত্তরঞ্জন দাস। ১৯২০ সালে বেবিনীপুরে প্রাথমিক রাজনৈতিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। অসহযোগ ও বোলাকু আন্দোলনের সঙ্গেও বৃত্ত ছিলেন। গুরুত্বের কুল-কলেশ বর্ধনের কংগ্রেস প্রস্তাবের বিরোধিতা করে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

১৯২০ সালেই কয়েকজন মুজাফ্ফর আহমদ ও কাজী নজরুল ইসলামের সহায়তায় সাক্ষা মৈনিক 'নবদুর্গ' (১২ জুলাই-জানুয়ারি ১৯২১) প্রকাশ করেন। ১৯৪০ সালে নবদুর্গ পত্রিকা

পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২৩ সালে মেনবু চিত্তরঞ্জনকে সঙ্গে 'বেঙ্গল পার্টি' বৃত্তি সম্পাদন করেন। ১৯২৪ সালে স্বৈত্ব দাসনকালে স্বত্ব সময়েই জন্য লিফাফ্টী ছিলেন। ১৯৩০-৩০ ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিনিধি হয়ে লন্ডনে ত্রিববার ফোল টেকিল বৈত্বকে উপস্থিত থেকেছেন। ১৯৩৫ সালে কলকাতা কংগ্রেসেশনের মেম্বর নির্বাচিত হন। ইতিমধ্যে ১৯২৯ সালে স্যার আবদুল বহিদ্দকে সভাপতি করে যে কৃষক প্রজা পার্টির গঠন করেছিলেন ১৯৩৬ সালে সেই পার্টির সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯২০ সালেই কয়েকজন

মুজাফ্ফর আহমদ ও কাজী

নজরুল ইসলামের

সহায়তায় সাক্ষা মৈনিক

'নবদুর্গ' (১২

জুলাই-জানুয়ারি ১৯২১)

প্রকাশ করেন।

১৯০৭ সালের বর্ষীয় আইনসভার (Bengal Legislative Assembly) নির্বাচনে কৃষক প্রজা পার্টি তার নিজস্ব কর্মসূচী নিয়ে অংশগ্রহণ করে। মুসলিম লিগের কু-স-অংশগ্রহণ বর্ষীয় ও সাম্প্রদায়িক জীবনকে ব্যর্থ করে আইনসভার নির্বাচনে কৃষক প্রজা পার্টি হতেই কৃষিকের পরিচয় দেয়। নির্বাচনী কলাকলে দেখা যায় মোট ২৫০ আসনের মধ্যে কংগ্রেস—৬০, মুসলিম লিগ—৪০, কৃষক প্রজা পার্টি—৩৫, নির্বাচী মুসলিম—৪১, তপসিলি—২৩ নির্বাচী বর্ষ বিদ্যু—১৪, ইউরোপীয়—২৫, ক্রিস্টিয়া কৃষক সমিতি—৫ এবং অন্যান্য—১২ জন প্রার্থী জড়ি হয়েছেন। পরে নির্বাচী

মুসলিম সমসাময় মুসলিম লিগ ও কৃষক প্রজা পার্টিতে যোগ দিলে মুসলিম লিগ—৩৯, কৃষক প্রজা পার্টি—৩৭ জন বৃত্তি পায়।

চলন্ত হক মুসলিম লিগ নেতা খাজা নাজিমুদ্দিনকে তাঁরই জমিদারী এবং যে কেন্দ্র থেকে তিনি করেতাবা বিনা প্রতিরোধিত্যে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, সেই নৃতিযাচালি কেন্দ্র খিত্তগেবও বেশি ভোট দাঁকে পর্বাচিত করেন। এটা ছিল ফকরুল হকের কাছে ঘর্নাচ লড়াই। শোহাওয়ারী ফকরুল হকের ভোট জনপ্রিয়তা প্রমাণে জন্য এই চ্যালেঞ্জ জনিয়েছিলেন। ফকরুল হক উপযুক্ত জবাবও দিতেছিলেন। পার্শ্ববর্তী বিদ্যোক্তপুং কেন্দ্রও ফকরুল হক মুসলিম লিগ প্রার্থীর জয়ান্ত বাজেয়াপ্ত করেন। বহির্ভাগে জেলায় ১টি মুসলিম আসনেও একটিও মুসলিম লিগ বর্ষল কয়েতে পারেনি। কৃষক প্রজা পার্টির বিনুল সাক্ষা ফকরুল হকের জনপ্রিয়তাই সেদিন প্রমাণিত করেছিল। নির্বাচনের পর ফকরুল হক প্রথমে কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন গঠনে প্রয়াসী হন। যাংলা প্রাথমিক কংগ্রেসের নেতা শরৎচন্দ্র বসু এ প্রস্তাবে সম্মত হলেও কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের সংকীর্ণ কৃষিকের কারণে সম্মত হয়নি। মুসলিম লিগ এই পরিধিটিকে কাজে লাগিয়ে ফকরুল হকের প্রধানমন্ত্রী (তখন মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রী বলা হতো) করে লিগ প্রজা পার্টির কোয়ালিশন সরকার গঠন করে ১ এপ্রিল ১৯০৭ সালে। এরপর থেকেই মুসলিম লিগের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পটতে থাকে। এ সরকারের আমলে কয়েকটি আইন—প্রজাবৃত্ত আইন, খপ সাদিসী বোর্ড ও মহাজনি আইন কৃষক জীবনে গুস্ত সূচনা করে। প্রতিষ্ঠানদীল লিগের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনের ফলে কৃষক প্রজা পার্টিতে তাক্তন ধরে। কৃষক প্রজা পার্টির ২৮ জন সদস্য কৃষক প্রজা পার্টির পরিচয়ী রূপ হিসাবে বিদ্যোচী কংগ্রেস বেলের সঙ্গে আসন গ্রহণ করে। ফকরুল হক ১৯০৭ সালের

অষ্টোত্তর হাঙ্গে লক্ষ্যেতে নিখিল ভারত মুসলিম লিগ অধিবেশনে যোগদান করেন ও বঙ্গীয় মুসলিম লিগের সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। লক্ষ্যবাসী তাঁকে 'সেরে বাংলা' উপাধিতে ভূষিত করে। কক্সবুল হক মুসলিম লিগের বিখ্যাত রাজনীতির লিগার হয়ে পড়েন। ১৯৪০ সালে মুসলিম লিগের লাহোরে অধিবেশনে ঐতিহাসিক 'লাহোর প্রস্তাব' পরে যা 'পাকিস্তান' প্রস্তাব নামে খ্যাত—সেই প্রস্তাবের উপস্থাপক ছিলেন। স্বাধীনচেতা কক্সবুল হক কোনও বিন কারণে তাঁকেবাধী করেননি। হুকুম যেনে চলেননি। ১৯৪১ সালে মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে মহাবিষোধ বেধা যায়। কক্সবুল হক মুসলিম লিগ থেকে পদত্যাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রিসভার লিগ সদস্যতা মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন। মন্ত্রিসভার পড়ন ঘটে। উৎকালীন বাংলার বর্তমান জন হাবিট—এস সঙ্গে লিগের পোশন বোঝাপড়া ছিল যে হক মন্ত্রিসভার পড়ন ঘটিল বর্তমান মুসলিম লিগ নেতা ব্রিটিশ শাসকদের অনুযুক্ত না। নাজিমুদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী করে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ করে যেনে। এই আশ্বাসের ভিত্তিতেই লিগ সদস্যরা ভবিষ্যৎ মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। কক্সবুল হকও বর্তমানের এই বুদ্য চক্রান্ত বুঝতে পারেন বানচাল করতে ইতিবাধে তিনি কংগ্রেসের অন্যান্য নেতা পরবর্ত্তন বসুর সঙ্গে প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের উৎসাহিতা শুরু করে নিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস থেকে বিভাজিত হবার পর কংগ্রেসের মধ্যে ছুটি দল সৃষ্টি হয়েছিল। পঞ্চ বসু সুভাষ অনুসারী করওয়ার্ড ব্লকের নেতা ছিলেন। মন্ত্রিসভার পড়নের পর কক্সবুল হক দাবি করেন আইনসভার তাঁর নতুন ছোট প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন দলের সংখ্যানুগততা আছে। এবং তিনি প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশনের সর্বসম্মত নিষিদ্ধিত নেতা। ব্রিটিশ সরকারের কাছে তখন একটি আশঙ্কাজনক সরকারের প্রয়োজন ছিল। স্বাধীন

নাজিমুদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী করে মুসলিম লিগের সরকার গঠনই তা সম্ভব ছিল। নাজিমুদ্দিনের সঙ্গে ব্রিটিশদের ধর্মবিশ্বাসে নু-সম্পর্ক ছিল। বৈত শাসনকালে নাজিমুদ্দিন দ্বন্দ্বী ছিলেন। এবং বর্তমান পরিচয়ের কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যও ছিলেন। তাই হোক ১১ ডিসেম্বর ১৯৪১ প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন সরকার পদ গ্রহণ করে। পদ গ্রহণের দিন তাঁর রাতে পরবর্ত্তন বসু প্রেরণার হন। ব্রিটিশ শাসকরা চেয়েছিল প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশনকে অন্ধুরেই বিনষ্ট করতে।



কক্সবুল হক মুসলিম লিগ নেতা নাজিমুদ্দিনকে তাঁরই জমিদারী এবং যে কেন্দ্র থেকে তিনি কয়েকবার বিনা প্রতিবন্ধিতায় নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, সেই শটুখাখালি কেন্দ্রে বিদ্রোহও বেশি ডোটে তাঁকে পরাজিত করেন।



কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। শ্যামপ্রসাদ মুখার্জীকে অর্থমন্ত্রী করে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে পরবর্ত্তন বসু এমন একজন নেতা যিনি মুসলমানদের আত্মশ্রদ্ধা ছিলেন। অপর দিকে কক্সবুল হকও হিন্দুদের কাছে গ্রহণযোগ্য নেতা ছিলেন। এই দু-জনের যোগা নেতৃত্বের যে সুযোগ সেদিন বাংলার জনগণের মাঝে উপস্থিত হয়েছিল পরবর্ত্তন বসুর প্রেরণার ফলে সম্ভব হলো না। প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন সরকারের তখন বলপূর্ণে অবস্থা ছিল প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টি—৪২, কংগ্রেস (বোস গ্রুপ)—২৮, কৃষক

প্রজা পার্টি—১৯, হিন্দু মহাসভা—১৪, নির্বল অফিসি গ্রুপ—১২, অ্যান্ডলো ইন্ডিয়ান—৩, প্রতিক—১ মোট ১১৯ জন সদস্য। প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন পার্টির ৪২ জন সদস্য মুসলিম লিগ ও কৃষক পার্টি থেকে পূর্বে বেধিয়ে আসা সদস্যদের নিয়ে গঠিত ছিল। ভিন্নগণতন্ত্র হাব তখন অতিসিদ্ধান্ত কংগ্রেসের নেতা। তিনি অতিসিদ্ধান্ত কংগ্রেসের ২৪ জন সদস্য সহ বিবোধী আসনে বসতেন। মুসলিম লিগ ও তার ৪০ জন সদস্য বিবোধী বলে আসন গ্রহণ করে এবং নাজিমুদ্দিন ছিলেন বিবোধী দলের নেতা। মুসলিম লিগ ব্যাপ করে এই মন্ত্রিসভাকে 'শ্যাম-হক' মন্ত্রিসভা বলতো। শ্যামপ্রসাদের মন্ত্রিসভার প্রত্নভুক্তি নিয়ে মুসলিম জনগণের মধ্যে সাস্ত্রব্যতিক মনোভাবকে উসকে দেয়। কিন্তু এই মন্ত্রিসভা ছিল অ-সাস্ত্রব্যতিক জাতীয় ভাবগার্য গঠিত। ব্রিটিশ শাসকদের কাছে যা অভিশ্রুত ছিল না। মন্ত্রিসভা গঠনের পর থেকে বর্তমান দাবিদেই ইচ্ছাকৃত ছিল মন্ত্রিসভার কাজে। হাবিট ১৯৪১ সালে যে চক্রান্ত সফল করতে পারেননি সেই চক্রান্ত সফল হলো ২৮ মার্চ ১৯৪০ সালে প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করে। সে এক কলঙ্কয ইতিহাস। নাজিমুদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রী করে মুসলিম লিগের সরকার গঠন করা হয় ১৯৪০ সালের ২৪ এপ্রিল। মুসলিম লিগের এই মন্ত্রিসভা টিকে ছিল দু-বছর—১৯৪২ সালের ২৮ মার্চ পর্যন্ত। মুসলিম লিগ মন্ত্রিসভা গঠিত হবার পর টাউন হল প্রতীবাস সভা হয়েছিল। সভার কক্সবুল হক পদত্যাগ করে বলেন, তিনি এক পজীব ফলাফলের বলি হয়েছেন। সভায় সন্তোষকুমার বসু, জঃ শ্যামপ্রসাদ মুখার্জী, সৈয়দ হকজোজা প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ বর্তমানের অঞ্চলভিত্তিক কাজের নিষা করেন। শ্যাম আবুল হাশিম গজনি সভায় সভাপতিত্ব করেন। এই মন্ত্রিসভার আমলে 'পদত্যাগের মহত্ব' বেধা যায়। বৃটিশের ৫০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায়।

জন দ্বারাটের জাহাঙ্গীর নতুন গভর্নর হয়ে আসেন স্যার আর্থার ক্রীসলী। ১৯৪৫ সালের ২৮ মার্চ বাঙেট অধিবেশনে কৃষি খাতে অর্থ মঞ্জুরি বিষয়ে ডেট প্রণয়নকালে সরকার পক্ষে—১৭, বিবোধী পক্ষে ১০৬ ডেট পড়ে। সরকার পক্ষের ২১ জন সদস্য বিবোধী দলে যোগ দিয়েছিল। বাজা নাকিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভার পতন হয়। কক্সবাল হুক তখন বিবোধী দলের নেতা। তাঁর প্রত্যাগমন বুদ্ধির ফলেই সেদিন মন্ত্রিসভার পতন ঘটেছিল। তাঁর কৃমিকা ছিল অবস্থা। শ্রীকান্ত ছিলেন তখন সৈদ্য সৌভাগ্যে আসি আফগান হাব নাম পরিবর্তী বাজানীতিতে বাঘে বাঘে উল্লিখিত হয়ে থাকে। তিনি পূর্বের বিন সভায় বলেন—

...The Ministry is the creature of the House; the House can make and unmake the Ministry and the Governor is but the registering authority of the decision of the House.....In this circumstances I think the House cannot function any longer unless a new Ministry is formed.

একথা বলে অধিবেশনের দুলাভূমি ঘোষণা করেছিলেন গভর্নর ক্রীসলী মিলেনের হাউস অব কমন্সে পৌঁছানোর নিম্নে সুবেছিলেন এ বিষয়ে আর অগ্রসর হওয়া ঠিক হবে না। গভর্নর কেস বহুভাবে শ্রীকান্তকে প্রভাবিত করে জিতি প্রদর্শন করেও তাঁর ক্রীসলীকে নড়চড় করতে পারেননি। বাঘা হয়েই গভর্নর ক্রীসলী-কে শাসনভাঙ্গের ৯৩ বাজা অনুসারে বাংলার শাসনভাঙ্গ নিয়ে গ্রহণ করতে হয়েছিল। স্বরূপ করা যেতে পারে ঠিক দু-বছর আগে ১৯৪৩ সালের ২৮ মার্চ চক্রান্ত করে কক্সবাল হুক মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগে বাধ্য করা হয়েছিল।

মিডার্স মহাবুদ্ধি শেষে নাগসী বহিনীর পরাজয়ের পর দেশে যেনে উপনিবেশিক মুক্তিসংগ্রাম জোরদার হয়ে ওঠে। ট্রিটেনে তখন প্রতিক দলের মন্ত্রিসভা। এটিই প্রধানমন্ত্রী। তারপরে নির্বাচনের কথা

প্রতিক্রিয়াশীল লিগের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনের ফলে কৃষক-প্রজা পার্টিতে ভাঙন ঘরে। কৃষক প্রজা পার্টির ২৮ জন সদস্য কৃষক প্রজা পার্টির পরিবর্তী গ্রুপ হিসাবে বিরোধী কংগ্রেস দলের সঙ্গে আসন গ্রহণ করে।

ঘোষণা হলো। ১৯৪৬ সালের এই নির্বাচন ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। মুসলিম লিগ অতীতপূর্ব সাফল্য লাভ করলো—মুসলমান ভোটারদের ৮০,৬৪৮ ভোট পেয়ে ১১৭টি আসন দখল করেছিল। অপর পক্ষে কৃষক প্রজা পার্টি নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিল ৫,০৯৮ মুসলিম ভোট পেয়ে। আসন সংখ্যা ছিল—৪। কক্সবাল হুক বিরোধী আসনে হারতেন। মুসলিম লিগ মুসলিম পবিত্র প্রদেশ পাঞ্জাব, সিঙ্ঘ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে জব্বারত করতে না পারলেও বাংলার তত্তা পেয়েছিল। বাংলার সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রিত্ব মুসলিম লিগের মন্ত্রিসভা গঠিত হলো—২৪ এপ্রিল ১৯৪৬। ১৯৪৬-এর ১৬ আগস্ট কক্সবাল হুক গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন লিগের সর্বপ্রকার বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে। ১৬ আগস্ট প্রত্যেক সংগ্রাহক নিম্নে সারা কলকাতার নারকীর হজরতগও সংঘটিত হয়েছিল। সারা বাংলার রাজনৈতিকতার বিষ হুট করে পড়েছিল। কক্সবাল হুক ১ সেপ্টেম্বর মুসলিম লিগে যোগ দিলেও সক্রিয় ছিলেন না।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট কেস ভাঙ

হয়। দেশভাঙ্গের কিছুকাল পর কক্সবাল হুক কলকাতা থেকে ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস এবং পূর্ববাংলার (পাকিস্তান) হাইকোর্টে আইন ব্যবসা শুরু করেন। পরে তিনি আফগানিস্তানে জেনারেল নিয়ুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৫৪ সালে ৮১ বছর বয়সে জাহাঙ্গীর প্রতিক কৃষক পার্টি পুনর্গঠন করেন। ওই বছরই পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লিগ বিরোধী মুক্তমন্ত্রীর কাছে পরাজিত হয়। মুক্ত মন্ত্রীর মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। কক্সবাল হুক দুখ্যমন্ত্রী হন ৪ এপ্রিল ১৯৫৪। পতীর চক্রান্তের ফলে মন্ত্রিসভা ৩০ মে খারিজ হয়। কক্সবাল হুক গৃহবন্দী হন। পূর্ব পাকিস্তানে গভর্নরের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৫ সালে কক্সবাল হুক পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হন। এবং পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। কক্সবাল হুককে ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিয়ুক্ত করা হয়। ১৯৫৮-তে অপসারিত হন। ১৯৬২ সালের ২৭ এপ্রিল ঢাকা শহুরে ৮৯ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান ঘটে। তাঁর স্মৃতিতে একটি মূর্তির পরিসংখ্যান গঠন। কক্সবাল হুকের মতো একজন মহান নেতা কিন্তুপ্রাচ্য, দুই বাংলার জনগণের মধ্যে ঐক্য-ঐম্যের প্রতীক বলে মনে করি—তাঁর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার পক্ষ থেকে ২৪ ডিসেম্বর জাহাঙ্গীর শাসন করি। পশ্চিমবঙ্গের দুখ্যমন্ত্রী বিনী বরকালের জন্য হুলগও (১৯৪৬ এপ্রিল থেকে ১৯৪৭, ১৪ আগস্ট পর্যন্ত) কক্সবাল হুকের সঙ্গে অবিভক্ত বাংলার আইনসভার সদস্য ছিলেন। ডেপুটি তখন বিরোধী আসনে বসতেন। দুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। সেদিন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কক্সবাল হুক পুত্র এ কে কক্সবাল হুক, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পটমন্ত্রী। অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। জাহাঙ্গীর এ হুক একজন মহান ব্যক্তিকে স্মরণ করতে পেয়ে গরিত।

প্রজাস্বত্ব আইনের সংস্কার : ফজলুল হক

নেপাল মজুমদার

অবিভক্ত বাংলার—ফজলুল হক
(এ কে), এক অবিভক্তবীর নাথ
এবং সতিাই এক মহৎ ব্যক্তিত্ব।

বিগত ৩০ ও ৪০-এর দশকে বাংলার
ভূমিস্বাধিকার ও ভূমি ব্যবস্থার ব্যাপক
পরিবর্তন সাধন করে কৃষক ও গ্রামীণ
গরিব মানুষের দুঃখ-কষ্টের তার লাঘবের
ক্ষেত্রে তিনি যতদূর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা
গ্রহণ করেছিলেন, সতিাই তার যেন
তুলনা নাই।

একথাও সত্যি, হকসাহেবের চরিত্রে
কিছু অসম্মতি ও বিপরীতবর্ধী প্রবণতার
সম্মেলন ঘটলেও তিনি সতিাই এক
বিশাল মাপের মানুষ ছিলেন। প্রথমদিকে
তিনি কংগ্রেস রাজনীতিতে আকৃষ্ট হয়ে
রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন।
পরে তিনি মুসলিম লিগ ও জিন্না
সাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে বাংলার
মুসলিম লিগ বল গঠনে অংশ
নিয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি
কোনদিনই অন্যান্য লিগ নেতার মতো
কটু সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠেনি। কিছুকাল
পরেই, বিশেষ করে ১৯৩৫-৩৬ সালেই
তিনি লিগের বিরুদ্ধেই জায়েদ কৃষক ও
গরিব মানুষের স্বার্থ—জমিদার ও
মহাজন শ্রেণীর বিরুদ্ধে নির্বাচনী সংগ্রামে
অবতীর্ণ হলেন।

স্বাভাবিক মুসলিম আহমদ তাঁর
গরিষ্ঠিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর 'কবি

নকল ইসলাম: 'স্বত্বিকথা' এছে
(পৃ. ১৮) লিখেছেন:

"মিটার এ কে ফজলুল হক সাহেব
একজন বিরাট প্রতিভার ব্যক্তি ছিলেন।
কিছু অল্পত অব্যবহিত চিত্তের লোকও
ছিলেন তিনি। আমায় মনে আছে
অতুলচন্দ্র গুপ্ত একদিন আমায় কথায়
কথায় বলেছিলেন যে ফজলুল হক
সাহেবের মতো একজন প্রতিভাবান লোক
যদি অব্যবহিত চিত্তের না হতেন তবে
তিনি ভারতবর্ষের সব কিছু হতে
পারতেন।"

১৯৩৭ সালের নির্বাচনের শুরুতেই
তিনি কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের সম্পূর্ণ
বিরুদ্ধে এবং বর্তমানে—জমিদার ও
মহাজনী প্রচার বা সামন্ততান্ত্রিক শোষণের
বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বাংলার
সংসদীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা
আলোড়ন তুলে দিয়ে তাঁর অভিযান শুরু
করেছিলেন। তিনি যদি তা অব্যাহত
রাখতে পারতেন তাহলে সর্বভারতীয়
সংসদীয় রাজনীতির ক্ষেত্রেও তিনি একটা
প্রকাণ্ড পরিবর্তন সাধন করতে পারতেন।
ফেন্টাও তাহলে সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে
এবং ইংরেজের চক্রান্তে দুঃখের
যেত না। তিনি যদি অব্যবহিত চিত্তের না
হতেন তাহলে সারা দেশে একটা বিরাট
কাণ্ড হতে যেতে পারত। তা সত্ত্বেও

সেবিনের তাঁর সব মহান প্রত্যঙ্গকে আত্ম
আঘাত সঙ্গত চিত্তে শব্দগত করতে পারি।

সকলেই জানেন, ১৯৩৬ সালের
এপ্রিল কংগ্রেসের ঐতিহাসিক লক্ষ্যে
অধিবেশন হওগেই সারা ভারত কিমান
সভায় প্রথম সম্মেলন হয়। তাঁর ঠিক
প্রায় তিনমাস পরেই ১১ জুলাই ফজলুল
হকের অধিনায়কত্বে ঢাকার জমীদার
কৃষক—প্রজা পার্টি চতুর্থ সম্মেলন
অনুষ্ঠিত হয়। বাংলার কৃষক আন্দোলনে
ইতিহাসে এবং নানা দিক থেকেই এই
সম্মেলনে কয়েকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ
আন্দোলনের সূচনা হয়। ফজলুল হক
পূর্বেই এই সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত
হয়েছিলেন। এ ছাড়া এ এইচ ইম্পাহানি,
খাজা নূরউদ্দীন, ডাঃ আব্দুল হক প্রমু
খ্যে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় এই সম্মেলনে
যোগদান করেছিলেন।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত কৃষক প্রজা পার্টি
এই সম্মেলনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক
হল, এই সম্মেলনে জমিদারি ও মহাজনী
প্রচার বিরুদ্ধে—এক কথায় সামন্ততান্ত্রিক
শোষণের অবসানের গতিতে বেশ
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়।
বাংলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাসের
দিক থেকে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

অজাখানা সমিতির সভাপতি ডাঃ
রফিকউদ্দীন আহমদ তাঁর অভিযানে

ভবিষ্যি প্রবাস অবসানের দাবি জানিয়ে বলেন:

“জমিদারি প্রথা প্রতি আমার আত্মী কেনে ও আত্মা নাহি। এই প্রথাকে সমাজতন্ত্রের ঊনব বিধগ্ৰেণে নাথ অতি জ্ঞান করিয়া থাকি। সুতরাং হত সত্ত্ব সত্ত্ব ভূমিদারি প্রথা বিলোপ হয়, তাহা দেশে দেশে কখনো। প্রায় পাঁচ কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে যাহা কয়েক হাজার জমিদারের পক্ষে তিন কোটি টাকা ভোগ করিবার এবং তাহাদের অধিকাংশই পুঙ্খানুপুঙ্খ বিলাসবাসনে ব্যয় করিবার ন্যস্ত কী অধিকার বহির্ভূত পাবে... আমার মতে জমিদারি প্রথা বিলোপপূর্বক সবজাতী স্বাধীনতার ঊনব টাকার দ্বারা প্রজাসামান্যের মধ্যে প্রাদেহিত শক্তি ও তাহাদের স্বায়ত্তশাসিত জন বাসোপযুক্ত পরিমাণে চিকিৎসালাভ বাড়ানো উচিত।”

তাঃ আহমদ তাঁর অভিভাষণে মহাজনী প্রথা এবং সেই সঙ্গে মহাজনী আইন ও ঋণ সালিসী বোর্ডের ভয়ে মহাজনদের গণ সৃষ্টি ও নিধা করুন। এরপর সভাপতি কক্সল হুক তাঁর ভাষণে চিরস্থায়ী ব্যবস্থার উৎপত্তি এবং তাঁর টীকা নিধা ও সমালোচনা করে তা সিন্ড্রে অবসানের দাবি জানিয়ে বলেন, “...কি জমিদারগণ অজাত্যারি ইউন আর সম্ভবই ইউন, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না, মূলত এই প্রথাই অনাশ্রয়ক। জামি এই প্রথাকে মন্থনাত্মক অশচর্যকারী বলিয়াই মনে করি। চিরস্থায়ী জমিদারি প্রথা না থাকিলে বাবা ইহা সোকে

শিল্প-ব্যবসারে টাকা খাটাইতে ইষ্ট, তাহার ফলে দেশে নিতা-নতুন গিয়া এবং লক্ষ্যজ্ঞার প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠি। লক্ষ লক্ষ যেকারের কাজ ছুটি।

প্রসঙ্গত বলা দরকার ১৯৩০ সালের বর্ষীয় মহাজনী আইন-এর অনুব্রহ্ম হিসেবেই কিছুকাল পূর্বে খাতকদের ঋণ-পরিশোধের ব্যাপারে সহায়তা করার উদ্দেশ্যেই ঋণ-সালিসী বোর্ড গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। প্রস্তাবটি এই বিধিব্যবস্থার অনেক সম্পদ ও জমিদার

(বিলের করে বর্ষীয় খাতক চাষী স্বার্থের বিক হতে) সুযোগ-সম্ভাবনা না থাকায় মানা হইল থেকে আলাদা প্রজাণ করা হয়। কক্সল হুক সাহেব এমিন তাঁর সভাপতির অভিভাষণে এই ‘ঋণ সালিসী বোর্ড’-এর কৃতি ও গলমগ্রিমির প্রীর সমালোচনা করে বলেন:

“সালিসী বোর্ড কৃষকের ঋণ দাতার ব্যাপারে কতখানি উপকার করিতে পারিবেন সে বিষয়ে আমার ব্যবহৃত সম্ভব বহিরা সিদ্ধান্তে। প্রথমত এই সালিসী বোর্ডের সদস্যবৃন্দ নিযুক্ত হইবেন মন্থনজনক হইবে। মন্থনজনিত করিবেন এস ডি ও আর তাহাদের বাহাই করিবেন বোর্ডের অধিসংরগণ, অধিকাংশ বোর্ডের অভিযায়েই স্বতন্ত্রই জমিদার ও মহাজন যেনো; সুতরাং মহাজনদের ইচ্ছিত ও উপযোগ অনুযোগ এই বিষয়ে অনেক কার্যকরী হইবে, কাজেই এমন সব লোক সালিসী বোর্ডের সদস্য হইবেন যাঁরা অধিকাংশ ঋণগ্রস্ত কৃষক প্রজাণিককে বাঁচানোর চেষ্টা করা অশেষ মহাজনদের কার্যের প্রতি লক্ষ রাখিবেন বেশি।

চিহ্নিত হইতেছে খাতক ও মহাজন উভয় শ্রেণীর লোক লইয়া সালিসী বোর্ড গঠিত হইবে। খাতক চাইবেন বাঁচিতে আর মহাজন চাইবেন তিনি বাহা নিজের জ্ঞান বলিয়া মনে করেন তাহা করার পড়ায় বৃত্তিয়া পাইতে। সুতরাং এই প্রকার অন্তত সালিসী বোর্ড কিম্বা ঋণ সমস্যার ধীমাংসা করিবে, তাহা দেখিবার বিষয়।

“সে বাহা ইউক ঋণ সালিসী বোর্ডসমূহ যদি প্রত্যেক দায়িকের মূল নোয় একটা ডায়ি অংশ ও থাক করিয়া থিরা অবশিষ্ট টাকার জন্য দীর্ঘদিনের ফিত্তিকদীর ব্যবস্থা করিয়াও যেন, তাহা হইলেও নিরুপস্থিত ব্যবস্থা গ্ৰহণকর না করা পর্যন্ত কৃষক-প্রজাণের অস্ত্র।” বলা পূর্বে তথা পরে-ই ব্যক্তিগত বাহিবে।

প্রথমত প্রত্যেক কৃষকের দায়ার পর অবশিষ্ট যে ঋণ থাকিয়া বাহিবে তাহা পরিশোধ করিবার এবং ভবিষ্যতে অল্প

সুখে ও সঙ্গে তাহারা বাহাতে আবশ্যকীয় সময় টাকা ধার পায় সে দায়িত্ব গভর্নমেন্টকেই লইতে হইবে। ...পতরুণা বার্ষিক আড়াই টাকা সুখে গভর্নমেন্ট যখন-তখন কোটি কোটি টাকা ধার পাইতেছেন। সুতরাং দেশ সমাজ ও তন্ত্র স্বরণ কৃষক সমাজকে রক্ষার জন্য গভর্নমেন্ট যদি পতরুণা আড়াই টাকা সুখে গভর্ন-পাট কোটি টাকা কর্ষ করেন এবং সেই টাকা পতরুণা বার্ষিক অনূর্ধ্ব চার টাকা সুখে কৃষক প্রত্যেক কর্ষ বিহার ব্যবস্থা করেন, তবেই কৃষক প্রজা ঋণমুক্ত হইবে এবং ভবিষ্যতে কিছু সুখের মুখ দেখিতে সমর্থ হইবে।”

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য টাকা সংঘদনে ডাঃ বকি আমেন এবং হুক-সাহেবের এই ঐতিহাসিক ডাকপত্র প্রায় পূর্ণাঙ্গ বহানটি সমসাময়িক জানমব্যাকার পত্রিকা (২৮ আর্চ ১৯৪৩।। জুলাই ১৯৩৬) প্রকাশিত হয়। পরদিন জানমব্যাকার প্রকাশ সম্পাদকীয় নিবন্ধে হুক সাহেবের এই ঐতিহাসিক ভাষণের সঙ্গ্রহস উল্লেখ এবং বৈলিষ্ট্যও আলোচনা করা হয়। কয়েকদিন পর—২৪ জুলাই, টাকা সংঘদনে গৃহীত প্রস্তাবানিও “জানমব্যাকার পত্রিকা” প্রকাশিত হয়।

লক্ষ্যীয়, সেদিন ভারতের কেলও প্রদেশেরই কংগ্রেস নেতারা জাঁদের নির্বাচনী ইচ্ছাত্মক জমিদারি প্রথা উচ্ছেদকেই প্রধান দাবি করে দোষণ করতে পারেন নি।

উল্লেখযোগ্য, এর প্রায় ৯ মাস পরে—২৭ ও ২৮ মার্চ ১৯৩৭ সালে ‘বর্ষীয় কৃষক সভার’ প্রথম সংমেলন হয়। সুতরাং সেমিক থেকেও টাকা প্রজা সংঘদনের গৃহীত প্রস্তাবানি কত গুরুত্বপূর্ণ নয়। টাকার অনুষ্ঠিত নিঃ বঃ প্রজা সংঘদনের যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়, নিম্নে তার সারমর্ম নেওয়া হল:

“প্রথম প্রস্তাব: নিঃ বঃ প্রজা সমিতির ১৮ নং প্রস্তাব অনুসারে জামি নির্বাচন প্রজা সমিতি বাংলার সমস্ত সমাজগণ খাসন অধিকার করিয়া

বায়স্থাপক সভার প্রথম পাঁচ বৎসরের জীবনেই নিম্নলিখিত কার্য করিবার চেষ্টা করিবে:

- ১। নিঃ বঃ প্রজা সমিতির নিয়মাবলীর ৬ ধারায় বলা হইয়াছে—“এই সমিতি বিশ্বাস করেন যে বর্তমানের জমিদারি প্রথা (জিহাদারী বন্দোবস্ত) সর্বতোভাবে অন্যায়, অসঙ্গত ও দেশের পক্ষে অমঙ্গলজনক এবং জনসাধারণের মঙ্গলের জন্যই এই প্রথা অচিরে রহিত করিয়া দেওয়াই আবশ্যক। নিঃ বঃ প্রজা সমিতির পক্ষ হইতে নিবন্ধিত সদস্যদের প্রথম উদ্যম হইবে, উপরোক্ত ব্যাপকে কার্যে পরিণত করিয়া ও তৎসঙ্গে উক্ত টাকা জনসাধারণের কল্যাণে শিলা, স্থায় ও কুটিরশিল্পের উন্নতিকল্পে ‘ইয়ার ঘাট’ করা।
- ২। “আইনগত অনাধিক অসুবিধার জন্য উপরোক্ত কার্যক্রম সকল করার বিলম্ব হইলে প্রজা প্রতিনিমিষ নিমিল বহু প্রজা সমিতির নির্দেশ দ্বারা আবৃত্ত কর্তব্য হিসাবে নিম্নলিখিত সংশ্লিষ্টমূলক কার্যক্রম অবলম্বন করিবে।
- ৩। “কুমিল্পে বাহাতে কৃষক প্রজার স্থায়ী-মালিকানা স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, অত্যাচার ব্যবস্থা করা।
- ৪। “নিম্নলিখিত বিষয় সপক্ষে প্রতি লক্ষ রাখিয়া ‘প্রজাবহু আইনের’ আদুল সংশোধন করা।
- (ক) নজর সেলামি প্রচার উচ্ছেদ।
- (খ) জমিদারের অগ্রদূতের ক্ষমতা রহিত।
- (গ) বিনা খরচে জন্য খরিজের ব্যবস্থা।
- (ঘ) বাজনার নিষিদ্ধ হ্রাস।
- (ঙ) সর্বপ্রকার আতংক্য রহিত করা।
- ৫। “বাংলায় কৃষক প্রজা-সাধারণের জল সমস্যার সমাধান করিবার জন্য পৰ্বতমৈত্রী বাহাতে অল্প সূদে

আবশ্যক পরিদ্রাশ টাকা এবং কৃষক-প্রজাব কিংবা ক্ষমতা বিচারে রক্ষা করিয়া রক্ষা হতে পরিণোয় করিবার জন্য বাংলায় কৃষকবিশিষ্ট পতকস্বা স্বাধিক জলবিক ৪ টাকা সূদে লভা মেঘাবি ধার বিচার বর্তমানে অগদ্য হইতে দূরত্ব করেন অত্যাচার ব্যবস্থা করা।”
বাংলাদেশে বাণ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা অচিরে প্রবর্তন করা।

- ৬। পাট শুভ ব্যবহ যে ৬ কোটি টাকা সরকার আদায় করিতেছেন তাহার সমস্ত টাকা কৃষক প্রজাব দ্বারা ও কৃষি উন্নতির জন্য ‘ইয়ার ঘাট’ করা।
- ৭। পাট চাষ নিয়ন্ত্রণ ও পাট উৎপাদন কৃষকের হাণ্ডে লাভজনক করিয়া পাটের সর্বনিম্ন মূল্য নিধারণ এবং অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।
- ৮। হাজা-মজা নদী-নালায় সংস্থার করিয়া বাংলায় জমির উর্বরা-শক্তি বৃদ্ধি করিয়া কৃষির উৎকর্ষ সাধন, বাসিন্দার প্রসার ও বাহ্যের উন্নতি বিধান করা।
- ৯। “বাংলায় শাসনকার্যের ব্যবস্থার এইভাবে কর্মহীতে হইবে বাহাতে সর্বোচ্চ কর্মচারীর বেতন হাজার টাকার অধিক না হয়।”
বলা হয় কার্যকরী সমিতি আবশ্যকবোধে উক্ত প্রোগ্রাম পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিতে পারিবে।
- নিম্নী প্রস্তাব ছিল সাংসদগণিক ব্যাপারে। এ সম্পর্কে প্রস্তাবে বলা হয় ‘নিঃ বঃ প্রজা সমিতি এবং সত্ত্বিকারের কৃষক সমিতি ভিন্ন অন্যান্য প্রতিষ্ঠান প্রজা সাধারণের ভিতরে ছান পাইতে না পারে তজ্জন্য সচেষ্ট হইবেন।’
কৃষী প্রস্তাবে বলা হয় :
“বর্তমান যোগ বুধিমে নতুন জমাবখীর জন্য যে সকল খাসমহল জরিপ হইতেছে সেই সকল খাস মহলের

কমা বাহাতে বৃদ্ধি না হয় তজ্জন্য এই সংস্থার পৰ্বতমৈত্রীতে সনির্ভর অনুবোধ করিতেছে। খাসমহল সমূহের যে সকল জমিতে বন্যা প্রকৃতির দরুন ফসল নষ্ট হইয়া যায় সেই সকল জমির খাজনা সন্ততঃক্ষেপ হ্রাস করার জন্য এই সংস্থার পৰ্বতমৈত্রীতে বিশেষ অনুবোধ করিতেছে।”

চতুর্থ প্রস্তাবে কলকাতা হতে সমিতির দুখপত্র (বাংলায়) সাপ্তাহিক বাহিৰ কবাব করা বলা হয়।

পঞ্চম প্রস্তাব : নির্বাচনের ব্যাপারে সর্বোচ্চ কর্মচারীরা বাহাতে বিকল্প প্রচাব বা জার করতে না পারে।

ষষ্ঠ প্রস্তাব : বেঙ্গল বর্তমান আর্থিক দুর্বাবস্থার নিরুত্তর করিয়া এ সমিতির প্রস্তাব করিতেছে যে সমস্ত স্থল ও ফসলের হাণ্ডেবতন বর্তমান হাণ্ডের অর্থে করা হউক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধিত পাঠ্যপুস্তকের মূল্য, পতীকা কি অনুদ্রপভাবে হ্রাস করা হউক এবং তদন্তে স্থল ফসলের ও ব্যাঙ্গাসার আয়ের যে ক্ষতি হইবে তাহা পৰ্বতমৈত্রী পূরণ করুন।”

সপ্তম প্রস্তাবটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ :
“যে হেতু বাংলায় চাষের জমি চতুর্থে অকৃষকদের হাণ্ডে চলিয়া যাওয়ার ফলে যেমন কৃষকসকল নিজ নিজ জমিতে স্বত্ব হ্রাবহীতা বিনয়দ্বারা পরিণত হইতেছে, সেই হেতু এই সংস্থার পুতাব সমূহ এই অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে, আগামী আসন্নবসিতে এইজন একটি আইন প্রণয়ন করিতে হইবে যে কোনও কারখানি চাষের জমি কৃষকের হাণ্ড হইতে অকৃষকের হাণ্ডে স্থায়ীভাবে হস্তান্তরিত হইতে না পারে।”

৮ নং এবং ৯ নং প্রস্তাবটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক এবং লক্ষণীয়ও হইবে। এই দুই প্রস্তাবে ঢাকার নবাবের এন্টেন্টের প্রজাদের উপর অন্যান্য ও শীড়নমূলক বাজনার সূচ আদায় ইত্যাদি

প্রতিবন্ধ জানিয়ে তা প্রত্যাখ্যেব কবি
জানানো হয়।

১ নং প্রস্তাবটি ছিল এই:

“রক্তাব নবাব এন্ট্রিটের জমিদারি ‘কোট
অব ওয়ারেন্ট’ দিয়েছে। উক্ত জমিদারি
মধ্যে যে সমস্ত প্রজা আছে তাহাদের
মিষ্টাৎ ব্যক্তনাব টাকা প্রতি ছয় ডানা
প্রতি সুদ আদায় করা হয়। তাহাদের জন্য
প্রজাপণ রাখনা দিতে না পারায় এবং
অন্যান্য দ্বায়ে সারিতিফিক্ট করিয়া উক্ত
প্রজাদের (জমি) এইরূপে মিলার করত
প্রজাদের দেশ ছাড় করা হইতহয়।

অতএব এই সম্বন্ধের উক্ত সুদ
উঠাইয়া দিবার জন্য নবাব বাহাদুর ও
এন্ট্রিটের চীফ ম্যানেজার সাহেবকে
অনুরোধ করিতেহয়।”

২ নং প্রস্তাব ছিল “রক্তার
মিউনিসিপালিটির বেট পেয়াবনের প্রতি
ফলুম বাহাতে বদ্ধ করা হয়।”

এই সম্বন্ধের ১০ ও ১১ নং
প্রস্তাবটি ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১০
নং প্রস্তাবে প্রচার জোত বর্ধনের অর্থাৎ
অধিকার এবং জমিদারের অপ্রজ্ঞাবিকার
এবং ব্যক্তি কি, নজর সেলামি ইত্যাদি
ব্যব করার কবি জানান হয়। ১০ নং
প্রস্তাবটি ছিল এই:

“প্রজা সাধারণের মধ্যে বাহাদুর
এজমালি জোতের অংশীদার, তাহাদের
যে কোষ বিনা নজর বীর অংশ বাহাতে
ব্যক্তি কবিল করিতে পারে তজ্জন্য এই
সভা গর্ভনমেটকে অনুমোদন
জানাইতহয়।”

১১ নং প্রস্তাবটি ছিল এই:

(১) (ক) “সাধারণভাবে স্বধী
ব্যক্তির পুরাতন ধনের সমস্ত সুদ দ্রাক
করিয়া আসল টাকার উপ বর্ধিত
অনুশ্রুতে আসল সাব্যস্তক্ৰমে কিস্তিবধী
হারে আদায়ের ব্যবস্থা করা।

(খ) দেশের বর্তমান শোষণমূলক
মহাজনী প্রথা রহিত করিয়া দেশের ধন
উৎপাদনকারী কৃষক ও শিল্পবিদগকে
নামকরা সুদে প্রয়োজন অনুশ্রুতে টাকা

দেওয়া বিধিত সবকারি ‘কৃষি ব্যাঙ্ক’
প্রতিষ্ঠা করা।”

(২) “দেশের ধনবৃদ্ধির জন্য
উৎপাদিত কাঁচামালকে শিল্পজাত পাকা
মাল পণিবৃত্ত করিতে সরকারি সাহায্যে
উৎকৃষ্ট কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান
সংস্থাপিত করা।

(৩) “কৃষক বা অন্যান্য শ্রেণীর
কর্মহীন ব্যক্তিগণের উপযুক্ত কাজের
সুব্যবস্থা করিয়া বেকার সমস্যার সমাধান
করা



এইসকট ফকরুল হক

উন্নয়নযোগ্য, ঢাকা সম্বন্ধের এইসব
প্রস্তাবের ভিত্তিতেই অল্পকাল পরেই
‘কৃষক-প্রজা পার্টি’র নির্বাচনী ইস্তহার
রচিত হয়। এখানে যেটা বিশেষভাবে
লক্ষণীয়, বাংলায় বহুরাশনক পর হক
সাহেবের নেতৃত্বে মন্ত্রি রচিত হওয়ার
পর ঢাকা সম্বন্ধের পৃথীত করেকটি মূল
প্রস্তাব (বিশেষ করে ‘স্বধী প্রজাবহ
আইনের এবং ‘মহাজনী
আইন-সংকাত’) কার্যে পরিণত করে হক
সাহেব বাংলায় কৃষক ও গ্রামীন রহিব
মানুষদের নিশ্চিত করেসে হাত থেকে
হকা করে এক ঊতিহাস সৃষ্টি করলেন।
ছত্র গাথা দরকার, সে-সময় কংগ্রেস
শাসিত ৭টি প্রদেশে কংগ্রেস কোথাও
কৃষকের স্বার্থে এষ্টকুণ্ড গণতান্ত্রিক

ভূমিসংস্কার আইন প্রবর্তন করতে
পারেনি, উমটে কৃষক ও গ্রামিকদের
ওপর লাঠি ও গ্রাসি চালিয়ে দমন করার
চেষ্টা করেছিল তারা।

প্রসঙ্গত বলা সবকার, ১৯৩২ সালের
‘ভারত শাসন-সংস্কার আইন’টি ১৯৩৭
সালের ১ এপ্রিল হতে কার্যকর হয়।

১৯৩৭ সালের জানুয়ারির শেষে
নির্বাচনের শেষ হয়। নির্বাচনে অরহ্য
কংগ্রেস প্রার্থীরা বিশুল সংখ্যায় জয়লাভ
করে। মোট ১১টি প্রদেশের মধ্যে

কংগ্রেস ৬টিতে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল
হিসেবে জয়লাভ করে। মুসলিম লিগ দল
কিছু নির্বাচনে ভেদন সুবিধা করতে
পারেননি। গাঞ্জাব ও সিন্ধুতেও মুসলিম
লিগের শোচনীয় পরাজয় ঘটে, কেবল
বাংলায় আণেজিকভাবে কিছুটা সাফল্য
লাভ করে। বাংলাদেশে অরহ্য সবচেয়ে
মর্যাদা লাভই চলেছিল উত্তর পটুয়াখালি
নির্বাচন কেন্দ্রে।—সেখানে কৃষক প্রজা
পার্টির নেতা ফকরুল হকের কাছে
মুসলিম লিগের খাজা নাজিমুদ্দিন
শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করেন।
কংগ্রেস অরহ্য বাংলায় মোট ২৫০টি
আসনের মধ্যে ৪৪টি আসন লাভ করে।
নির্বাচনে সাফল্য লাভের পর কংগ্রেসের
অভ্যন্তরেই মন্ত্রি গ্রহণের প্রেরে তীব্র
মতপার্থক্য ও তর্ক বিতর্ক শুরু হয়।

কংগ্রেসের এই অভ্যন্তরীণ বা
অভ্যর্থিবোধের সুযোগে গর্ভনমেট
সংখ্যালব্ধ ও অন্যান্য সুবিধাবাদী
সদস্যদের নিয়ে বিভিন্ন প্রদেশে
অন্তর্বর্তীকালীন ‘ঐক মন্ত্রিসভা’
(ad-interim ministries) গঠন করতে
থাকে। বাংলাদেশে নবীনীরজন সরকার,
কলিমবাজারের খাজা প্রীশচন্দ্র নন্দী,
ঢাকার নবাব, সাহাব বিজয়প্রসাদ সিংহরায়
শ্রব্ধ রাজানুগ্রহীনের নিয়ে ফকরুল হক
ও মুসলিম লিগ নেতা খাজা নাজিমুদ্দিন
সাহেবের এক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা
গঠিত হয়। বলা দরকার, নির্বাচনের
পরেই কৃষক-প্রজা পার্টি নেতা ফকরুল
হক ও নাজিমুদ্দিন সাহেবের মধ্যে মন্ত্রি

পারেন। প্রসঙ্গ এক মাত্রতা হয়।

বাংলায় বাঙালিদের উপস্থিতি এ এক লক্ষ্য দৃষ্টব্য এবং নির্দিষ্ট পরিচয়ও বটে। যে ১৮৮৭-৯৩ সালের নির্বাচনে মুসলিম লিগের বিজয়ী হীর প্রতিনিধিত্ব বা প্রতিনিধিত্ব। তবে উক্ত স্টাফার্স নির্বাচন কেন্দ্রে লিগ নেতা খাজা নাজিমুদ্দিন সাহেবকে বিশুদ্ধ ভোটের ব্যবস্থানে পরাজিত করলেন, খানসামানের মধ্যে তিনিই আবার মুসলিম লিগ ফলের সঙ্গে মিশ্রিত গঠনের ব্যাপারে সত্যতা করলেন। প্রত্যক্ষভাবে না-হলেও অত্যন্ত পরোক্ষভাবে কংগ্রেসই এখানে গতি।

নির্বাচনের পর হুক সাহেব কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের আশ্রয় প্রকাশ করেন। কিন্তু কংগ্রেস কোয়ালিশন তো কবেই কলা, কংগ্রেস আদৌ মন্ত্রিত্ব গঠন কবেই কিনা ভুলের সঙ্গে পরিচয় কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি। ফলে প্রকৃতভাবে কংগ্রেস হুক সাহেবকে মুসলিম লিগের সত্যতাতে দিকেই ঠেলে দেয়। পরে কংগ্রেস সেই-ই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করে কয়েকটি প্রদেশে, কিন্তু কংগ্রেস হাইকমান্ড বাংলায় কংগ্রেসকে হুক সাহেবের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিত্ব গঠনের অনুমতি দেয়নি।

প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য, নির্বাচনের মাসখানেক পর ২৪ ফেব্রুয়ারি, বাংলার মুসলিম লিগ নেতা ঢাকার নবাব ও প্রজা পার্লি নেতা ফজলুল হক সাহেবের এক আঁতড়ানের পর উভয়ের দৃষ্টি স্বাক্ষরিত এক বিবৃতি প্রচারিত হয়। তাতে কৃষকের স্বার্থে কৃষি ভর, স্বাভাবিক, প্রজাব্যবস্থার আইনের এবং স্বাভাবিক ও শ্রমিক চাকী (Agricultural Debtor's Act) পক্ষে আইন প্রণয়ন প্রকৃতি ১৪ দফা দাবি সংশ্লিষ্ট এক সংসদীয় চুক্তির কাজো ঘোষণা করা হয়। এই বিবৃতির শেষে অন্যান্য মুসলিম সদস্যদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানিয়ে (A. B. P.—Feb 24, 1937) বলা হয় :

...“the leaders of the League and the Proja Parties had

decided to cooperate under the leadership of Mr. A. K. Fajlul Huq for the purpose of working the constitution and as a result of discussions had arrived at an agreement subject to the ratification of the parties. Both the parties have since met and ratified the agreement”

যেটা বিশেষভাবে লক্ষণীয়, এই বিবৃতিতে কাউন্সিল বা বিধানসভার আসন বন্টন এবং ঢাকার ব্যাবস্থিতে হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদির নাম সাম্প্রদায়িক ভাব-বৈতনিক (কুটিলতার) ঘোষণা করা হয়নি। স্বতন্ত্র বাবা দরকার, এর অর্থ কিছুদিন আগে জানুয়ারির প্রথমভাগে, বর্ষমানের ঘটনাজ্ঞা ও স্যার হামিম গজলী হিন্দু-মুসলমান মিলনের বা ঐক্যের এক পরিকল্পনা তৈরি হলেন। লক্ষ্যমাত্রা ৫০% এই হারে সরকারি চাকুরি ভাণ্ডারের নতুনই নাকি তাঁরা হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের এই ধর্মমুখার উদ্ভাবন করেন। ‘ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন’ এবং ‘হিন্দু মহাসভা’ দল এই ভিন্ন প্রস্তুত হবার পূর্বেই তা অনুমোদন করে ফেললেন। এমনকি অধ্যাপক গাধাকুন্দ মুখার্জিও এই প্যাক্টের একজন বড় মটক ছিলেন।

আগেই বলেছি, মুসলিম লিগ নেতা ঢাকার নবাব এবং ফজলুল হক সাহেবের মধ্যে যে সংসদীয় আঁতড়ানের চুক্তি হয় তাতে সুশীলভায়ে প্রথমেই ‘Reform of Revenue system, and Permanent Settlement Act, Amendment of Bengal Tenancy Act and Agricultural Debtors interest etc.—স্বাধিক সংস্কারের প্রতিশ্রুতি বা আশ্বাসের কথা ছিল।

এই বিবৃতিতে এই কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার বিভিন্ন মহাবল্লভী সকল মুসলিম সম্প্রদায়কে যোগদান করে যেপের জনগণের স্বার্থে কাজ করবার আহ্বান জানিয়ে (A. B. P. Feb 24, 1937) বলা হয় :

“...We hope that now that the Coalition has afforded an opportunity for Muslims to unite on a common platform, the Muslim members of the Assembly of all shades of political thought and opinion will join the coalition and work together in all matters for the good and prosperity of the people.”

১১ মার্চ (১৯৩৭) হুক সাহেব তখনই এই ‘কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা’র প্রধান কয়েকজনকে নাম ঘোষণা করেন। তিনি অবশ্য কলিমঝাকারের মহাবাজা ও সাহাব বিজয়প্রসাদ সিংহের, মলিনীবল্লভ সরকার প্রমুখ কয়েকজন প্রজাবল্লভী ‘হিন্দু নেতা’-কে তাঁর ক্যাবিনেটে নেন। ইতিমধ্যে নাজিমুদ্দিন সাহেবও উপনির্বাচনে উত্তর জলকাতা কেন্দ্রে থেকে জলোত্ত (২৬ ফেব্রুয়ারি ‘৩৭) করেন। উল্লেখযোগ্য, স্বয়ং এইচ এস সুবাবর্দী সাহেব উক্ত কেন্দ্রে থেকে পরাজিত করে নাজিমুদ্দিন সাহেবকে ক্যাবিনেটে আসার সুযোগ করে দেন। খাজা সাহেবের ভাগে পড়ে—আইন ও পৃথক, হুকসাহেব—শিক্ষা, মলিনীবল্লভ—অর্থ, বিজয়প্রসাদ—স্বাস্থ্য, ঢাকার নবাব বাহাদুর—কৃষি ও শিল্প, কলিমঝাকারের মহাবাজা—যোগাযোগ ও পুর্ন; সুবাবর্দী সাহেব—বাণিজ্য ও শ্রম, নবাব মুশাব্ব হোসেন—বিদ্যা, মৌলভে অলি—হানীদ স্বাধীনগণ, সি ডি বাহদুর—আবগারি ও জনবিভাগ, এম বি মল্লিক—কো-অপারেটিভ গণ এবং প্রতীক গণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বাংলায় তৎকালীন তথাকথিত বড় বড় ‘জাতীয়তাবাদী’ মৈনিক পরগুলি প্রায় একযোগে এর বিজয়ী হীর সমালোচনা শুরু করে। ১ এপ্রিল হুক-মন্ত্রিসভার এই বহুতর-বটনের বিজয়ী হীর সমালোচনা করে Amrita Bazar Patrika বড় বড় হুকে এই বিরোদ্যম দিয়ে লিখলেন : “Muslim Raj” in Bengal Complete, Division of Portfolios :

All Nation-building Departments go to Muslims: Hindu Ministers offered Inferior Portfolios in the Cabinet ইত্যাদি—এর থেকে আমাদের তৎকালীন তথাকথিত ‘জাতীয়তাবাদী’ মৈনিকপত্র ‘গুলিবি চিত্রা ও দৃষ্টিভঙ্গি’ বহুপাঠির একটা চিত্র পাওয়া যায়: হকসাহেব অথবা তার উপযুক্ত ভাব্যর মেন। এমনিই মস্তিষ্কের লম্বা প্রহরের পর তিনি এসব পত্র-পত্রিকায় উল্লেখ করেন (A. B. P. April 3, 1937)

“I notice in the newspapers that there are apprehensions of a Muslim ‘raj’ or Hindu ‘raj’ here and there, but I take this opportunity of emphasizing the fact that there can no more be a Muslim ‘raj’ in Bengal than there can be a Hindu ‘raj’ in Bihar or the United provinces. Everywhere it will be the British ‘raj’ with this distinctive feature from province to province that in some cases the agency of administration will be mostly Muslim and in other cases mostly Hindu. But the ideals throughout will be the British ideals of administration.”

এমন নির্মম খাতের সত্যটা হকসাহেব চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও আমাদের তথাকথিত ‘জাতীয়তাবাদী’ পত্রিকাগুলি তাবের সত্ত্বেও তিরে পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না। শুধু কেউই তাঁরা হক-মন্ত্রিসভার বিকল্পে তাঁর আত্মনয়ন মেনে চলেছিলেন। এই প্রসঙ্গে ‘হুদুদ বাফা দফকার, সে-সময় বাম-বামে সাম্প্রদায়িক-অসাম্প্রদায়িক দল-নির্ভিৎসেই ধরাই বিধানসভায় বা মন্ত্রিব্রহ্মণ্ডের লম্বা প্রহণ করতেন তাঁদের সকলকেই তৎকালীন ব্রিটিশ রাজের আনুগত্য এবং স্বার্থভাবের লম্বা বাঁকা পাঠ করে তা নিতে হত, সেটি ছিল এই:

“I having been elected a member of the Bengal Legislative Assembly do solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King George the Sixth, Emperor of India, His heirs and successors, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.”—এই আনুগত্য বা Oath of allegiance ছাড়াও নতুন প্রহণ এবং



হুদুদ বাফা দফকার:

মন্ত্রগুপ্তির (Oath of Office and Oath of Secrecy) লগধর্যাকা পাঠ করে নিতে হত।

তবে মন্ত্রিকের নতুন-বটনে নিট লাভ হল, অথবা-সুখা ও রাজা-রাজত্বের;—এক রকম কারোআনাই পড়ল তাদের ভাগে। এ নিয়ে শুধু বিজোদী কংগ্রেস সদস্য এবং বামপন্থী দলগুলিরই নয়,—‘কৃষকসভা’ এবং খোদ ‘কৃষক-প্রজা পার্টি’ অতান্তের খুবই ক্ষোভ ও অসন্তোষ পেয়া যায়। শুধু নতুন বটনে নিজেই নয়,—নির্বাসী প্রতিদ্বন্দ্বি অনুবাদী ‘প্রজাবহু আইন’ ও ‘মহাজানী আইন’ প্রভৃতির সংগ্রাম বিল অবিলম্বে উপাধন করার জন্য সাজা ও ভাঙ্গী কৃষক নেতৃত্বের

সঙ্গে হক-সাহেবের কিছুটা হত পার্থক্য হয়। হকসাহেব এ যোগ্যে কিছুটা ‘বদ-মত’ বা ধীরে অগ্রসব হওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। বস্তুত, হকসাহেব এক বিধম সংকটের বা উত্তরসংকটের মধ্যে পড়েছিলেন।

আর কংগ্রেস বাংলায় মন্ত্রিব্রহ্মণ্ডে—তাঁর দলের সঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিব্রহ্মণ্ডে অনুপ্রাণণ হওয়াতে হকসাহেবের এই সংকটে চরম অনিশ্চয়তা ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তিনি দেখলেন, খাতের সত্যকে অস্বীকার করাটা হতে চরম দুখানি। মুসলিম লিগ ও মলিনীযজ্ঞন এবং সাব বিভাজনপ্রসঙ্গের মতো সদস্যদের অতিউচা অস্বীকার করবেন কী করে? negative বা নেতিবাচক পন্থা নিলে মন্ত্রিব্রহ্মণ্ডে ইত্থতা ঘিতে হয়, অথবা ওই কোয়ালিশন মন্ত্রিসভাকে নিয়েই কার্যেদ্ধার বা সামন্ততন্ত্র-বিখ্যাতী প্রগতিশীল আইন সংস্কারগুলিকে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করতে হয়। বলাবাহুল্য, হকসাহেব এই পোষাক পন্থায় অগ্রসব হতে চেয়েছিলেন। আর ঐতিহাসিক সত্যের দৃষ্টিতে বিচার করলে বলতে হয়: সামগ্রিকভাবে হকসাহেবই এইদিকে সাক্ষালাভ করেছিলেন—বাংলার কৃষকরাও উপকৃত হয়েছিলেন।

আগেই বলেছি, ইতিমধ্যে প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা মুহম্মদ আহমদ ও বিভিন্ন মুখার্জ প্রমুখের নেতৃত্বে ‘বহীরা প্রাদেশিক কৃষক সভা’ বিপুল উন্মাদে পুনর্গঠিত (সারা ভারত বিধান সভা-এ অম হিসেবে) হতে থাকে। হক-মন্ত্রিসভা গঠিত হবার প্রায় এক পক্ষকাল আগে (২৭ ও ২৮ মার্চ ১৯৩৭) বাঁকুড়া জেলার গারোসপুরে প্রাদেশিক কৃষকসভার প্রথম সম্মেলন হয়। এর পরই, কৃষকসভাকে কেন্দ্রীভূত কৃষক সংগঠন হিসেবে গড়ে জেলার জন্য ‘কৃষক প্রজা পার্টি’-সহ সকল কৃষক সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত করার উদ্যোগ চলতে থাকে। কৃষকের স্বার্থে নানা

আইনের সংগ্রহ ও বিবিক্ত করার জন্য
ডক-মগ্রিসভার লব চাপ সৃষ্টি করার জন্য
আন্দোলন চলেতে থাকে। এই উদ্দেশ্যে '১
সেন্টেম্বর, সারা দেশে 'কৃষক ফিস'
পালনের আহ্বান জানান হয়। ওইদিন
কলকাতায় বিভিন্ন কৃষক সংগঠনের
সংলগ্ন মিছিল এবং এলবার্ট হলে
জনসভায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব
পৃষ্ঠিত হয়। পরদিন—২ সেপ্টেম্বর,
'নিখিল ভারত কৃষক ফিসের কলকাতায়
জনসভা'—এই শিরোনামে 'আনন্দবাজার
পত্রিকা'-র এই সভার বিস্তারিত বিবরণ
প্রকাশিত হয়। এতে কয়েকটি মূল্যবান
তথ্য পাওয়া যায়। সেটি ছিল এই:

"নিঃ তা: কৃষক ফিস পালন
উল্লেখ গত কৃষকের কলিকাতায়,
'এলবার্ট হলে' ব: প্রাঃ কৃষকসভা এবং
ব: প্রাঃ কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে এক
বিরাট জনসভা হয়। সভাপণে 'কৃষকদের
প্রতিক্রিয়া ভাল-ভারত বাও', 'স্যাঁফিকটে,
উজ্জয় ও রেণ্ডার বন্ধ কর', 'বিনা
খোদারতে জমিদারি প্রথা উঠাও', 'বাঁকি
বাঁকনা ও বণ মকুব কর', 'বাঁকনার দ্বার
লভকরা ৫০% ভাগ হ্রাস কর',
'রাজবন্দীরের মুক্তি বাও'—প্রভৃতি দাবি
লিখিত ব: পোষ্টার দেয়া যায়। নিবাচিত
সভাপতি বন্দী ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য
কার্যবলত বহাসময়ে উপস্থিত হইতে না
পায়ার বোয়াদালির কৃষক কর্মী মি:
নাসির আমেদ উইঞা সভাপতিত্ব করেন।
অবশ্য অল্পকাল পরে নিবাচিত সভাপতি
মৈয়নসিংহের বিশিষ্ট কৃষক নেতা ও
ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য বো: আব্দুল
রসিদ খাঁ বোঝানেশ্বরী সভার কার্য
পরিচালনা করেন। নীচায়েশু দত্ত
মহম্মদপুর, আব্দুল রসিদ খাঁ, শিবনাথ
হানাকি, বখিম মুখাশি প্রমুখ বক্তৃতা
করেন। সভার চর্যটি সিদ্ধান্ত পৃষ্ঠিত হয়।
তদ্রূপে:

"জমিদারি প্রথার বিনা খোদারতে
বিলোপসাধন, লভকরা ৫০ ভাগ ছাড়নার
হ্রাসকরণ, দীর্ঘদিনের কিস্তিতে বাঁকি-
বাঁকনা, বাঁকি রাজস্ব ও বণ-পরিষোধের

ব্যবস্থা; বিনা বহতে ও বিনা টায়ে
প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন, প্রজাস্ব
আইনের আয়ুস পরিবর্তন, বাঁকনা বাকিব
কনা স্যাঁফিকটে উজ্জয় ও রেণ্ডার
উগ্রাধি অবিলম্বে বন্ধ করা, বাবতীর বিনা
বিচারে আশঙ্ক, অস্ত্রধীন ও অন্যান্য
ব্যাকনৈতিক বন্দীয়েব বিনা সার্ভে মুক্তিলাভ
এবং বাবতীর বহনমূলক আইন
প্রত্যাহার।"

তবে ওইদিনই সংবাদপত্রে "প্রজাস্ব
আইন সংশোধন বিল: অসংখ্যা
ক্রটি-বিচ্ছাতি" এই শিরোনামে এই
সংবাদটি বড় হবকে প্রকাশিত
হয়।—অর্থাৎ বিলটি উত্থাপনের জন্য
মগ্রিসভার পেশ করা হয়েছিল। কয়েকদিন
আগে,—২৪ আগস্ট (১৯৩৭)
রাজস্বমগ্রি সাব্য বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়
বহুং এই মর্মে আদ্যাস দান করলে,
পরদিন সে বহবও সংবাদপত্রে প্রকাশিত
হয়। লভগীত, এলবার্ট হলেব জনসভায়
য়েসব প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়—সেগুলি
নতুন কিছু নয়—১৯৩৬ প্রজা সম্মেলনে
হক-সায়েহেব নেতৃত্বে এর প্রায় সব
দাবিই পৃষ্ঠিত হয়েছিল।

অবশ্য কৌশলগত বিক বেঁকেও
হকসায়েব কিছু ভুল করেছিলেন। যার
জন্য কৃষক প্রজা পার্টিসি জমী ও
নেতৃত্বানীর কিছু সদস্যের সঙ্গে তাঁর
মনাত্তর হটেছিল। বিশেষ করে,
সাহসুন্দীর আমেদ ও নৌপের আলির
মতো নেতৃত্বানীরদের তিনি বেশ কিছুটা
বিরোধী করে তুলেছিলেন। নৌপের
আলি এই সময় উত্তেজনার বুকে মগ্রিসভা
বেঁকে পদভ্রাস করে বসেন। সাহসুন্দীর
আমেদ ছিলেন, কৃষক আন্দোলনের
অভিজ্ঞ ও সাজা নেতা; 'কৃষকপ্রজা
পার্টিসি' তিনি সম্পাদক ছিলেন। তিনিও
এই সময় হকসায়েহেব বিলকে ব্যবাবাহিক
প্রতিক্রিতি উজ্জয় অভিবোধ এনে
সংবাদপত্রে (৮ সেপ্টেম্বর '৩৭) বিবৃতি
সেন।

এই রকম একটা উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থার
হবেই স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়

ব্যবস্থা পরিষদের বঃ প্রজাস্ব আইনের
সংশোধন বিলটি' সভার উত্থাপন
করবেন (১০ সেপ্টেম্বর)। পরদিন
সংবাদপত্রে 'ব্যবস্থা পরিষদের প্রজাস্ব
আইন সংশোধন বিল: খোদাস ও
জমিদার সম্প্রদায়ের প্রবল আপত্তি'—এই
শিরোনামে সংবাদটি প্রকাশিত হয়।

বলবাহাদুর, খোদাস ও জমিদার
প্রতীক প্রতিদ্বন্দ্বের নানা বাণা ও
বিরোধিতা সত্ত্বেও দীর্ঘ তিন সপ্তাহব্যাপী
আন্দোলনা ও তর্কবিতর্কের পর প্রজাস্ব
আইনের সংশোধন বিলটি পরিষদের
উত্তর ভক্তই পাস হয়ে যায়। এই
ঐতিহাসিক ঘটনার সংবাদ দিয়ে '১
অক্টোবর 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র এই
শিরোনাম দিয়ে শেষে:

"প্রজাস্ব আইন সংশোধন বিলের
তিন সপ্তাহকাল বিতর্কের পর পরিষদের
বিল পৃষ্ঠিত: জমিদারের নজর
সোলমি, অগ্রকর ও স্যাঁফিকটে
কমতার রূপ: বণ বহুসর ছাড়না বৃদ্ধি
হইতে।"

কিন্তু আইনসভার উত্তর ভক্তই এই
বিলটি পাস হওয়া সত্ত্বেও গভর্নমেন্ট
সুপারিশ মাত না করায় তা বিবিধক হতে
পারল না (প্রায় ১০ ঘাস অতিক্রম
হওয়াব পরও)। এবং জনা হকসায়েহেব
বিরোধী পক্ষ এই মগ্রিসভার তীর্থ নিশা
ও সমালোচনা করতে থাকেন।
কৃষকসভার নেতৃত্বে বাঘশর্মা কৃষক
সংগঠনগুলি আইনটি বিবিধক করার জন্য
প্রবল বিক্ষোভ আন্দোলন করতে
থাকেন। উজ্জয়যোগসা, এই সময় বাংলার
বিল: বঃ কৃষকসভা' এবং 'নিঃ বঃ কৃষক
প্রজা পার্টিসি' (হক-বিরোধী) সদস্যদের
ঐক্যবদ্ধ এবং সম্মিলিত করার চেষ্টা
চলেতে থাকে। সংবাদপত্রে "বাংলার
দুইটি কৃষক সমিতি: ঐক্য আলোচনা
আদ্যাপ্রব: কমরতে মুক্তকুর আহমদ
ইকোর জনা আদ্রহ প্রকাশ
করিবাহে"—এই শিরোনামে সংবাদটি
প্রকাশিত (৯ মার্চ ১৯৩৮) হয়। (২৯
মে '৩৮) 'নিঃ বঃ কৃষক প্রজা ফিস'
উত্থাপনের আদ্যন জানানো হয়েছিল।

বলাবাহুল্য ওইদিন বাংলার বিভিন্ন জেলায় 'কৃষক দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষে মহিষসভার বিস্তৃত বিকোভ জ্ঞানানো হয়।

—জমিদার ও বড় জোতদারদের যোগসাজসে প্রজাবর্ষ সংশোধন বিলটি বিলম্বিত করার অভিযোগ জানা হয়। আসলে ইউরোপিয়ান ও দাঙ্গা-জমিদারদের কার্যকরতা ইংরেজ সরকার বুঝি সেটাই ছিলেন, তাই গভর্নরের অনুমোদন পেতে বেশি দিল্লি। স্বতাক্তই হকসাহেব এবং তাঁর

মহিষসভাকেই ঘাড়েগী হতে দিল্লি। হকসাহেব সংসদপথে যোগদান করে দিলেন, গু.হাসের ঘণ্টা আইনটি বিলম্বিত না হলে তিনি পরত্যাগ (১০ মে ১৯৩৮) করবেন। এ সম্পর্কে আশুতোষ বসুস তাঁর 'কৃষকসভার ইতিহাস' গ্রন্থে (পৃ. ৭৭-৭৮) লিখছেন:

"চলন্ত হকেন কৃষক-প্রজা মহিষসভা এই আইনের একটি সংশোধনী বিল দাখল করে ১৯৩৮-এব এপ্রিল মাসে। তাতে জমিদার স্বার্থের পরিশোধী কয়েকটি বিষয় প্রজাবর্ষের অন্তর্ভুক্ত প্রদান করা হয়। সেই কারণে ইংরেজ গভর্নর বিলে তাঁর অনুমোদন দিয়ে পাক্স আইনে পরিণত করতে বিলম্ব করছিলেন।

"এই বিল প্রজাবর্ষ আইনের সংশোধনের জন্য কৃষক সভার সব দাবি মেনে নেয়নি হটে কিন্তু হারতনের পক্ষে কিছু সুবিধার ব্যবস্থা করেছিল। তাই প্রাথমিক কৃষক কমিটি এ বিষয়ে কী কণ্ঠীয় তা আলোচনার জন্য এক সভা আহ্বান করে। সভার সিদ্ধান্ত হয় যে এই বিলকে অবশিষ্টে আইনে পরিণত করতে হবে—এই দাবির ভিত্তিতে যানক প্রচার চালানো সরকার। প্রচার-আন্দোলনের ফলে প্রাথমিক সরকারের প্রধান কলকাতা হক এবং অর্থমন্ত্রী নলিনীকান্ত সরকার প্রকাশ্যভাবে অস্বাস্থ্য খেল যে গু.হাসের ঘণ্টা এই বিল আইনে পরিণত হবে। আদর্শ মাসে তাই হয়েছিল।

উল্লেখযোগ্য, ১২ জানুয়ারি (১৯৩৮) এই বিল গভর্নরের সুপ্রাধিকার লাভ করার তা বখাবিহিত আইনে পরিণত হয়।

পরদিন, সংসদপথে (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ জানুয়ারি ১৯৩৮) "বর্ষীয় প্রজাবর্ষ সংশোধন বিলে গভর্নরের সুপ্রাধিকার ব্যবস্থাপক সভার আলোচনার পর গৃহীত: জমিদারের পক্ষে সম্বোধনের ঘণ্টাবাজা বিলের বিরুদ্ধতা করেন"—এই শিরোনামে সংবাদটি প্রকাশিত হয়।

আগেই বলেছি, ১৯৩৬ সালে জুলাই মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'বি: ব: প্রজা সম্মেলনের' চক্করুল হকসাহেব তাঁর



১৯৩৬ সালে পূর্ব পঞ্জিকা-এর সুপ্রাধিকার হিসেবে প্রদত্ত ভিত্তি হকি শেষ হওয়ার পরে

তাৎপরে যে-যে প্রতিশ্রুতি দিতেছিলেন এবং সেই সম্মেলনে যে-সব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, হক মহিষসভার উদ্বাসিত ও গৃহীত 'প্রজাবর্ষ আইনের সংশোধন' আইনে দুলত সেইসব দাবির ভিত্তিতেই এও আইনের খাটখাট রচিত হয়েছিল। প্রসঙ্গ হলে, এই সংশোধিত আইনে বাংলার চাষীরা ঠিক কোন কোন এবং কী কী বিক থেকে উপকৃত হয়েছিলেন? ১৯৩৮ সালের প্রজাবর্ষের এই

সংশোধিত আইনের দুল বৈশিষ্ট্যগুলি সুদূর বিস্তারিত করে এই সময় সৈয়দ হাবিবুর রহমান একটি নিবন্ধে (ব্র: আনন্দবাজার পত্রিকা—২৫ তারিখ ১৩৪৫ হি ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮) লিখেছেন:

- ১। "কর্পা, রায়তি, জোত ইত্যাদি বাংলার কর্ম রায়তসমূহের সম্পত্তি খরিদ বিক্রি ইত্যাদি হস্তান্তর-কি, সেলামি শতকরা ২০ টাকা জমিদারের প্রাপ্য এখন হইতে উঠিয়া গেল।
- ২। কর্মা, রায়তি, জোত প্রভৃতি খরিদ বিক্রিরূপে জমিদারের অগ্রক্রম অধিকার এখন হইতে লোপ হইল। জমিদারের অগ্রক্রম অধিকারের পরিবর্তে বিক্রেতার দরিক্রমের ক্রম অধিকার এখন হইতে অগ্রদণ্ড হইবে।
- ৩। আদালতে দরখাস্ত করিবার জন্য খারিজ নং মাত্র ১ টাকা সেলামি কি লাগিবে।
- ৪। জমিদারের স্যাটিফিকেটে খাজনা আদায় অধিকার এখন হইতে লোপ হইল। স্যাটিফিকেট ক্রমভায়ে যে সকল জমিদার খাজনা আদায়ের অধিকার বর্তমান সময় ভোগ করিতেছিলেন তাহা রহিত হইল।
- ৫। জায়সুবি, বাইখালসি দলিলের বহুটি সম্পত্তি ১৫ বৎসর অতীতে ভুটিয়া যাইবে। জায়সুবি বাইখালসি দলিলের জমি ১৫ বৎসর অতীতে ভুটিয়া নিয়াহে বলিয়া এখন হইতে গণ্য হইবে এবং আদালত দরখাস্তের ফলে খাজনা তাহা দখল পাইবে।
- ৬। আবগার ইত্যাদি কেআইনি খাজনা আদায় করিলে পূর্বে মাত্র জমিদারের মোমস্তার ৫০ টাকা জরিমানা হইবার ব্যবস্থা ছিল। এখন আবগার লাইসেন্স জমিদার ও তাহার মোমস্তা উভয়ের পূর্বের মতন ৫০ টাকা জরিমানা হইতে পারিবে।

৭। ১০ বৎসরের জন্য জমির খাজনা বৃদ্ধি স্থগিত করিল।

৮। জমি-দারী-সিকরী হইয়া ২০ বৎসরের মধ্যে পুনরুন্নতি হইলে প্রকাশ্য ও বৎসরের খাজনা দিয়া ভাড়া দখল পাইবে।"

হবিবুর রহমান সাহেব সংক্ষেপে এই প্রকাশ্যত্ব সংশোধন আইনের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে বুঝ সুন্দর তুলে ধরেছেন। হবিবুর রহমান সাহেব শুধু হরিণালের একজন লজ্জপ্রতিষ্ঠ আইনজীবীই ছিলেন না। কৃষক প্রজা পালিও অগ্রগামী নেতা ছিলেন। বসন্ত, এই সংশোধিত আইন বাংলার জমিদার ও জমিদার-স্বত্বাধার প্রতীক বিপর্যয়কে প্রায় একেবারে ডেকে নিয়েছিল। এই আইন বাংলার লক্ষ লক্ষ গরিব চাষীকে সমুদ্র বিপদ ও নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছিল। বসন্ত, বোয়ালী ও মল্লাজের রায়তওয়ারি এলাকার রায়ত চাষীর চেয়ে বহু সুযোগ-সুবিধা বাংলার রায়তচাষীকে আদায় করে দিতে সক্ষম হয়েছিল, এই আইন। এর ফলে বাকি খাজনা বা ফেনার ব্যয়ে করার ক্ষমতা অম্বাবর স্নোক সার্ভিসকে নিশান করে জমি থেকে চাষীকে উচ্ছেদ করাযাবে না। বোয়ালী মাল্লাজের রায়তওয়ারি এলাকার খোদা গভর্নমেন্টই জমিদার—বৎসরান্তে খাজনা বা সাক্ষর দিতে না পারলেই উচ্ছেদ। তা ছাড়া সে-সব এলাকার উনিশ শতক থেকেই টাকার অল্পের পরিমাণের বিক থেকে একর প্রতি গড় জমির রাজস্বের পরিমাণ ২/৩ গুণ বেশি হয়ে গিয়েছিল। ১৯০৮ সালের প্রকাশ্যত্ব সংশোধন আইন পাল হয়ে যাওয়ার পর বাংলার চাষীর সবচেয়ে সুবিধা হয়ে গিয়েছিল এই যে, বাকি খাজনার বা মধ্যাক্রমের ফেনার গায়েই ছোক বিরোধের নিশানটির ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতা ছিল যেওয়ানি ও সৌজদারি আদায়ত।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, হক-মন্ত্রিসভা এর পরই 'খাতক চাষী আইনের সংশোধন' (Agricultural Debtors' Act and Debt Settlement Board)

বা ঋণ সালিসী বোর্ড আইনের সংশোধন করার ফলে বাংলার লক্ষ লক্ষ গরিব খাতক চাষীকে নিশ্চিত ধ্বংসের দুখ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল। তা ছাড়া 'খসীত মহাজনী আইন' ('Bengal Money lenders Act' 1933) আইনের ব্যাপক সংস্কার করে বাংলার গরিব মানুষকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল। এই আইনটি কার্যকর হয় ১৯৩৯ সালের ১ জানুয়ারি হতে।

হক-মন্ত্রিসভা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল—'ফ্লাউড কমিশন'-এর নিয়োগ। স্বরণ রাখা দরকার, তাঁদের ঢাকা সম্মেলনেই আর্মস ও মিত্রদের বিক থেকেই হকসাহেব 'জমিদারি প্রথা' বা 'সিরদারী শাসনব্যবস্থা'-এর অবসান ঘটি করে কৃষকের স্বাধীন জমি রাজস্বের দাবী নির্ণয়ের কথা ঘোষণা করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রস্তাবিত এই ডুবিরাজ কমিশন নিয়োগের কথা বিবেচনা করেছিলেন। বিশেষতঃ ডোমিনর-সলি স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউডকে (Sir Francis Floud) এই কমিশনের চেয়ারম্যানের পদ গ্রহণের প্রস্তাব করেতেই তিনি তাঁর সম্মতি দান করেন। প্রকাশ্যত্ব সংস্কার আইনের সেই প্রীর উত্তেজনাশূন্য আন্দোলন চলাকালীনই তিনি 'ফ্লাউড কমিশন' নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন। ২ এপ্রিল '৩৮,—'সিরদারী শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে তত্ত্বের জন্য কমিশন: সত্যাপতি পদের জন্য খাস বিলাতি সাহেবের আদায়নি: বিলাতের ডোমিনিয়ন সলি স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউডকে কমিশনের চেয়ারম্যান পদগ্রহণের অনুমতি দিতে সম্মত হন।—এই নিয়োগের সংবাদটি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ প্রায় দুই বছরকাল নানা তথ্য ও সাক্ষাৎপ্রাপ্ত গ্রন্থ ও অনুসন্ধানের পর ২১ মার্চ ১৯৪০ তারিখে দুই খণ্ডে কমিশন তাঁদের রিপোর্ট বা তত্ত্ব প্রতিবেদন পেশ করেন।

আজ গ্রাম সকলেই জানেন, 'ফ্লাউড কমিশন' সিরদারী শাসনব্যবস্থা বা জমিদারি

প্রথার অবসানের সুপারিশ করলেও তার জন্য জমিদারদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দানের সুপারিশ করেছিলেন। তবে জমিদার ও মহাশয়বৃত্তাঙ্গী কোনও প্রতীকী থাকবে না—অর্থাৎ বর্ডনমেন্ট ও চাষীর মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক থাকবে। কমিশনের আর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ হল: বৎসরান্তের সরাসরি সবচেয়ে প্রজা হিসেবে স্বীকার করা এবং বৎসরান্তের উপর তৎসং ১/৩ পর্যন্ত খাজনা দিতে হবে। স্বরণ রাখা দরকার, এই সুপারিশের ফলেই কৃষকসভার পক্ষে বৎসরান্তের বিবেচনামূলক 'ডেডায়া' আন্দোলনের দুইই সুবিধা হয়। কমিশনের আরও কিছু দৃষ্টান্ত সুপারিশ ছিল। অশ্বা ইতিহাসে বিতীর্থ মহামুখ্য এসে পড়ায়, মুক্তচিন্তিত জমির অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কমিশনের অধিকাংশ সুপারিশই স্থগিত বা শিথিল তুলে দাখা হয়।

প্রসঙ্গত বলা দরকার, ইতিমধ্যেই খাজা নাজিমুদ্দীন ও সুরাধী প্রমুখ মুসলিম লিগ নেতাদের উদ্যোগে মুসলিম সাম্প্রদায়িক সমস্যা সম্বন্ধেই হকসাহেবের বিরুদ্ধে আক্রমণ মাল্লাতে শুরু করেন। লিগ-নেতারা হকসাহেবকে মুসলিম সমাজের বিরাগী বলে প্রচার শুরু করেন। ১৯৪০ সাল মাস্যাদ এই বিবাদের চরমে ওঠে। হকসাহেব কিন্তু মহাশয়ের নেতা শাম্যাপ্রসাদ এবং তৎওয়ারী ব্রহ্ম নেতাদের সঙ্গে আলোচনাত্মক 'প্রোগ্রেসিভ কোয়ালিফ মন্ত্রিসভা' গঠন (১৭ ডিসেম্বর) করে ইংরেজ সরকারের দমননীতি ও মুক্তকামীন কংগ্রেসিট জনবিবোধী কার্যকলাপ ও বিবিদ্যাবস্থা উল্টে ফেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি ইংরেজ সরকারে 'পোতাঘাটি নীতি' গ্রহণেরও বিরোধিতা করতে শুরু করেছিলেন। ফলে দেশপন্থী হকসাহেব ও শাম্যাপ্রসাদকেও পদত্যাগ করতে হয়। পরের ইতিহাস সকলের সুপরিচিত।

শিল্প-সংস্কৃতি দরদী ফজলুল হক

গণেশ মুখোপাধ্যায়

শেখ বাংলা আবুল কাশেম হকফুল
এক শুভদ্রষ্টা একজন রাজনৈতিক
ব্যক্তিত্ব নন—তিনি অবিভক্ত
বাংলায় আমজনতায় এতাত্ম আপনজন 'হক
সাহেব'।

উনিশ শতকের সপ্তম দশকে শুব বাংলার
বহির্ভাগে নবী আর সবুজের ছায়াধারা নরম
নাট্যে এক সত্ত্বাত্ত পৰিচায়ে তৃষ্ণিত জন
হকসাহেব।

তারতবর্ষ তখন ব্রিটিশ শাসনের শোষণ
আর নিৰ্বাচনে নিষ্পেষিত। ব্রিটিশ
শাসনতন্ত্রের হুতিয়ার তখন জমিদার আর
মহাজনের দল। নিম্নীই প্রজা সাধারণের ওপর
জমিদার মহাজনের অত্যাচার নিপীড়ন
তখনকার নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

১৮৭০ খ্রীঃ হকসাহেবের জন্ম হয়। তার
এক বছর আগে ১৮৭২ খ্রীঃ কলকাতায়
বাংলা সাধারণ রক্ষার প্রতিষ্ঠিত হয়।

শুরুতেই সাধারণ রক্ষার অধিনীত হয়,
গণী প্রজাদের ওপর ইংরেজ নীলকর
সাহেবদের অকণ্ঠা অত্যাচারের বিরুদ্ধে
বীমবন্ধু বিদ্রোহ প্রতিবাদী, বিক্ষোভের নাটক
'নীলদর্পণ'।

বাংলার গ্রামপঞ্চায়ে 'নীলদর্পণ' তখন
ঘণ্টে সাড়ি জাগায়। যকঃবলের
পন্থগুণিতে নীলদর্পণ নাটক অভিনীত হতে
থাকে। হক পিতৃকালেই সমগ্র বহির্ভাগে
পিতার সঙ্গে নীলদর্পণ নাটকের অভিনয়

যেখেন। নীলকর ইংরেজদের অত্যাচারে
জর্জরিত গণী প্রজাদের চাম দুর্দশার চিত্র
শৈশবেই গভীরভাবে ধারণ করে হক সাহেবের
নয়ন মনে।

সেই বয়স থেকেই নীলকর সাহেবদের
মতো, দরিদ্র কৃষক প্রজাদের ওপর বৈদ্যার
জমিদার মহাজনদের নির্যম অত্যাচারের ঘটনা
বহির্ভাগের গ্রামপঞ্চায়ে প্রত্যক্ষ করতে থাকেন
তিনি। কোনও সাহসী মানুষ এইসব অন্যায়ের
প্রতিবাদ করতে এগিয়ে এলে নাটকের
ঘটনার মতই প্রতিবাদকারী গ্রাম চলে যেত।
বহির্ভাগেই চানপুরা গ্রামের প্রজা আশু
আকান ছিল এমন একজন রোহা মানুষ।
যেবেদিক বানার এক জমিদারের অন্যায়
অত্যাচারের বিরুদ্ধে কৃষক ঘড়িরেছিল আশু।

সেই অগ্রগণ্য জমিদার তাকে নৃশংসভাবে
হত্যা করেছিল। বানার ঘাটেই প্রকাশ্য
বিধালাকে করে হাজার নরনারীরা চোখের
সাহনে আন্তকে শিষ্টমোড়া করে বেঁধে কুটন
ভেঁসের বাড়ির মধ্যে ফেলে দিয়েছিল
জমিদারের শাইকরা। বাড়ি বাজনার ঘাটে
কৃষকের জমির দান করে নিয়ে যেত
জমিদারের পেয়ালায়। মহাজনের লাঠিয়ালরা
গ্রামবাসীদের সর্বত্র লুট করে নিয়ে যেত
যেবার দার চাশিরে। অকণ্ঠা অত্যাচার করত
শিশু বৃদ্ধ মহিলাদের পর্যন্ত। শিশু হতভো
তার ভাত বানার ছোট্ট কঁসার থালাবানি যুকে
আঁকে রেখেছে। নৃশংস লাঠিয়াল কিংবা

পেয়ালায় দল শিশুর কটি যুকে লাধি যেয়ে
পাঁজরের হাত কখনো ভেঙে দিতে সেই
থালাবানিও কেড়ে নিয়ে চলে যেত। কৈশোর
থেকে যৌবন পর্যন্ত গ্রামবাংলার এই চিত্র,
এমন সব অসংখ্য নিৰ্বাচন নিপীড়নের
ঘটনার প্রচণ্ড প্রভাব পড়ল হকসাহেবের
কোমল মনের উপর। তারই ফলে
বেদনাকাতর, সহমর্মী, অন্যায়ের
প্রতিবাদকারী, গুচতো, নাচাশিত বহু কটিন
এক চরিত্র গঠিত হল হকসাহেবের।

বহির্ভাগে শহুরে এবং কলকাতার
উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করলেন। আইনের দীক্ষা
নিলেন বাংলার বাঘ আন্তোডার
মুখোপাধ্যায়ের কাছে 'শেখ বাংলা'।

একজন মানুষ একাধারে কত গুণের
অধিকারী হতে পারে হকসাহেব তার উজ্জল
দৃষ্টান্ত। নৃশংস, শিকারি, আইনবিজ্ঞ,
সুভক্ত, জাতীয়তাবাদী, স্বাধীনতা সংগ্রামী,
দেশের পরাধীনতা বিমোচনে নিবেদিত
সৈনিক, দরিদ্র কৃষক প্রজার বন্ধু, লজ্জাক
রাজনীতিবিদ, অসাম্প্রদায়িক গণনেতা,
মুখোপাধ্যায়, নগর কলকাতার মেঘর,
অবিভক্ত বাংলার মহানগর প্রধান এবং
বাংলার গভর্নরের পক্ষেও অবিচলিত
হয়েছিলেন হকসাহেব।

কিন্তু তবু তার এমন একজন কর্মকর্তা,
দুর্ভাগ্যবিশিষ্ট, সদাব্যস্ত কটিন রাজনৈতিক
ব্যক্তিত্ব, দরিদ্র প্রাণদাতা, আরও অসংখ্য

করে নিরোক্তিত মানুষটি এত ভিন্নমুখী ঘটনার সঙ্গে নিজেকে দৃঢ় বেধেও দেশের শিল্প-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্যের প্রতি সমান আনুগত্য প্রদান করেছেন।

অধিনীকায়ার পত্র, দ্বীপ্তনাথ ঠাকুর, পরশুসেন চট্টোপাধ্যায়, কবি নজরুল ইসলাম, মুক্তকণ্ঠ আয়তন, মুক্তন গান, নিষিদ্ধকৃত্যের ভাষা, অধীশ্র চৌধুরি, জীবনানন্দ দাস, কবি জগদীশচন্দ্র, কবি সুকিমা কামাল প্রমুখ বহু প্রখ্যাত শিল্পী-সাহিত্যিক, কবি নাট্য ব্যক্তিত্বের অভ্যন্তর ফাটলে মানুষ ছিলেন হকসাহেব।

সুকবি ছিলেন তিনি স্বয়ং। মাড়োয়া ছাড়াও আরবি, ফারসি, উর্দু সংস্কৃত এবং ইংরেজি সাহিত্যেও অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন হকসাহেব। আইনের সওয়াধ করতে করতেও শৈলী, ক্রিস্ট, বাচসন, কালিদাস, দ্বীপ্তনাথ থেকে সাবলীলভাবে উল্লেখ করে যেতেন।

কোনো মুক্তনবাসের দ্বন্দ্বী দ্বন্দ্বের একান্ত অনুযায়ী ছিলেন। মুক্তন গানের দ্বন্দ্বগান হচ্ছে কানে শুনেই, বিশ জোপ দুয়ে হলেও সকল কালকর্ষ্য বাব দিয়ে সমলমলে হকসাহেব সে আসরে গিয়ে ছাটের হতেন।

১৯২১ খ্রীঃ কবি নজরুল এবং মুক্তকণ্ঠ আহমেদের সঙ্গে 'নবযুগ' পত্রিকা প্রকাশ করেন।

দ্বীপ্তনাথের অভ্যন্তর প্রিয়শত্রু ছিলেন হকসাহেব। কবির ভ্রম্মি সময়ে সত্ত্বাহাচিক কাল সমগ্র প্রকাশনিক কলকর্ষ্য ব্যতিল করে দিয়ে জোড়সাঁকো ব্যক্তিও পড়েছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শীনের কাছে শোনা যায় কবি দ্বন্দ্ব শেরনিয়াস ভাঙ্গা করেছেন, তখন তাঁর একমুখি হাত হকসাহেবের বুটি হাতেব ঘণ্টা আঘাত ছিল।

১৯২৬ খ্রীঃ ৩১ আগস্ট পরশুসেন 'নবযুগ' উপন্যাসখনি প্রকাশিত হয়েছিল। বইখনির প্রথম সংস্করণ বাজারে আসতেই রাজপ্রাচীরের অপরশে 'নবযুগ'র বিক্রি যা প্রচার নিষিদ্ধ করে দেয় উল্লেখ স্মরণিক।

তখন অব্যক্ত বাংলায় হক দ্বীপ্তনাথের আমল। নাট্যকার শরীফ সেনগুপ্ত, অধীশ্র

‘না না দেশের থিয়েটার উঠে যাবে এমন কাজ হতে পারে না। ব্যাপারটা আমার নজর এড়িয়ে আমলাদের আইনের মারপ্যাচে ঘটে গিয়েছে। আমি খুবই লজ্জিত। আপনারা চিন্তিত হবেন না আমি কর্পোরেশনের আইনকানুন বাঁচিয়ে ওই একশো টাকার ট্যাকসো এক টাকায় নামিয়ে দেব।’

চৌধুরি, সতু সেন প্রমুখ কয়েকজন নাটকের মানুষ জানা-চিত্তা করলেন পরশুসেনের 'নবযুগ' উপন্যাসখানির নাট্যরঙ্গ মঞ্চ করতে পারলে ব্যাপারটি বেশ সমাধোপযোগী হয়। কিন্তু বইখানির উপর তখনও সবজারি নিষেধাজ্ঞা ফলবৎ হয়েছিল। সেই ব্যাঘাট কেনমতোব কাটানো যাবে তাই নিয়ে আলোচনা করবার জন্য তাঁরা হক সাহেবের দ্বন্দ্ব হলে। প্রত্যক্ষদর্শী শুনেই হকসাহেব ভো লাভিয়ে উঠলেন। শুধু তাই নয় সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই পরশুসেনের 'নবযুগ' উপন্যাসখানিকে সবজারি নিষেধাজ্ঞার কবল থেকে মুক্ত করে আনলেন।

১৯৩৯ খ্রীঃ 'নবযুগ' দ্বিতীয় সংস্করণ পুনঃপ্রকাশিত হল এপ্রিল মাসে। আর 'নাট্য নিকেতন' ঘড়ে ১০ মে উদ্বোধন হল 'নবযুগ' নাটক। নাট্যরঙ্গ ছিলেন শরীফ সেনগুপ্ত দ্বন্দ্ব। অধিনায়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন অধীশ্র চৌধুরি, চুপশ্র দ্বন্দ্বোপাধ্যায়, প্রভা শৈলী, শৈলিকা (পুতুল) প্রমুখ শিল্পীদ্বন্দ্ব। উদ্বোধনী রজনীতে হকসাহেব স্বয়ং তাঁর দ্বীপ্তনাথ কয়েকজন সদস্যসহ প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত ছিলেন।

হকসাহেব তখন নগর কলকাতার ঘের। হঠাৎ কলকাতা কর্পোরেশন সাধারণ রম্যলব্ধগতির ওপর বছরে ১০০ টাকা হারে প্রমোদকর আরোপ করে দিল। বরমঞ্চ সেটা শিল্পি ভাষায়, অধীশ্র চৌধুরি, বরমঞ্চ মিত্র, ঘনোয়জন ভট্টাচার্যদের কল। থিয়েটারে অত

টাকা ট্যাক্স বার্থ হওয়ায় নাট্যকর্মীরা প্রচাণ গুনলেন। সঙ্গে সঙ্গে শিল্পিকৃষার ভাষায় নেতৃত্বের একমল কর্মী হুটলে হকসাহেবের হস্তুরে। সফটব কথা জানানো হল তাঁকে। ভাষাভিষায় সবসময় বললেন, 'A Nation is Known by its Theatre' আমবা কত চোঁ করে দেশের সেই থিয়েটারকে ব্যক্তিবে যেখোঁ। এখন কর্পোরেশন যদি এই বিব্যাট ট্যাক্সের বোকা চাপিয়ে দেয় তাহলে ভো দেশের থিয়েটারগুলো উঠে যাবে হকসাহেব। হকসাহেব অভ্যন্তর লজ্জা পেয়ে বললেন 'না না দেশের থিয়েটার উঠে যাবে এমন কাজ হতে পারে না। ব্যাপারটা আমার নজর এড়িয়ে আমলাদের আইনের মারপ্যাচে ঘটে গিয়েছে। আমি খুবই লজ্জিত। আপনারা চিন্তিত হবেন না আমি কর্পোরেশনের আইনকানুন বাঁচিয়ে ওই একশো টাকার ট্যাকসো এক টাকায় নামিয়ে দেব। থিয়েটার সবকশি প্রমোদকর দেবে, তবে তা দ্বন্দ্ব এক টাকা।'

সমগ্র জাতির প্রতি দেশের শিল্প-সংস্কৃতি পিত্তা ব্যবহার প্রতি সমাজের দ্বন্দ্ব শ্রেণীর প্রতি কঠব্যাহোবের সহানুভূতিদীপ্ত ঘানসিকতার এখন বহু বহু নব্বির মধ্যে হকসাহেবের সুখীর্ষ জীবন জুড়ে।

তাঁই আজ দুই উপদ্বন্দ্বদেশের উচ্চকর জোড়িক আমদের 'হকসাহেবের' ১২৫তম জন্মবর্ষের পূণ্যলগ্নে জন্মনা করতে লাগে হা এখন দ্বন্দ্ববন্দ্বী, সহদর্শী কঠব্যাহি মানুষ গুচ্ছ গুচ্ছ 'দুন্দ্বনাথদ্বন্দ্ব'।

আমজনতার হক সাহেব

দিলীপ ব্যানার্জি

উ

মিস্ত্রী হোচস্ট্র সাংসদ ঘর
ঘাসে নয় বহুব লব বর্ষীয়
আইনসভার (Bengal
Legislative Assembly) দ্বিতীয় সাধারণ
নির্বাচন হয়। ১৯০৭ সালে প্রথম নির্বাচন
হয়েছিল। ১৯০৫ সালের ভারত শাসন
আইনে শর্ত বহুব অন্তর নির্বাচন করার
কথা বলা হলেও দ্বিতীয় মহাদুন্দেব কারণে
আইনসভার মেয়াদ বৃদ্ধি ঘটেছিল। সময়
হত নির্বাচন হতে পারেনি। ১৯৪৬ সালের
নির্বাচনই ছিল মুক্ত বাংলার শেষ নির্বাচন।
ঐ সময়ে আঙ্করের হত সার্বজনীন
ভোটবিভাগ ছিল না। সীমিত ভোটবিভাগ
ছিল। শতকরা ১৪ জনের ভোটবিভাগ
ছিল। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভোট হতো।

১৯৪৬-এর নির্বাচন কংগ্রেস ও
মুসলিম লিগ উভয়ের কাছেই ছিল অত্যন্ত
গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটিশ সরকারও এই
নির্বাচনের ঘণ্টা দিয়ে বুকে নিতে চেয়েছিল
ভারতীয়দের মনোভাব।

১৯৪৬-এর নির্বাচনেও মুসলিম লিগ
পাকিস্তানের সমর্থনে ভারতের
মুসলমানদের গণভোট হিসাবে গ্রহণ করে।
মুসলিম লিগই মুসলমানদের একমাত্র
প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান এ বিষয়টিও
নির্বাচনে একটা প্রধান ইস্যু ছিল। সমগ্র
মুসলমান সমাজকে মুসলিম লিগের
গভাকাতলে নিয়ে আসবার আয়োজন ছিল।

কংগ্রেস কখনই মুসলিম লিগকে
মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্ব
প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি দেয়নি। মুসলিম লিগ
এই দৃষ্টি ইস্যুকে নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা
নেমেছিল। সোহরাওয়ার্দী ছিলেন মুখ্য
প্রচারক।



১৯৪৬-এর নির্বাচনকে
মুসলিম লিগ পাকিস্তানের
সমর্থনে ভারতের
মুসলমানদের গণভোট
হিসাবে গ্রহণ করে।



কক্সবুল হকের কৃষক প্রজন্ম
পাকিস্তান প্রস্তাব সমর্থন না করার মুসলিম
সম্প্রদায় তাঁর দল থেকে দূরে সরে যায়।
মুসলমানদের বেশিরভাগই ছিল তখন
পাকিস্তানের সমর্থক—মুসলিম লিগের
শতাকাতলে একবাক্য। ওই সময় কক্সবুল
হকের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা থাকলেও
দলীয় জনপ্রিয়তা ছিল না। ফলে মুসলিম
লিগের পাকিস্তান দাবির কাছে কক্সবুল
হকের কৃষক প্রজন্ম দল বা কংগ্রেসের

রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক
তোন বক্তব্যই দাঁড়াতে পারেনি। মুসলিম
জনগণের মনে বাণ কাটতে পারেনি।

এ সময় হোসেন নব্বিশ সোহরাওয়ার্দী
ছিলেন বাংলার মুসলিম লিগের
অধিসংখ্যক নেতা। আবুল হাসিম তখন
প্রাথমিক মুসলিম লিগের সম্পাদক।
সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বামপন্থী মনোভাবাপন্ন
নেতা। সংগঠক হিসাবেও যোগ্যতার
পরিচয় দিয়েছেন। সোহরাওয়ার্দী ও আবুল
হাসিম প্রতিটি নির্বাচনী কেন্দ্রের জনসভায়
মুসলিম লিগের বক্তব্যকে তুলে ধরেছেন।

১৯৪৬-এর নির্বাচনে বাংলায় মুসলিম
লিগ অতুতপূর্ব ফলাফল লাভ করে। নির্বাচনী
ফলাফল প্রমাণ করেছিল—বাংলার
পাকিস্তান আন্দোলনের গণভিত্তি আছে।
আইনসভায় মোট ২৫০টি আসনের মধ্যে
১২১টি মুসলিম আসনের ১১৭টিতেই
মুসলিম লিগ জয়লাভ করে। কংগ্রেস
একটিও মুসলিম আসনে জয়ী হতে
পারেনি। কংগ্রেস ৮৬টি আসনে জয়ী হয়।
কক্সবুল হকের কৃষক প্রজন্ম ৪টি আসন
লাভ করে। কক্সবুল হক দুটি কেন্দ্র
বাঘরগঞ্জ ও বাগেরহাট আসনে বিপুল
ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। পরে বাগেরহাট
আসন থেকে গণভাগ করার উপনির্বাচনে
মুসলিম লিগ আসনটি দখল করে নেয়।

এই নির্বাচনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল—কমিউনিস্ট পার্টি তিনটি আসনে জয়ী হয়ে প্রধান সংসদীয় বাহিনীভিত্তে প্রবেশ করে। জ্যোতি বসু, বড়নলাল ব্রাহ্মণ ও স্বপনাবাষণ দাস এই তিনজন কমিউনিস্ট আইনসভার নির্বাচিত হয়েছিলেন। বর্তমানে বড়নলাল ব্রাহ্মণ প্রয়াত। স্বপনাবাষণ দাসকে ১৯৭১-এর বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় শাক বাহিনী নৃশংসভাবে হত্যা করে। জ্যোতি বসু বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।



জ্যোতি বসু এবং প্রধানমন্ত্রী শাক্তাচরণ দাসের সঙ্গে বসুজনের সঙ্গ

১৯৪৬-এর নির্বাচনে মুসলিম লিগ বাংলায় সফল হলেও বাংলার বাইরে ব্যর্থ ছিল। পাঞ্জাবে পরিত্যক্তা অর্জন করতে পারেনি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ও সিদ্ধ প্রদেশে একটি আসনেও জয়ী হতে পারেনি।

১৯৪১-এর নির্বাচনে মুসলিম লিগ বাংলায় সফল হলেও বাংলার বাইরে ব্যর্থ ছিল। পাঞ্জাবে পরিত্যক্তা অর্জন করতে পারেনি। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে একটি আসনেও জয়ী হতে পারেনি। সিদ্ধ প্রদেশে একটিমাত্র ভোটে এনিবে ছিল। সোহরাওয়ার্দি ও আবুল হাশিমের নেতৃত্বে সেফিম বাংলার মুসলিম জনগণ পাকিস্তানের পক্ষে সোচ্চারিত না হলে কিভাবে ‘পাকিস্তান স্বপ্ন’—বহুই থেকে যেত।

পাকিস্তান প্রচারণার অন্যতম নথি সোহরাওয়ার্দি কি ১৯৪৬-এর মার্চ মাসে ডাবতে পেরেছিলেন ১৫ মাসের মধ্যে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর—পাকিস্তান স্থপতিত্বের অন্যতম প্রধান ছোপের নথি সোহরাওয়ার্দি—পাকিস্তানের নাথরিক

হিসাবে হবেন অস্বাক্ষিত। কলকাতায় তাঁর জীবন কাটবে নিঃসঙ্গতায়। পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য পদ হারিয়ে দেয়া হবে। দেশত্যাগের পর সোহরাওয়ার্দি একই সঙ্গে ছিলেন নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ আইনসভার (West Bengal Legislative Assembly) সদস্য—মুসলিম লিগ পরিষদীয় দলের নেতা। এবং পাকিস্তান গণপরিষদের (Pakistan Constituent Assembly) মুসলিম লিগ ঘনোদীত সদস্য। ১৯৪১ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত সোহরাওয়ার্দি কলকাতায় থেকেও একদিনের জন্য পশ্চিমবঙ্গ আইনসভার চহুবে না হয়েননি।

১৯৪৬-এর নির্বাচনের আগে সোহরাওয়ার্দি কক্সল হককে প্রস্তাব দিয়েছিলেন কুসলময় আসনের নতুনরা ৪০টি আসন ক্রমক প্রজ্ঞা দলের ঘনোদীত নথিরফের কেওতা যেতে পারে, দরি তামা মুসলিম লিগ প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কক্সল হকের কাছে প্রস্তাবটি ছিল অত্যন্ত বৃণাকর। কক্সল হক সরাসরি প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন। কক্সল হক পৃথকভাবে নিজস্ব কর্মসূচি ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। মুসলিম লিগও কক্সল হককে নির্বাচনে

পরাক্ষিত করার জন্য সর্বপ্রত্যয়ে প্রচেষ্টা চালায়। এ কারণে কলকাতা থেকে ছাত্র-কর্মীদের ব্যবসরগ ও ব্যেংকহাট কেন্দ্রে লাইনে হয়েছিল। কিন্তু ফক্সল হককে পরাক্ষিত করা সম্ভব হতনি

নির্বাচনী ঘন প্রত্যাপের পরই সোহরাওয়ার্দি মুসলিম লিগ পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হন সর্বসম্মতিক্রমে। সোহরাওয়ার্দির পক্ষে এককভাবে মন্ত্রিসভা গঠন করা সমসা ছিল না। কারণ মুসলিম লিগের ১১৭ জন সদস্যর সঙ্গে ২৫ জন ইউরোপীয় সদস্য সমর্থন তাঁর প্রতি ছিল। এতদসত্ত্বেও সোহরাওয়ার্দি কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন করার উদ্যোগ নেন। তাঁর মন হয়েছিল প্রদেশের জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশের প্রতিনিধিত্ব মন্ত্রিসভায় না থাকার ঠিক নয়। কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা হলে তিশু মুসলমান ঐক্যবদ্ধভাবে তাক করতে পারবে। আইনসভায় কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা কিরণদাসর বাবে সঙ্গে এ বিধে সোহরাওয়ার্দির দীর্ঘ আলোচনা হয়। নিম্নিত্রে কংগ্রেস ও লিগের দীর্ঘ নেতাদের মধ্যে আলোচনা হয়।

জ্যোতি বসু ওই সময় আইনসভায় কমিউনিস্ট প্রেশের নেতা হিসাবে

“বর্তমান-আইনসভার
একজন শ্রীকারের সম্মান
বা মর্যাদা চিড়িয়াখানার
একজন সুপারিন্টেন্ডেন্ট
অথবা উদ্যান আশ্রমের
ম্যানেজারের থেকে বেশি
নয়।”

কংগ্রেস-লিগ কোয়ালিফিকেশনকে স্বাগত
জ্ঞান।

আলোচনাকালে কংগ্রেস ও লিগের
মধ্যে মতভেদ দেখা দেওয়ায় আলোচনা
ভেঙে যায়। মন্ত্রিসভায় উভয় দলের আসন
সংখ্যা নির্ধারণ, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদের
বন্টন, মন্ত্রিসভায় কংগ্রেস কর্তৃক মুসলিম
সদস্য যেনোমনে এবং রাজনৈতিক
বহীনের দৃষ্টিতে প্রায়ই মতভেদের কারণ
হিলা। আলোচনা ব্যর্থ হবার পর
সোহরাওয়ার্দী ও কিরণপল্লর হয়ে উভয়
উভয়েকে সোহাওয়ার্দী করেন। উভয়ের মধ্যে
যে পরে বিনিময় হয়েছিল—সংবাদপত্রে
তা প্রকাশিত হয়। আলোচনাকালে
কংগ্রেস সভাপতি আবুল কালাম আজাদ
কলকাতা হককে আইনসভার শ্রীকার পদটি
দেবার কথা উল্লেখ করায় কুন্ত কলকাতা হক
২৪ এপ্রিল '৪৬ সংবাদপত্রে নিম্নোক্ত
বিবৃতি দিয়েছিলেন—‘‘হায়-সোহাওয়ার্দী
পত্র বিনিময় জানা পেল, কংগ্রেস
সভাপতি আঘা নাম বহীয আইনসভায়
শ্রীকার হিসাবে ব্যবহার করেছেন। আমি
কংগ্রেস সভাপতিকে এ বিষয়ে আঘা নাম
ব্যবহারের কোনরকম সম্মতি দিই নাই। এ
কাজটা আমি অত্যন্ত কুপার সঙ্গে দেখছি।
অপরদিকে সোহাওয়ার্দীর জানা উচিত
বর্তমান আইনসভার একজন শ্রীকারের
সম্মান বা মর্যাদা চিড়িয়াখানার একজন
সুপারিন্টেন্ডেন্ট অথবা উদ্যান আশ্রমের
ম্যানেজারের থেকে বেশি নয়। এ ছাড়া
শ্রীকার বেতন হিসাবে বা পেয়ে থাকেন,

আমি অনায়াসে তার থেকে বেশি আর
কিছু পারি—এই মূল্যে কোর্টে
কয়েকটা মাসে জামিনের আবেদন করি।
সোহাওয়ার্দীর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে শ্রদ্ধা করা
উচিত তাঁর যে প্রতিষ্ঠা তা আঘা নামাই
সম্ভব হয়েছে। কারণ ১৯৩৭-এর নির্বাচনে
মুসলিম লিগের ভরত্বির পর আমিই
তাঁকে আঘা মন্ত্রিসভায় স্থান করে
দিয়েছিলাম।’’ সোহাওয়ার্দী ২৪ এপ্রিল
মন্ত্রিসভা গঠন করেন। সোহাওয়ার্দীর
মন্ত্রিসভায় কার্যকাল ছিল ১৪ মাস মাত্র।
১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পর্যন্ত। এ

বিনা কতিপূরষে জমিদারী
প্রথা উচ্ছেদের কথা
কৃষক-প্রজা দলের নির্বাচনী
কর্মসূচিতে গুরুত্ব সহকারে
থাকলেও বাস্তবায়ন করা
সম্ভব হয়নি মন্ত্রিসভায়
মুসলিম লিগ সদস্যদের
অসহযোগিতার জন্য।

সময়কাল ছিল ভারত তথা বাংলার
রাজনৈতিক ইতিহাসে ঘটনাবল।
কলকাতা সহ বাংলায় ভাষাবাদ নামা, ভারত
থেকে উপনিবেশিক শাসনের অবসান,
দেশ বিভাগ—পাকিস্তান সৃষ্টি। ইত্যাদি।
১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর কলকাতা
হক কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিফিকেশন করে
বার্ষ হয়েছিলেন। কংগ্রেসের কৃষকসভার
অভাবে। ১৯৪৬ সালে সোহাওয়ার্দীর
প্রচেষ্টা কলকাতা হক। হলে মন্ত্রিসভা
গঠনের তিন বছরের মধ্যে ‘‘Great
Calcutta Killing’’-এর মত ঘটনা
ঘটেছে না। ১৯৪৬-এর নভেম্বরে
সোহাওয়ার্দীর আর একবার জাতীয় সরকার
গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু
জিন্নাহর অনমনীয়তার জন্য সম্ভব হয়নি।

১৯৩৭-এর নির্বাচনে বাংলার
আইনসভায় ২৫০ জন সদস্যের মধ্যে
কংগ্রেস-৬০, মুসলিম লিগ-৬০, কৃষক
প্রজা দলের ৪৪ জন সদস্য ছিল। এ ছাড়া
মিশ্রা কৃষক পার্টি-৫, হিন্দু মহাসভা-২ ও
অন্যান্য ৬৯ জন সদস্য ছিল। নির্বাচনে
কোন দলই নিরঙ্কুশ পরিস্থিতি না পাওয়ার
কোয়ালিফিকেশন মন্ত্রিসভা অসম্ভব ছিল।
কলকাতা হক বাংলায় বৃহত্তর স্বার্থের কথা
ভেবে প্রথমে কংগ্রেসের কাছেই
কোয়ালিফিকেশন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব
দিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের কেন্দ্রীয়
নেতৃত্ব সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে বাধ্য
হয়ে কলকাতা হক মুসলিম লিগের দিকে
হাত বাড়ান। অসহযোগিতা কলকাতা হকের
সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কংগ্রেস
বাংলার মুসলিম লিগের কর্মসূচী পৌঁছান
পর সুযোগ করে দিয়েছিল। বলা যেতে
পারে দেশভাগ তার পরিণতি। সেদিনের
সরকারতীর কংগ্রেসী রাজনীতি কলকাতা
হককে ঠুঁড়ে কেলে দিয়েছিল মুসলিম
লিগের অনুগ্রহের সাহায্যে। কংগ্রেসের এ
কিছু খ্রিষ্টান শাসকরা বেশ উৎকর্ষই
হয়েছিল।

১৯৩৭-এর নির্বাচনে কলকাতা হক,
তাঁর কৃষক প্রজা দল একটি বিকল্প দ্বারা
সম্মাননা নিয়ে হাজির হয়েছিল। বিনা
কতিপূরষে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ,
বাধ্যতামূলক জৈবনৈতিক শিক্ষা প্রবর্তন
এবং বাংলা প্রদেশের জন্য পূর্ণ
স্বায়ত্তশাসন সহ ২২ দফা দাবির ভিত্তিতে
নির্বাহী ইন্ডেন্সের প্রকাশ করেছিল। অপর
দিকে মুসলিম লিগ ‘‘মুসলিম সংহতি’’ ও
‘‘ইসলাম বিশার’’ বব তুলেছিল। বিনা
কতিপূরষে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের কথা
কৃষক-প্রজা দলের নির্বাচনী কর্মসূচিতে
গুরুত্ব সহকারে থাকলেও বাস্তবায়ন করা
সম্ভব হয়নি মন্ত্রিসভায় মুসলিম লিগ
সদস্যদের অসহযোগিতার জন্য।
লিগ-প্রজা দল মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছিল ১
এপ্রিল ১৯৩৭। কোয়ালিফিকেশন মন্ত্রিসভার
১১ জন সদস্যের মধ্যে ৬ জনই ছিলেন
বিশ্বাশীল জমিদার প্রতীক। এই ৬ জন
হলেন—নবাব খান্দা হিমুজাহ (ফরি ও

শিষ্ট) ; সাধারণত নাজিমুদ্দিন (জব্বার) ; নবাব মোশারফ হোসেন (আজিম ও শিষ্ট) ; শাহ বিজয়প্রসাদ সিংহরায় (বাহাদুর) ; মহাবাজা সীলচন্দ্র নন্দী (নূত) ও প্রমোদেব রায়চন্দ (বন ও অজবাবী) ; অর্থমন্ত্রী নলিনীবাঞ্জন সরকার ছিলেন একজন পুষ্টিপতি। শ্রেণীবিন্যাসে এ কে কক্সবুল হক (প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষা), এইচ এম মোহাম্মদাবাদী (বাণিজ্য) ; সৈয়দ মোশেব আলি (বাণ্য ও স্থানীয় সরকার) এক বছরের মধ্যে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মুক্তাবিহারী মল্লিক (সমবায়, কৃষিকণ) ছিলেন আইনজীবী।

রাজনীতিবিদ : মন্ত্রিসভার সদস্য নিবারণেন মজবুত স্যার জন আব্দাফসনের মহামতিই ছিল চূড়ান্ত এ কারণে কৃষক-প্রজা দলের প্রতিনিধিত্ব অংশ হয়েছিলেন কক্সবুল ও বিতর্ক। এই সময় আইনসভার সদস্যদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন উকিল-বারিস্টার-জমিদার শ্রেণী থেকে আসল। ব্যবসায়ী-শিক্ষক-শিল্পপতিও ছিলেন। বাঙালার মুসলিম লিগে এখন অব্যাহতি প্রাধান্য ছিল। মুসলিম লিগ ছিল নবাব-নাইট, জমিদার-প্রতিক্ষাশীলদের দল। অপরদিকে কৃষক-প্রজা দল একটি অসাম্প্রদায়িক এবং বাঙালার অবাধিত মুসলমানদের রাজনৈতিক সংগঠন ছিল। কৃষক-প্রজা দল সর্বের অর্ধে কৃষক ও প্রজাদের দল ছিল না। তার মধ্যেও জমিদার-মহাজনী অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। কিন্তু বোর্ডের ওপর সাধারণ কৃষক ও প্রজাদের পার্থক্য কমত। একই সাথে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের বিরুদ্ধে পতি বিশেষে জনপ্রিয় ছিল। কক্সবুল হক চেয়েছিলেন কিছু-মুসলমান কৃষক-প্রজার আর্থিক পূর্ণতা দৃষ্ট করতে। নায়সমস্ত অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। তিরহাটী বনোবস্ত বা জমিদারী প্রচার উচ্ছেদই ছিল—কৃষক-প্রজা দলের প্রধান লক্ষ্য।

আগেই বলা হয়েছে মুসলিম লিগের অসহযোগিতার জন্য জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ নিয়ে কোন আইন করা কক্সবুল হকের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এমন কি ট্রাউড

টার মধ্যে অসহকার আন্তরিকতা ছিল না। পণ্ডিত হয়েও পাণ্ডিত্যের বাড়ী করতেন না। মিলমরিয়া উদার ছদ্মের মানুষ ছিলেন।

কমিশনের বিশেষ্ট জমিদারী প্রচার অবসানের এবং কৃষককে জমির প্রকৃত মালিক বলে সুশাসিত করা সত্ত্বেও ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে কক্সবুল হক বাঙালার ভূমি-রাজস্ব তদন্তের জন্য স্যার ফ্রান্সিস ট্রাউডকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিশন গঠন করেন। কমিশন ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে রিপোর্ট পেশ করে। ট্রাউড কমিশনের রিপোর্ট মিশিভিত কৃষক-প্রজার শোষণ-বন্ধনার মহামায়া। কমিশনে জমিদার প্রতিনিধিত্ব রিপোর্টের সঙ্গে যুক্ত শোষণ করেছিলেন। তাঁরা জমিদারী প্রচার পক্ষে হত প্রকাশ করে বলেছিলেন, জমিদারী প্রথা উঠে গেলে দেশে কমিউনিজম আসবে। ভায়েদী বার্ষিক বিবোখিতার জন্য কক্সবুল হকের পক্ষে সেদিন ট্রাউড কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের জন্য আইন করা সম্ভব হয়নি। কমিশনে আত্ম হতে বিভিন্ন সংগঠন স্মারকসিপি এবং যৌথিক সাক্ষ্য দিবেছিল। বঙ্কিম মুখার্জি ছিলেন ঐ সময় আইনসভার সদস্য এবং কৃষকভার নেতা। কৃষকভার পক্ষ থেকে তিনি যৌথিক সাক্ষ্য বিবে জমিদারী উচ্ছেদের পক্ষে দৃঢ়পূর্ণ ওয়া উপস্থিত করেছিলেন।

কক্সবুল হক জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ নিয়ে আইন করতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু তাঁরই আদেশে বর্ষীয় প্রজাবস্ত সংশোধনী আইন পাল হয়। জমিদারদের লায়ামদী

কমতা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৯৩৯ সালে চাকী-বাতক আইনের সংশোধনী এনে কৃষক সিসিপি বোর্ডকে নতুনসী করা হয়। ১৯৪১ সালে মহাজনী আইন দ্বারা কৃষকদের সুবিধা দেওয়া হয়। ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত দৃঢ় বাঙালার চাকী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ১৯৩৭-৪১ কৃষক-প্রজা ও মুসলিম লিগের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা; ১৯৪১-৪৩ প্রেসিডেন্ট কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা। উভয় মন্ত্রিসভার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কক্সবুল হক। কক্সবুল হকই দৃঢ় বাঙালার প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন নতুন পালনকর্তা অনুযায়ী। ১৯৪০-৪২ নাজিমুদ্দিনের প্রধানমন্ত্রিত্ব গঠিত হয় মুসলিম লিগ মন্ত্রিসভা। দৃঢ় বাঙালার শেষ মন্ত্রিসভা ছিল মোহাম্মদাবাদীর প্রধানমন্ত্রিত্ব— ১৯৪৩-এর ২৪ এপ্রিল থেকে ১৪ আগস্ট ১৯৪৭ পর্যন্ত মুসলিম লিগ মন্ত্রিসভা। এই চাকী মন্ত্রিসভাকালের মধ্যে কক্সবুল হকের প্রধানমন্ত্রিত্বের অধিনেই উপরোক্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইন গৃহীত হয়েছিল।

যদি বলা দরকার কক্সবুল হক বিপ্লবী ছিলেন না। বিশেষ কোন তত্ত্ব বা মতকর্মের দ্বারাও প্রভাবিত ছিলেন না। উপায়মতিকে মনেতাবাপন্ন ছিলেন। দেশের শতকরা ৮০ জনের জলভাণ্ডের কথাই চিন্তা করেছেন। মানবিক প্রেরণা তাঁকে উদ্ভূত করেছিল। মানুষের মঙ্গল সাধনই ছিল তাঁর মূল কথা। তিরিশের দশকে কক্সবুল হকই প্রোগাম তুলেছিলেন “লালম ঘর জমি ডায়—ঘর ঘর ধান ডায়”।

কক্সবুল হক ছিলেন দেশভাগের বিরুদ্ধে। ১৯৪৭-এর ৩ জুনের তারত ও বাঙালাকে বিভক্ত করার ঘাউন্ট্যাটনে পরিকল্পনা কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ সম্মতি জানাবার পর কক্সবুল হক হতান হয়ে পড়েন। ঘাউন্ট্যাটনে পরিকল্পনাকে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর করতে বাঙালার আইনসভার সদস্যরা (২৫ জন ইউরোপীয় বাদে), ২০ জুন ১৯৪৭ সালে আইনসভার একটি বিশেষ অধিবেশনে মিলিত হয়েছিলেন। অধিবেশনে উপস্থিত

সমস্যা ভারত অথবা পাকিস্তানে
যোগদানের ব্যাপারে এবং তাঁরা প্রবলতঃ
বিভক্ত করতে চান কিনা সে বিষয়ে সন্তোষ
জানতেই এমিন আইনসভার বিশেষ
অধিবেশন হয়েছিল। মুক্ত বাঙালার
আইনসভার এটিই ছিল শেষ অধিবেশন।
যেহেতু আইনসভায় মুসলিম লীগের
সংখ্যাধিক্য ছিল, সে কারণে তাদের পক্ষে
১২৬ জন অবশ্য ৭ জন তরফিস হিন্দু ও
একজন ভারতীয় দুর্দাসসহ পাকিস্তানে
যোগদানের পক্ষে এবং বাকি ৯০ জন
হিন্দু সমস্যা জেট দিয়েছিলেন। সেদিনের
অধিবেশনে মোট উইগেন্দার বার ২২৫
জন সমস্যার মধ্যে ২২০ জন উপস্থিত
ছিলেন। ২২০ জনের মধ্যে ২১৬ জন
জোট ঘেন। স্পীকার নুজল আমিন
জোটগানে বিহত ছিলেন। যোগেন হওস
অন্তর্ভুক্তি মন্ত্রিসভার সমস্যা হওয়ার তাঁর
আসনটি শূন্য ছিল। ০ জন কন্সিউনিস্ট
সমস্যা জোটগানে অংশগ্রহণ
করেননি—নিরপেক্ষ ছিলেন। এছাড়া ৪
জন সমস্যা অনুপস্থিত ছিলেন।

পূর্ব বাঙালার মুসলমানপ্রধান জেলায়
আইনসভার ১০৯ জন সমস্যা বহুভক্ত
বিশিষ্ট এবং ৩৫ জন সমস্যা পক্ষে জোট
ঘেন। পশ্চিমবাঙালার হিন্দুপ্রধান জেলায়
৫৮ জন সমস্যা বহুভক্তর পক্ষে এবং ২১
জন সমস্যা বিশিষ্ট জোট ঘেন। কোন
সমস্যা জোটগানে বিহত ছিলেন না।
কন্সিউনিস্ট সমস্যার জোট অংশগ্রহণ
করেন। পশ্চিমবাঙালার হিন্দুপ্রধান জেলায়
সমস্যাসহে মধ্যে মুসলিম লিগের নবীন
সোহরাওয়ার্দি, হাসান ইম্পাছদী, বাজা
নুসরতী ও আবুল হান্নিম ছিলেন।
পূর্বাঞ্চলীয় মুসলমানপ্রধান জেলায়
সমস্যাসহে মধ্যে ছিলেন কংগ্রেস নেতা
কিরপল্লী রায় এবং কন্সিউনিস্ট সমস্যা
অংশগ্রহণরায় রায়।

কুমত-প্রজা দল বহুভক্তের বিরোধী
ছিল। ফকরুল হক চাননি বহু বিভাগ
সম্পর্কিত কোন সিদ্ধান্তের সঙ্গে তাঁর নাম
হুক থাকুক। সে কারণেই তিনি ২০ জুনের
বিশেষ অধিবেশনে ইচ্ছাকৃতভাবে
অনুপস্থিত থেকেছেন। যে চরকন সমস্যা

হিলের অধিবেশনে অনুপস্থিত ছিলেন
ফকরুল হক ছাড়া কংগ্রেস নেতা কে সি
গুপ্ত যিনি বিশেষে থাকার উপস্থিত হতে
পারেননি। এছাড়া লক্ষ্মীচরণের
অনুপস্থিতিতেও মধ্যে গোয়ে পড়ে
মহম্মদসিং-এর মওলানা শামসুল হুদা এবং
ডেপুটি স্পীকার ডোলাচন্দ্র আলিহ নাম।
মতকরা ১৫ জনের জোট নির্বাচিত
জনপ্রতিনিধিদের রায়ে সেখিন দেশের
তামা নির্বাচিত হয়েছিল।

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতের
স্বাধীনতা দিবসে ফকরুল হক কলকাতায়
ছিলেন। দেশ তামা হওয়ার তিনি
গভীরভাবে ঘর্মহিত হয়েছিলেন। ঘটনাটি
ছিল তাঁর কাছে বেদনাকারক। তিনি বিশ্বাস



তিরিশের দশকে ফকরুল

হকই স্লোগান তুলেছিলেন

“লাসল যার কমি

তার—ঘাম যার ধান

তার।”



ফকরেন দেশকে ভাগ করে হিন্দু-মুসলমান
সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। ভারতের
স্বাধীনতা দিবসে হিন্দু ও মুসলমানদের
প্রতি তিনি শক্তি প্রতিষ্ঠার আহ্বান
জানিয়েছিলেন। পরে ১৯৪৮ সালের
প্রথম দিকে তিনি ঢাকা চলে যান।

ফকরুল হকের মধ্যে পরস্পরবিরোধী
গুণের সমাবেশ ছিল যেমুসলমানতা-
আবেগপ্রবলতার মধ্য দিয়ে ফকরুল হক
ছিলেন এক ব্যক্তিত্বী চরিত্রের মানুষ।
রাজনৈতিক দ্বিহতা তাঁর পক্ষে সব সময়
বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। জাতি-ধর্ম-
বর্ণবিশিষ্টেই সর্বসম মানুষকে তিনি
ভালবাসতেন। তাঁর সময়কালে তাঁর মধ্যে
দীর্ঘদিনের ১৯১০ থেকে আইনসভার

সমস্যা আর কেউ ছিলেন না। শিকারি,
সুভাটা এবং আইনজীবী হিসাবেও তিনি
সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর মধ্যে অহংকার
আনুভূতি ছিল না। প্রতিভা হতেও
পাণ্ডিত্যের বড়াই করতেন না। ফিলসফি
উদারমতের মানুষ ছিলেন। কোন সময়ই
সাম্প্রদায়িকতা তাঁর মনোভাবকে ক্ষুণ্ণিত
করতে পারেননি। প্রসঙ্গত এতটী তামপর্ণপূর্ণ
হিন্দুর উল্লেখ করছি। ১৯৪৬-এ অন্তর্ভুক্তি
সরকারের সমস্যা হিসাবে জওহরলাল
নেহরু গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়ার্ডেলের
কাছে ফকরুল হকের নাম প্রস্তাব করতে
লর্ড ওয়ার্ডেল তীব্র আপত্তি জানান। ফলে
নেহরু আর অনগ্রসর হননি। “Wavell
The Viceroy's Journal” থেকে
ঘটনাটি উল্লেখ করলাম। উল্লেখ করলাম
এই কারণে ফকরুল হকের নাম প্রস্তাবিত
হয়েছিল কংগ্রেস পক্ষ থেকে। কংগ্রেস
কখনই কোন সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিকে সমর্থন
করেনি।

ফকরুল হক ১৯৩৫ সালে
সর্বসমস্যাভিত্তিক কলকাতা শৌরসভার মেয়র
নির্বাচিত হন। ফকরুল হক হর্নের নামে
মানুষকে কোন সময়ই বিভ্রান্ত করেননি।
হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে
ঐক্যবদ্ধতা বাড়িয়ে দেওয়ার দৃষ্টি
নাই—এ-কবার বিশ্বাসী ছিলেন।
হনে-প্রাণে, পোশাকে আচরণে ছিলেন
খাঁটি বাঙালি। ফকরুল হকের ভাষায় :
সবত্রি আখি বাঙালি—ভারতীয় মুসলমান।
অচ্যুত প্রমুখ্যন্তর রায়ে ভাষায় : ফকরুল
হক ছিলেন—মাথার চুল থেকে পায়ে
নখ পর্যন্ত খাঁটি বাঙালি। হিন্দু-মুসলমান
ঐক্যের প্রতীক। ফকরুল হক বাঙালি
জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন।
অবাঙালিদের আশ্রিতা কেন। সময়েই
মেনে নিতে পারেননি। ফকরুল হকের
কাছে স্বাধীনতার অর্থ ছিল—মুঠোয়
কয়েককনের স্বাধীনতা ন—দেশের
প্রত্যেকটি নর-নারী ও শিশুর স্বাধীনতা।
ফকরুল হকের জনপ্রিয়তা-খ্যাতি ছিল
দেশব্যাপী : জীবিতকালেই তিনি
কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি
ছিলেন আয়করজার ‘হক সাহেব’।

ফজলুল হক : একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক

সলিল গাঙ্গুলি

প্রয়াত ফজলুল হককে সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বলা যায়। বাংলার কৃষক, গরিব মানুষের স্বার্থে তাঁর ব্যক্তিগত সন্তান, কর্তব্যনিষ্ঠা, ন্যায্য এবং আন্তর্জাতিক সহসাময়িকদের মধ্যে তাঁকে উচ্চ আসন দিয়েছিল। পোষিত, বঞ্চিত মানুষদের জন্য তিনি অসংখ্য কাজ করে গেছেন। এর মধ্যে দু-একটি উল্লেখ করা যেতে পারে। তৃষ্ণাযন্ত্রের স্বেচ্ছাসেবামূলক উদ্দেশ্য করে ১৯২৬ সালে তাঁরই নেতৃত্বে সংগঠিত হয়েছিল কৃষকদের হালকা আন্দোলন। কৃষকদের স্বার্থে গমন করেছিলেন স্বপ্ন শীতলো পর্যন্ত, অনুমান করিয়েছিলেন বাংলা মহাজনী আইন। সাম্প্রদায়িক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক শক্তিশালী তিনি চিরকাল বিরোধিতা করে গেছেন। ঐ শক্তিশালী মনোভাৱে ছিল কিছু কার্যেই স্বার্থের মানুষ। আসলে ফজলুল হক ছিলেন আত্মবিশ্বাসী ও নীতিনিষ্ঠ। শ্রেণীবিভাজনের ভিত্তিতেই তাঁর সহানুভূতি ছিল গরিব, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতি। কিছু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সেই সময়ের অবিকালে নেতাই ছিলেন কার্যেই স্বার্থপরগণের ধর্মঘরী। ১৯৩৭ সালে অবিভক্ত বাংলার মূলত তাঁরই উদ্যোগে গঠিত জোট মন্ত্রিসভা ডেকে পড়ে পরিকল্পিত কংগ্রেসের অসহযোগিতায়। গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন

কংগ্রেস সেইসময় ফজলুল হককে দ্বন্দ্বিতা যোগায়নি, যা সত্যিই দুঃখজনক ঘটনা। শ্রেণীস্বার্থে জমিদার, বড়লোকদের পক্ষ নিয়েছিল কংগ্রেস। এজন্য সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিনষ্ট হয়েছিল। কংগ্রেসটি এমনকি গণ্য।



১৯৩৭ সালে অবিভক্ত বাংলা মূলত তাঁরই উদ্যোগে গঠিত জোট মন্ত্রিসভা ডেকে পড়ে পরিকল্পিত কংগ্রেসের অসহযোগিতায়। গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সেই সময় ফজলুল হককে দ্বন্দ্বিতা যোগায়নি, যা সত্যিই দুঃখজনক ঘটনা।



কংগ্রেস এবং বাংলার মন্ত্রিসভা গঠন ১৯৩৭ সালে বিচ্ছিন্নে সর্বস্বত্বীয় কংগ্রেস করিয়ে ঐক্যে দ্বিগুণ হয়, প্রাথমিক নির্বাচনগুলিতে বল

সংবাদগণিতের পেনেলই মন্ত্রিসভা গঠন করবে। প্রবাসীদের তুলনায় কম আসন ছেলে জোড়ায় অন্য মন্ত্রের সঙ্গে গাটাইতে বেঁধে মন্ত্রিসভার মাঝে না। নির্বাচন হয় ১৯৩৭ সালেই। অবিভক্ত বাংলার কংগ্রেস সংবাদগণিতের পায় না। সিদ্ধান্ত হয়ে মাঝেতে ফজলুল হকের উদ্যোগ সত্ত্বেও কৃষক-প্রজা গাটাই সত্ত্বে জোট বেঁধে বাংলার মন্ত্রিসভা গঠনে পিছিয়ে যায় কংগ্রেস। এর ফলে বাংলার রাজনীতিতে অবিভক্তা বিস্তার করে মুসলিম লিগ। বাংলা ভাষার লিগ সূত্রগত তখন থেকেই। মুসলিম লিগ চায়, পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হোক পূর্ববাংলায়। আসর বিশেষের কথা বাংলার নেতৃত্ব পুরোপুরি উল্লসিত করতে পারলেও গান্ধীজীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস ভাষার গুণিত সিদ্ধান্তেই অনড় থাকে। এর জন্য গান্ধীজী এবং সূত্রগত বস্তু মধ্যে হয় চিঠি বিনিময় হয়। প্রকাশিত ঐ চিঠিগুলি পড়লেই বিবর্তিত আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বরে গান্ধীজী এক চিঠিতে সূত্রগত বস্তুকে সিদ্ধলেন, 'মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মল্লিকারজুন সরকার এবং যশোদামল সিংহ'দের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর আমার মনে হলো বাংলার মন্ত্রিসভাকে (মুসলিম লিগ ও কৃষক প্রজা গাটাই নিয়ে গঠিত)

পরিচয় করা উচিত হবে না। ঐ শব্দবহন কোন লোক নেই। বরঞ্চ কৃষক প্রজা পশুটি মৃত্যু ঘোঁট ঘোঁটে কাংগ্রেস মাইসভা গমন করলে, জড়ি হুতা বাজবে। নাকি সন্তোষ আমর ফলোনে, বহননা ঘোঁট মইসভা না মোশর হক মইসভা কোন লোকের নে, তাহলে তিমি ইকল মইস ভিহা কইনে না। নাকি সন্তোষ ছিলেন ঘোঁট মইসভা (মুগ্ধতা)।

এর কারণ ১৯২৮ সালের ১১শে জানুয়ারি মুজাফ্ফর আল-মুজাফ্ফর লিখলেন, 'আমরাও ইকল আমর হুতা পেলো'। কাংগ্রেস মাইসভা গমন মইস আমর মত আমর বর হক হয়েছিল। কিছুদিন আগেও গোবর্ষ এ মইস হক হক। আমর বহন শব্দেই বহন সন্তোষ মইসভা গমন মইস হক হয়েছিল আমর। হুতনেই পরিভাষ মইস আমর, বাংলায় কৃষক-প্রজা পশুটি মৃত্যু ঘোঁট ঘোঁটে কাংগ্রেস মাইসভা গমনে ভিত্তিহীনভাবে অর্পণ করবার সমর্থন জানিয়েছিলেন। গোবর্ষ আমরকে পরও অর্পণ ভিত্তিহীন মইসভা পশুটোলেন, তা আমর বেমায়া হক না। ঐ পরিভাষ, অর্পণ, নাকি এবং বিভ্রান্ত সন্তোষ কইনা কইনা পরই আমর মত করেছিল। বিধেই এখন এইকই দাঁড়ালে, বাংলায় কাংগ্রেসের লবিপ্রান্ত নেতৃত্বের উচিতও অর্পণ ঐ বিভ্রান্তে মতামতে বেশ উচ্চ ছিলেন।

অমি সন্তোষ কাংগ্রেস নেতা শব্দেই বসুকে ঘোঁট মইসভা চলনের লবিহু ঘোঁটে মইস লবিহু জড়ি ছিলেন ফজলুল হক। কিন্তু কাংগ্রেস টাইকনাও বেঁচে বসে। ফলে ১৯২৭ সালে ফজলুল সন্তোষ নেতৃত্বে মুসলিম লিগ ও কৃষক-প্রজা পশুটি মইসে ঘোঁট মইসভা গমন হক ফলোয়। এছাড়া অন্য কোন উপায়ে ছিল না ফজলুল সন্তোষ।

ফজলুল হক কিন্তু মনেপ্রাণে প্রসন্ন ছিলেন না মুসলিম লিগের উপর। কেননা দলটি চলেই দলত মুসলিম জমিদারদের



হিন্দু-মুসলিম লিগের সভাপতি

মদতে। পরের কৃষকদের উপকারের কলমে লিগের নেতারা দুই দুইয়ে মইসে মুসলিম প্রজাদের মইস গমন পরে সাংসদমতকে সন্তোষ চলেগমন। পরে মুসলিম কৃষকের সাংসদ বিশেষত শব্দেই বেশি ছিল। এর বেশপ্রতি জা চলেই তা বেঁচে বসে ১৯২৮ সালের একটি দিনের

পাথে। নীলমঞ্জরী জৈনবর্ষ অতিমত হলো, মাদগোড়ী সমাজের স্বার্থকলমে ঘোঁটে উৎসাহী ছিলেন গাছীজীও। কাংগ্রেসের প্রতি তিমি সন্তোষ ছিলেন না, বিশেষত মইস এবং পরে বসুর প্রতি তো নই। ঐ অতিমতের সন্তোষ নীলমঞ্জরী কোনো গমনকলমে প্রমাণ অবশ্য নবিল করতে পারেননি। তবে শব্দেই কলমে গাছীজী-মইস বসুর মইসই প্রমাণ করে, নীলমঞ্জরীর দলগমন ডুল ছিল না।



ফজলুল হক কিন্তু মনেপ্রাণে প্রসন্ন ছিলেন না মুসলিম লিগের উপর। কেননা দলটি চলত মূলত মুসলিম জমিদারদের মদতে।



পালন করেছিলেন। কেননা বিভাগ মইস হয়েছিল, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বাংলায় ঘোঁট মইসভা গমন কলমে যাবনা-যাবনা, অর্থাতির উপর মাদগোড়ী সমাজের আধিপত্য বর হতে

কাংগ্রেস সম্পর্কে ফজলুল সন্তোষ অতিমত ঘোঁটেই সুখকল ছিল না। তবে কৃষকদের স্বার্থে অনেকপ্রমাণ বসুর হিসেবে তিমি অনেক সময় কৃষক জাতিগণের সমর্থন প্রত্যাশা করতেন। এর সবকইয়ে গুণকলমে লিখিত ঘটে ১৯২৮ সালে। বাংলায় সন্তোষের গতে তৎকালীন রাজ্যের সন্তোষ প্রজামন্ত্র মইস 'বাংলার প্রজামন্ত্র সাংসদমন্ত্র মইস ১৯২৮' লেটে ৭ আগস্ট ১৯২৮ সালে গেল করেন। ঐ সাংসদমন্ত্রে বিভাগমন্ত্রী জমিদারদের হাতে নজিরবিহীন কমতা বেদাণ কইনা উল্লেখ ছিল। অত্যাধি উৎসাহের সন্তোষ টাইকনীয় এবং হিন্দু-মুসলিম মিথিলায় কইনারী সমস্যার দিকটিতে বিশৃঙ্খলভাবে সমর্থন জানালেন। প্রথম সমর্থন জানিয়ে এ কে



১৯৪০ সালে লাহোর প্রত্যাবর্তনকালে তুসলিম 'লি' নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ভিক্টর ওও

ওজনবি হলেন, জমিদার এবং প্রজাসভার স্বার্থ একই। আর প্রজাসভার সম্পত্তি, সামাজিক কল্যাণের বিকটি সেখানালের দাবিত্ত জমিদারদের। এটুকুই বিলটি সমর্থন করা হচ্ছে। শুধু জমিদাররাই নয়, পুর্তগালনকভাবে স্বরাষ্ট্রপন্থীরা পর্বস্ত সমর্থন জানানেন বিলটি। তাঁদের ভয়েতে নসিরাইজ্ঞর সরকার বললেন; ১৩৫ বছরের ইতিহাস ঘুরে দিয়ে হঠাৎ করে নতুন কিছু চিন্তা করা যায় না। অস্তিত্বের ধারা অনুযায়ীই তাঁরা জমির অধিকার লাভ করেছে। তাঁদের স্বার্থবিকা করা উচিত। আর এই অধিকার তাঁরা উপভোগ করছেন সেই জিহাদী বন্দোবস্তের সময় থেকেই। বেশকিছু চিত্তবিরম্ন লিপির স্বাক্ষর পাটি জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনকে 'কলনৈতিক মতবাহ' বলে বিদ্রোপ করতেন। সরকার আরও বলেন, 'সমাজের সকলস্তরে মানুষের সমানঅধিকারের যে চেতনা জাগ্রত হচ্ছে, তার ভিত্তিতে জমিদারদের আরের দাবী বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা সঠিক হবে না। জিহাদী বন্দোবস্ত অনুযায়ী তাঁরা ঐ অধিকার লাভ করে আসছেন। এই ঘটনার শুধু আঘাত নয়, আঘাত কলও প্রতিষ্ঠাকাল থেকে এই ঘটনাত্তে বিদ্যমান।' কে এহ সেনওপু, কিরপনভর গায়, লহরগল্প বসু বা মতবল থেকে নির্বাচিত আইনসভার স্বরাষ্ট্রপন্থী

সমস্যাও সবকছরে সুবেই উদ্দেশ্য মতামত জনন। এতমাত্র অব্যাপক জিতেন্দ্রসাল বানার্জি স্বরাষ্ট্রপন্থীদের

কংগ্রেস সম্পর্কে ফজলুল হকের অভিজ্ঞতা মোটেই সুখকর ছিল না। তবে কৃষকদের স্বার্থে আবেগপ্রবণ মানুষ হিসেবে তিনি অনেক সময় ভুল জ্ঞায়গায় সমর্থন প্রত্যাশা করতেন।

নির্ণেপ উপেক্ষা করে বিলটির বিরোধিতা করেন। কঠোর ভাষায় বানার্জি বলেন, ওজনবি আমাদের সামনে এল জ্ঞাননিষ্ঠ, সুখর দাষ্ট্রের চিত্র ভুলে ধরলেন। যেখানে জমিদার ও কৃষকদের

মাঝে কোনও স্বার্থভেদ বশ নেই, জমিদার কল প্রত্যয়েব হা-বশা, প্রত্যয়েব বিলুপ্ত নন বসে জমির মালিকের প্রত্যাক বংশবৈকল্যে উদ্ভাস লিন কাটে। এট চিত্রটি মিথ্যা, ভ্রান্ত এবং অতিরঞ্জিত। কিন্তু কিছু ক্ষেত্র থেকে সুসংলিগও এসেছে যে, বর্তমান বিলটির কলয় অস্বা উচিত ছিল প্রজা সুখক বিল। আমি এই বিলের বিরোধিতা করছি। কেননা এই বিলটি জমিদারদের সুবজ্ঞাভেই নিশ্চিত করেছে। এখন তাঁর যে কলমতা ভোগ করে তার চাইতে আরও অতলম্পাত্তে কলমতা তাঁরা লাভ করবে বিলটি পাস হলে। না বাংলায় জমিদারতন্ত্রের ইতিহাসে নসিরাইজ্ঞর পৃষ্ঠাশ্রু হয়ে থাকবে। তিনি আরও বলেন, আমলদা কী চিন্তে চাইছেন? প্রথমত, আমলদা মোটে হলে ২২ লক্ষল চিন্তে চাইছেন সেকলী হিসাবে। আমি আগেই বলেছি, অনুমানিক প্রতি বছর দু কোটি টাকা লক্ষ লক্ষ জমিদারতন্ত্র লেনছেন হু। তবে অর্থ, আইনগত ব্যবহার করে জমিদারদের চাপ্তে লংসবিত্ত ৫০ লক্ষ টাকা তুলে দেবেব ধাবা করা হল। যা লর্ড কর্ণওয়ালিসের হুইমনিটির কুলল। দ্বিতীতে, জমিদারদের হুইত প্রতীটি ক্ষেত্রে হয় কলার অপ্রাধিকার বেেচা হল।

এ কে ফজলুল হকও কতা ভাষায় সমালোচনা করেন বিলটির। সমসাবি কে এল বানার্জি দ্বিতীকে সমর্থন জনন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে হক বলেন, 'বিলটিতে জমিদারদেরই যে স্বার্থবিকা করা হয়েছে, তা সঠিকভাবে তুলায়ন করেছেন আমার বন্ধু কে এল বানার্জি। আসলে জমিদারদের স্বার্থ চরিত্র করভেই ওজনবি আইনসভায় ঐ বিলের সপক্ষে বলেছেন।'

আইনসভার তিতরে ও কইরে বিলটি নিয়ে এক হাসের বেশি বিতর্ক হল। দলীয় স্বার্থে নয়, শ্রেণী স্বার্থে বিলটির পক্ষ-বিশত নির্বাগিত হুইছিল। জমিদার ও কইরী স্বার্থকথী লোকজন ছিলেন একতীকে আর অপরতীকে ছিলেন

আজকের বাংলা

১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আইনসভায় নাজিমুদ্দিন মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে অর্থমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী বাজেট পেশ করেন। ফজলুল হক তখন অসুস্থ। চিকিৎসকদের নিষেধ সত্ত্বেও আইনসভায় উপস্থিত হলেন বাজেট সম্পর্কে বক্তৃতা করতে। শ্রীকার নৌসের আলিকে অনুরোধ করলেন তাঁকে আসনে বসে বক্তব্য রাখতে দিতে।

শ্রীকার নৌসের আলির আগতি ছিল না। মুসলিম লিগের ফজলুর রহমান বললেন, অনুমতি দিলে এটা হবে একটা খারাপ নজির। ফজলুল হক বিতীয়বার অনুমতি প্রার্থনা করেননি। বাজেটের ওপর ২৭ ফেব্রুয়ারি ফজলুল হকের প্রদত্ত ভাষণ তুলে ধরা হল।

কিমুনি পূর্বে বাংলার অর্থমন্ত্রী বঙ্গীয় আইনসভায় বাজেট পেশ করতেন। আমার প্রাথমিক ও কেন্দ্রীয় উভয় পরিষদে—৩০ বছরের অধিক বঙ্গীয় আইনসভায় এবং ২ বছর কেন্দ্রীয় আইনসভায় বার্ষিক বাজেট সম্পর্কে নিখবিসের বিচিত্র এবং বিরতিহীন অভিজ্ঞতাকালে আমি এমন বাজেটের উদাহরণ স্মরণ করতে পারছি না যা একটি সরকারের অর্থনৈতিক নেতিবাচকতার চিত্র জনগণের মধ্যে এত গভীর প্রতিফলিত সৃষ্টি করেছে। মর্শে-বিদো সাংসদ প্রকর্তনের পর এবং বর্তমান আইনসভার পূর্ববর্তী বঙ্গীয় আইন পরিষদের সঙ্গে ১৯১২ সনে আমার সম্পর্ক শুরু হয় এবং তারপর থেকে বিরতিহীনভাবে আসে আসে ২ বছর ব্যাপ্তি আমি বঙ্গীয় আইনসভায় সঙ্গে যুক্ত হিলাম। ২ বছর আমি কেন্দ্রীয় আইনসভায় সদস্য হিলাম। আমি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরাট অঙ্কের বাটনি বাজেটের উদাহরণ দেখি। কিন্তু এমনকি এই সকল আতঙ্কজনক বাটনি বাজেট কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিকভাবে ছিল না। কিন্তু বর্তমান বাংলার নেতিবাচকতার বিষয়টি ইতিমধ্যে

নজিরবিহীন। এটা নেতিবাচকতার এত আতঙ্কজনক ও হতবুদ্ধিকারী যে, তা পূরণের কোনও অবকাশ নেই। আমরা এ বিষয়ে যত চিন্তা করি ততই হয়ে গাই এবং উদাস হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হই। অর্থমন্ত্রী আসল দিবেছেন যে, আমরাই ১০ এপ্রিলের মধ্যে বাটনি প্রায় ২০ কোটি টাকার শৌক্যে পাবে। কিন্তু আমরা নিশ্চিত অনুমান যে, প্রকৃত বাটনি ৫০ কোটি টাকার কাছাকাছি হতে পারে। অবশ্য এতই ভয়ঙ্করভাবে আতঙ্কজনক যে, দেশে একটি বিলম্ব ঘটতে পারতো, যদি এদেশের জনগণ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং এমন কি নৈতিকভাবে সম্পূর্ণ দূরত্ব বরণ না করতো। আজ আমি প্রকৃতপক্ষে িকিৎসকের নির্দেশ অমান্য করে আইনসভায় এসেছি। কারণ আমি অনুভব করি যে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি কিনা চ্যালেঞ্জ থেকে দিতে পারি না। সংসদীয় জনতা দ্বারা গণিতজ্ঞানহীন মন্ত্রীদ্বয়ের দ্বারা দ্রুত জংসের দিকে এদিয়ে যাচ্ছে, তাদের কাছে প্রকৃত ঘটনা তুলে না ধরে পাড়া যায় না।

অনেকে আছেন, যাঁরা মনে করেন বাজেটে যে সাংঘাতিক ঘটনি দেখা

বিষয়েই তাব জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ দাবী এবং এ সকল কারণের ওপর মন্ত্রীদ্বয় কোনও হাত ছিল না। আমি এখনই প্রমাণ করবো যে, এ ঘটনি জনতহবিলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদ্বয়ের দ্বারা হীন অপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থার অবশ্যজ্ঞাবী পরিণতি। তাঁরা লক্ষ্যহীনভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির শ্রীতি অনুসরণ করেছেন। ঘোমের হাতে জনগণের তহবিল আছে তাঁদের মধ্যে স্বতন্ত্রমনস্কদের মধ্যে ধনী হওয়ায় জন্য বয়েসে অবস্থা আকাক্ষা। যাহু সেমিন দ্বারা শাহাদুদ্দিন বর্তমান মহিসসভার অর্জিত সাফল্যের গৌরব কবহিলেন। আমি স্বীকার করছি এমন কীর্তিই বৌবগায়া শুনে পরিষদ আশ্চর্য হই নি। এইসব মন্ত্রী মুসলমানদের হিন্দু ও খ্রিষ্টানের অধীন থেকে মুক্ত করা এবং সুখিহিতে পাকিস্তান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিশেষভাবে আত্মাহুঁ দ্বারা কুমতাপ্রাপ্ত হইবে। তাঁদের নিশ্চয় অনেক কীর্তি আছে। উদাহরণস্বরূপ, জনগণ দ্বারা প্রকৃত-পক্ষে না ধরে দ্বারা যাচ্ছে, তখন তারা পাটকল মালিকদের ঘোটা লাভের নিশ্চয়তার জন্য পাটের সর্বোচ্চ দ্বারা নিধারণ করেছেন, কুম দ্বারা কতের দ্বারা শিষ্টগণ করেছেন এবং তারা

অসহ্য বাঙালিদের ঘাতে অর্ধ ডজন
নবোক্ত কৃষক বোকা চাপিয়ে নিচ্ছেন।
কিছু বর্তমান মন্ত্রিসভার দুটো কীর্তি
ইতিহাসে সত্যের হয়ে থাকবে। প্রথমটি
হলো সাম্প্রতিককালের ইতিহাসে
তুলনামূলক ক্ষেত্রসমূহ দুটি। এ দুটি
তারের ক্ষমতা গ্রহণের পর শুরু হয়েছে
এবং এখনও তা প্রসারিত হওয়ার কোনও
লক্ষণ দেখা হচ্ছে না। দ্বিতীয়টি হলো
জনগণের তরফের সৃষ্টি সর্বস্বামী বাটতি,
বা এমন এক কয়েকটি সৃষ্টি করেছে, যার
শীতল মুখের সংখ্যা যে জাতীয় বিশ্বাস
যার মুখোমুখি আমরা হয়েছি, তার বিরুদ্ধে
কৃষক না ধর্মজনা পর্যন্ত আমাদের অস্থি
চক্ষুর হাতাধিত্রি নিয়ে প্রবেশ করছে। এ
দুটিকেই বলে জনসংখ্যা যে শূন্যতা সৃষ্টি
হয়েছে, তা পূর্ণ করতে কমপক্ষে ৪০টি
প্রজন্মের প্রয়োজন হবে। কিন্তু বাংলা
অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করতে কমপক্ষে
১০০ প্রজন্ম লাগবে। দুর্ভিক্ষ মানুষের সৃষ্টি
বলে পরিচিত লাভ করেছে। ত্রেনিডাডে
বর্তমানে কখনো ঘাটতি থাকেই সৃষ্টির মূল
যে মানুষ সেটাও সহজেই অস্বপ্নে এবং
তার সৃষ্টির মূল স্বত্বমান মন্ত্রিসভা। আমরা
হাতাধিকৃত্যে প্রস্তুত করবো এত অল্প সময়ে
কি করে মন্ত্রিসভা এতগুলো কীর্তি অর্জন
করতে পারবেন? আমার কাছে এ প্রশ্নের
উত্তর খুবই সহজ। প্রথমত আমার মতে,
যাযু অবস্থা হলো বর্তমান মন্ত্রিসভার
ক্ষমতা গ্রহণের সময় বিতিলিসী সরকারের
পরিবর্তে বাংলাদেশে বিদ্যমান নৈরাজ্যিক।
দ্বিতীয়ত, বাংলায় যে সরকারের নবুনা
জায়ে, তা গণতন্ত্রের পরিপন্থী; কারণ
বাতিহুজ্জানহীনতার সঙ্গে ক্ষমতা প্রয়োগ
করে, এমনকি তা গনবীর স্বত্বও তার
ইচ্ছা করে। ১৯৩৪ সালের আইনে
প্রবর্তিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকে
সম্পূর্ণভাবে রদা দিয়ে হত্যা করা হয়েছে।
পূর্বে আমদান্য বা বেচ্ছাচারী ক্ষমতা
ব্যবহার করতো, তার চেয়ে বর্তমান
অবস্থার অবনতি হয়েছে। দ্বিতীয়ার্ণ বর্তমান
অভ্যাসকৃত সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্য
পালীতভার প্রতি প্রাচ্য না দেখিয়ে
বেশবোঝাভাবে জনসমূহের অর্ধের অপচয়

করেছে। সে জন্য ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে এবং
কং- এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে কং
কার্যে প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।
আইনসভার উপস্থিতি প্রব্রব্দ মেঘা
চিত্রিত কচিৎ ভোট প্রদান হয় বরং
অনেক ক্ষেত্রেই দুর্নীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট
বিষয়ে ভোট দেয়া হয়। কংসে একজন বহীষ
আইনসভা সারা ভারতে কুখ্যাতি অর্জন
করেছে অথবা যে সকল বিরোধী বিষয়
অর্থেই সঙ্গে জড়িত নয়, সেখানেও
আর্থিক লাভের হিসেব করা হয়। দ্বিতীয়ার্ণ
এমতাবস্থায় সুযোগ গ্রহণ করতে সক্ষম
হয়েছেন এবং সত্যতা ও ন্যায় নীতির সঙ্গে
সম্পর্কহীন স্বেচ্ছাচক্র ও বিভিন্ন পদ্ধতির
মাধ্যমে দ্বিতীয়ার্ণ সমর্থন লাভ করে
নিজেস্বত্বকে দুর্বো অস্থায় প্রতিক্রিয়া
করেছে। তারা এখন দ্বিতী শাসনকর্তার
পরিণত হয়েছে। তারা নীমাহীন বেচ্ছাচারী
ক্ষমতা ব্যবহার করেছে এবং যার ফলে
অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রশাসন জনগণের
কাছে কলঙ্কিত হয়েছে।
অমি বলেছি যে, শাসনতন্ত্রের বিক-
বিয়ে বাংলায় কোনও সরকার নেই।
আশাভ্রষ্ট ১৯৩৪ সালের আইনের অধীন
একটি সরকার আছে যার সম্পর্কে সে দিন
চারত সন্নি উল্লসিত হয়ে বলেছিলেন
যে, এ সরকার আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠের
আহ্বাজজন মন্ত্রিপরিষদ দ্বারা গঠিত। কিন্তু
যাক্তবত আসল ঘটনা কি? ১৯৩৪ সালের
আইনের অধীনে সম্পূর্ণ গণতন্ত্র থাকতে
হবে। যেখানে প্রাদেশিক সরকার কাজ
করবে, সেখানে সরকার হবে জনগণের,
জনগণের দ্বারা নিবর্তিত আইনসভার কাছে
ঘাড়ো দাখী নয়, বরং মুসলিম লিগের
প্রধান হিসেবে মিঃ জিন্নাহর কাছে দাখী,
দ্বিতীয়ার্ণ যত দিন মিঃ জিন্নাহর সমর্থন
পাবে, ততদিন তাদের স্বস্বশাসনের সঙ্গে
আলোচনার প্রয়োজন হয় না। কারণ তাঁরা
জানেন সমস্যার উদ্দেশ্য নির্বাচনী
এলাকার স্বত্বাধিকার প্রয়োজন হয় না বরং
জঁরা জিন্নাহর সখিচ্ছা লাভের জন্য উচ্ছিন্ন।
এটা শুনতে বিশ্বব্যক্তি লাগবে। কিন্তু এ
হলো আসল সত্য ঘটনা। মুসলিম লিগের
বাইরে মুসলমানগণ দু' ত্রেণীতে বিভক্ত।

প্রথম হল যারা মুসলিম লিগের আদর্শ
গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁরা জিন্নাহর
বেচ্ছাচারিতার জন্য লিগে যোগ দিতে
পারছেন না। দ্বিতীয়ত, যারা মুসলিম
লিগের আদর্শে বিশ্বাসী নন এবং তাঁরা সে
জন্য সমাজে মুসলিম লিগের বাইরে
মুসলমানগণ সংখ্যায় লিগের চেয়ে বেশি
হলেও তাঁরা সম্পূর্ণ অসংগঠিত এবং সে
জন্য তাঁদের মিঃ জিন্নাহর রাজনৈতিক ও
কূটনৈতিক তৎপরতার বিরোধিতা করার
পক্ষে নেই। অতুল অবস্থাসমূহ মুসলিম
লিগকে সাহায্য করেছে। প্রাথমিক
ব্যবস্থাপনাকালে দাউদ প্রদেশে কংগ্রেস
সরকারের আমলে কংগ্রেস বেচ্ছাসেবক
এবং সরকারি অতিসম্মরণ অনেক বিষয়ে
অতিব্যত্য়ার অশালীন কাজের জন্য অপর্যাপ্ত
ছিলেন, সে জন্য ন্যায় আধিকারের ওপর
হস্তক্ষেপ করলে মুসলমানগণ প্রচণ্ডভাবে
প্রতিবাদ জানান এবং যার ফলে ভারতের
মুসলমানের মধ্যে প্রচণ্ড হিন্দু-বিরোধী
মানোভার সৃষ্টি হয়েছে। মুসলিম লিগ দ্রুত
সে সুযোগ গ্রহণ করে। বিরোধীরা প্রায়শা
এবং ঘটনার বিরুদ্ধে পূর্ণিকি ঘটিয়ে জঁরা
কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলমানদের মধ্যে
দাউদ উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং পরবর্তী
পর্বে হিন্দুদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে।
এভাবে মুসলমানদের একত্রে সংগঠিত
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং হিন্দুদের
নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের একত্রে
আন্দোলন বর্ধন করে মুসলমানগণ
স্বতন্ত্রভাবে মুসলিম লিগের নিকে আকৃষ্ট
হয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতিও
মুসলিম লিগের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক
পত্রির অসুস্থকে কাজ করে। কারণ ব্রিটিশ
সরকার আসা করেছিল যে, কংগ্রেসের
রাজনৈতিক অগ্রগতির বিরুদ্ধে মুসলিম
লিগকে গঁড় ক্যানো সত্ত্ব হবে। বলে
মুসলিম লিগ দেশে পা রাখার ঘাট
পেয়েছে। যদিও মুসলিম দ্বার্য একতাকারী
হিসেবে সত্যিকার প্রতিিনিধি হিসেবে লিগ
ততটা দাবি করতে পারে না। দ্বিতীয়ার্ণ
মুসলিম লিগের পক্ষে পুরোপুরিতাবে
ব্যবহার করেছে। তারা তাদের সমর্থকদের
মুসলিম লিগের নামে হস্তাক্ষর করে লাভে

সমর্থ হয়েছেন এবং তাদের বিদ্যালয় জিলায় আশীর্বাদ বরেনি থাকবে, ততদিন তাদের কেউ পরিত্রাণা কল্পে না এবং জিলায়-ভীতি এম এল এ-দের হাজার এমন গভীরভাবে প্রবেশ করছে যে মন্ত্রীও এমন সব নীতি যা দেশের বৃহত্তম স্বার্থে আন্তর্জাতিক এবং প্রমোশনের অধিকাংশ জনগণ দ্বারা নিষিদ্ধ, তা গ্রহণ করতে পারে। তাঁরা তাঁদের নিজস্ব পরিকল্পনা চালায়ে যেতে পারেন বর্তমান মিঃ জিলায় মন্ত্রীও যা করেন তাঁর প্রতি সমর্থন বিবেচনা। আমরা কম প্রত্যাশিত কথাই বলি। বাংলাদেশে তারুণ্যের চিহ্নকায় রয়েছে, কম প্রত্যাশের প্রতিপাত করছে এবং আইনসভার সদস্যগণ অথবা তাঁদের দ্বারা অধিকাংশ সদস্যকে বোঝানো যেতে যে, বাংলাদেশের জনগণ এ সকল ধরনের বিরোধিতা করেছে। কিন্তু মিঃ জিলায় যদি এ ধরনের বিরোধিতা না করলেও মন্ত্রীও একবারও তেঁবে যেতেন না যে আইনসভার সদস্যগণ অথবা প্রবেশের জনগণ মন্ত্রীদের এ নীতি সম্পর্কে কি মনে করছেন। অন্য কথায় মন্ত্রীও প্রাথমিক স্বায়ত্তশাসনের কাঠামো জনগণের ইচ্ছা যা এমন কি গভর্নরের নির্দেশে চালাচ্ছেন না বরং চালাচ্ছেন জনগণের প্রকৃত অনুমতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ একজন একমাত্রকের নির্দেশে। বিস্তারিত এটা প্রাথমিক স্বায়ত্তশাসন নয়। প্রাথমিক স্বায়ত্তশাসনের দ্বারা যেমন সবচেয়ে নিকট ধরনের বৈজ্ঞানিকভাবে চলে।

আমি আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি। আমরা সকলে জানি যে সবচেয়ে শীর্ষতম ব্যক্তিত্ব—ডাইসরয়, গভর্নর। সচিব কেড্রে ও প্রমোশনের দ্বারা পদস্থ অফিসার ও আমলাতন্ত্র এবং দেশের রাজনৈতিক চিন্তাধারার নেতৃবৃন্দসহ সকলে খুবই উদ্বিগ্ন ছিল যে এ অস্বাভাবিক সময়ে বাংলাদেশে একটি স্বাধীন সরকার গঠিত হবে। কিন্তু আমরা সকলে জানি উক্ততম মহলে এ সকল উদ্বেগ বাক্য সত্ত্বেও এ ধরনের সরকার বাংলাদেশ গঠন করা হয়নি এবং কেন? কারণ মিঃ জিলায় নও বিরোধেই যে, মুসলিম লিগের সফল না হলে

কোনও মুসলমান দৃঢ় মন্ত্রিসভায় প্রতিনিষ্ঠিত করতে পারবেন না। মিঃ জিলায়'এ এই দৃঢ় আখ্যাত সমস্ত কর্মসূচি ওলট-পালট করে দিয়েছে এবং দেশের সবচেয়ে উচ্চ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ মিঃ জিলায় ইচ্ছার কাছে লম্বা। মুসলিম লিগের মন্ত্রীও যে সকল মুসলমান মুসলিম লিগে নেই তারপর সঙ্গে সহযোগিতা করতে অস্বীকার করেছেন এবং সে কারণে জাতীয় সরকার গঠনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা যায়নি। এ ক্ষেত্রে পুনরায় জনগণ অথবা এমনকি গভর্নর, ডাইসরয় এবং ভারত সচিবের কথা শোনেমনি, কিন্তু শুনেছেন মিঃ জিলায় কথা; যে ভারত নাসন আইনের অধীনে বাংলা শাসিত হচ্ছে, তার অধীনে মন্ত্রীও নাসন কাছ চালাচ্ছেন না বরং মিঃ জিলায় বৈজ্ঞানিকভাবে প্রশাসন পরিচালনা করছেন। এগুলো কংগ্রেসের চতুর পদ্ধতির অনুকরণ হতে পারে। কিন্তু এ গণতন্ত্র নয় এবং তা ১০ ব্যাঘ্র শাসিত দেশে অথবা মুসলিম লিগের অধীনে নিউজীল্যান্ড প্রাথমিক স্বায়ত্তশাসন হতে পারে। কিন্তু কম একই। ভারতীয়রা নিজেরাই ভারতে ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র প্রণয়কারীদের কাছে কঠোর ঈর্ষান্বিত হিসেবে ১৯৩৫ সালের আইন খাড়াতে হুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

যখন শাসনক্ষেত্রে বিষয়গুলো মুখোমুখি পরিহিতিতে পৌঁছায়, তখন বাংলা একমাত্র অর্থনৈতিক দিক দিয়ে নয় বরং জনগণের অধিকার নিয়ে সংগ্রাম করার জন্য জননেতাদের দৃষ্টিকোণ থেকেও বাংলা ভারতের অন্যতম বিকল্পতম দেশ। আমি বাংলাদেশের জন্য সর্বদা গর্ব অনুভব করছি; আমি গর্ব করি বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি, আইন এবং স্বাস্থ্য, লর্ন, বাজারনীতি কেড্রে অবদানের জন্য এবং সংস্কৃতির সকল উপাদান যা প্রত্যেকটি সভ্য জাতির জীতি এবং গর্ব তারা জন্য। আমি অন্যান্য বিষয়ের গণ্য বরন না। কিন্তু সংক্ষেপে উল্লেখ করবো বা বাংলাদেশে রাজনৈতিক স্টেডিলিট্যান্ড পরিণত হয়েছে। আজকের কলম এবং অত্যন্ত দৃষ্টিত বাংলাই কম বিরোধে উদ্ভিত সি

ব্যানার্জি, সুবেশ্বনাথ ব্যানার্জি, নবেশ্বনাথ সেন, মতিলাল ঘোষ, কৃষ্ণেন্দ্র বসু, লালমোহন ঘোষ, শ্যামসুন্দর দত্ত, আব্দুল বসু, অধিনীতদ্বারা নয়, অধিকা গুরুত্বপূর্ণ এবং আরও অসংখ্য, ধর্মের নাম উল্লেখ করা যাক। আমি মনে মনেটা সংগ্রাম আইন প্রবর্তনের পূর্বেও তথা স্বরণ কবিতা যখন বাংলা গতিভূমির আমলাতন্ত্র শাসনাধীনে ছিল এবং যখন মানুষ আর যে স্বাধীনতায় সুখোপ-সুবিধা ভোগ করছে তা তখন সম্পূর্ণভাবে অপর্যবেচিত ছিল। কিন্তু সে স্বৈরতন্ত্রের দিনগুলোতে জনগণের সামান্য পরিচালনা স্বার্থ বিবেচ্যী কিছু ঘটলে জনসভার হস্ত এবং সংবাদপত্র সরকারের আচরণ ও সরকারি নীতির বিরুদ্ধে ঝড় হতো এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনগণের প্রতিবাদে কঠোর হতো। কিন্তু আজকের অথবা কি? মন্ত্রীও নিজেদের বিচার ও দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী তাদের দৃষ্টিকোণ নীতি এবং বেশবোঝা খরচের দ্বারা এমন এক সর্বদা দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি করেছে, যার দ্বারা উচিতহলে নেই এবং জনগণের মুখের পেছালা যখন পূর্ণ, তখন অন্যর সুন্দর আবাসস্থলে স্থানান্তরিত করার আশুভাতে কলকাতার পরিণ অসহায় উদাহরণের গুণ্য ভগ্নাবয়ব অত্যন্তর দ্বারিত করা হচ্ছে। আমি যে বীভৎস কৃপা দেখেছি তা আমার লেখার বর্ণনা করা সম্ভব নয়। ৩০ বছর পূর্বেও এ নৃশংস অত্যাচারের একম ভাগ্যের এক ভাগও হওয়া অসম্ভব ছিল। কিন্তু এখন সব সম্ভব। কারণ এখন প্রতিবাদ অথবা কেউ নেই। সারা বাংলাদেশে যখন হয় এমন একজনও নেই সে জনগণকে অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে পারে অথবা মন্ত্রীও নীতি, যা দেশে ধর্মস ও প্রচার আনতে পারে বলে মনে হয়, তার বিরুদ্ধে একটি দৃঢ় অঙ্গুলি উত্তোলন করতে প্রস্তুত নয়। কিন্তু বাংলাদেশে মুখ-ফটোর ছবি এখনও শেষ হয়নি। প্রত্যেক সভ্য দেশে সংবাদপত্র জনগণের স্বাধীনতার রক্ষক এবং বিপদে সব সময় জনগণ যে কোনও সভ্য শাসনাধীনে বাস করুক তাদের জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংবাদপত্রের নিরীক স্বাধীনতার দিক

চেতে আছে। কিন্তু এমনকি বাংলার প্রেস সম্পূর্ণ গন্ধু হয়ে আছে। এখন আইনসভার কম মিল এবং আমানতের দ্বারা এখন কয়েক জন লোকেরা হচ্ছে, তখন ভারতীয় সাংবাদিক জনগণের অধিকাংশ সাংবাদিক এখন হয় বাসিন্দার কলপেটিক, পরকর্তী নির্বাচনে কলপেটিকের উত্তরাধিকারী এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখতে পারে, যা এ প্রদেশের জনগণের কাছে চাঁদের মানুষের মতো নির্ভরযোগ্য হতো ওকলপেটিক। মন্ত্রীরা বাংলায় প্রেসের কাহীনতা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে তাদের স্বৈরাচারের সূচনা করেছে। প্রেস সেলসর এক আদেশ জারি করে বলেছেন যে, মন্ত্রিপরিষদ সম্পর্কিত যে কোনও সংবাদ প্রকাশনের পূর্বে সেলসরের জন্য তার কাছে লিখিত করতে হবে এবং সংবাদপত্রগুলোও সুস্থভাবে বিনা প্রতিবাদে প্রেস সেলসরের দমননীতি মেনে নিচ্ছে। এমনকি আইনসভার যে সকল বিধি প্রদান করা হয়, তাও প্রেস সেলসরের কাঁচি দিয়ে ছাঁচি করে এবং প্রেস এ সকল সংবাদ প্রকাশতে পারে যা প্রেস সেলসরের দমনপন্থ। বাংলায় বিনা আশ্রিতে এ অবস্থা মেনে নিচ্ছে; কারণ প্রকৃত দেশপ্রেমিকের দৃষ্টি হয়েছে যা তাঁরা বিচার নিচ্ছেন এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীদের মুখ রহস্যজনকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। কলম মন্ত্রিপরিষদের বিরুদ্ধে কোনও কিছু ব্যাখ্যা করতে পারে না এবং যা কিছু প্রকাশ হয়, তা বর্তমান মন্ত্রিসভা এবং তাদের নীতির প্রকাশ্য করে।

কিন্তু মিনের ব্যাপার ছিল অন্য রকম। এটা সুবিধিত যে প্রথমতিকে 'অনুত বাজার পত্রিকা' ছিল একমাত্র বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা। কিন্তু সরকারের সমালোচনায় তীক্ষ্ণ ছিল। এই পত্রিকার প্রকাশনিক কর্তৃপক্ষকে এমন নির্মমভাবে আঘাত করতে, সরকার এ ক্ষুদ্র সাপ্তাহিকটির ওপর তদানন্তর হস্তক্ষেপ করেছিল। 'অনুত বাজার পত্রিকা' এবং 'আর দু'-একটি ক্ষৌর পত্রিকা বন্ধ করার জন্য সরকার কালকূল্য প্রেস আইন জারি করে। এর

আসল উদ্দেশ্য ছিল 'অনুত বাজার পত্রিকা'টিকে ধ্বংস করা। কলম প্রবন্ধে মন্ত্রিসভা বোম্ব সরকারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হলেন এবং যে মিন আইন জারি হল সে মিনই অনুত বাজার আদেশ মতোই সরকারকে নির্মমভাবে সমালোচনার নীতি নিয়ে দৈনিক ইংরেজি পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। হায়, মন্ত্রিসভা বোম্ব, সুবিশ্রাস্য বানানির্ভ, নবপ্রকাশ্য সেনের সেনি আর নেই। তাঁরা ছিলেন তাঁদের মুন্সের সিংহ এবং আত্মা আত্ম আত্মের হাতে ভারতীয় সাংবাদিক জনগণের সিংহের উত্তরাধিকার পেয়েছে। কিন্তু 'দু' শ্রেণীর সিংহের মধ্যে প্রভেদ অজস্র তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁরা ছিলেন এমন সিংহ, যাদের গর্জন সুদূর বাংলা থেকে সাত সমুদ্রের ওপায়ে ব্রিটিশ জাতির স্বপ্নেই প্রতিফলিত হতো। কিন্তু বর্তমান সিংহরা সাক্ষার সিংহের হতো অনুগত। অতীতের সিংহের গর্জনে ব্রিটিশ সিংহাসন কঁপে উঠতো; কিন্তু বর্তমানের সিংহের প্রায় সবাই জানে কি করে সিংহাসনের নিচে বসে আশ্রয় নিতে হয় এবং সরকারের নীতির প্রকাশ্য লেখ নাড়তে হয়।

ভারত রক্ত আইনে পরচলিত নির্বাসন এবং বিখ্যাত নেত্রীদের দ্বন্দ্বী করার পর সংক্ষেপে এই হলো বাংলার অবস্থা। বারনটিকে (নেকুদবিহীন) এবং ভারত রক্ত আইনে কঠোর নিষেধণে পশু সংবাদপত্র সহ বাংলা তার কালো এবং সাধা শাসকদের পায়ের নিচে মজানু হয়ে আছে স্বাধীনতার দ্বন্দ্ব নেওয়ার জন্য সে চারিদিকে মুদুর্ন লোকের মতো টুটুটুটি করে। কিন্তু নির্মম স্বৈরাচারী শাসকদের নির্মম শাসনে তাদের দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ রাখা হয়েছে।

সমগ্র দেশে কলমের নীরবতা বিরাজ করেছে এবং কর্মজাতীন লোকেরা সেভাবে খুলি জনগণের অধিকারকে পদলিখিত করতে পারে। এ অনুকূল পরিবেশেই বর্তমান মন্ত্রিসভা ১৯৪৩ সালের ২৪ এপ্রিল কার্যক্রম গ্রহণ করে। ইতিপূর্বে কী অবস্থার আদার মন্ত্রিসভার পতন ঘটছিল

এবং বর্তমান মন্ত্রিসভা কী করে কর্মজাতীয় এসেছে সে সম্পর্কে আইনসভার আমি একটি পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি দিয়েছি। আমি অতীতের স্মৃতি মনে করতে চাই না। বিশেষ করে এখন উক্ত নোটের প্রধান নাকের আঘাত হওয়া আমি তার স্মৃতি জান করতে চাই না। কিন্তু আমি একটি ঘটনার ওপর জোব না দিয়ে পারি না। তা হলো একটি ঘটনায়, যা শেষ পর্যন্ত আমার মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়েছিল। তা শুধু বিশেষপূর্ণ নয়। তা ছিল গোপনে পরিকল্পিত এবং কার্যকর করা এবং যার সঙ্গে বর্তমানে যারা কর্মজাতীয় আছেন তাঁদের কয়েকজন ওই দলে ছিলেন। এটা সর্বজনবিদিত যে, ১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে তৎকালীন পতনের জন হার্বার্ট হ্যাটী আমলা এবং সন্তবত তৎকালীন বিরোধী দল আগে যারা কর্মজাতীয় ছিলেন, তাঁদের কয়েকজন তার চাল অপসারণ নীতি অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এখন আমরা জানতে পারলাম যে কি হতে পারে, আমরা সমগ্র মন্ত্রিপরিষদের পক্ষ থেকে জন হার্বার্টের নীতির বিরুদ্ধে প্রতিকার প্রকাশ্য; কিন্তু কোনও কাজ হলো না। কিন্তু পরবর্তী ঘটনা প্রকাশ্য করেছে যে ১৯৪২-৪৩ সালে বাংলায় যে কতখান দুর্ভোগ ঘটছিল তার দীর্ঘ প্রকৃতপক্ষে বর্ণন করা হয় সেই সময়, এখন আমাদের পরামর্শ প্রদান সত্ত্বেও এই দুর্ভোগজনক নীতির পরিচালনা কার্যকর করা হয়। তখন আমরা কর্মজাতীয় মন্ত্রী: জন হার্বার্টের নীতি কার্যকর করার ব্যাপারে কীভাবে সরকারি অর্থের লাঘবময়ী অপচয় করা হয়েছিল সে সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ যেওনা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি একটি বা দুটি উদাহরণ দেব। সরকারি এজেন্টদের মফস্বল অঞ্চলে গমন ও চাল ক্রয়ের পূর্ণ বহাগীন ভরসা দেওয়া হয়। এখন এ সকল সরকারি এজেন্ট এবং তাদের নিয়োগিত মোকদ্দম সারা দেশে গণমাণ্ডের মতো ঘটতে পড়লো, বান-চালের দ্বন্দ্ব। নিয়ন্ত্রণের বাইরে বৃষ্টি পেতে থাকে। অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতার প্রতি কোনও রকম প্রত্যাহা না রেখে সরকারি এজেন্ট ও তাদের

বাণালয়ের নিম্নতরঙ্গীনভাবে চাল ক্রয়ের ফলে দুর্ভোগের সমাপ্তি হলো না। এ ছাড়া অন্য একটি জঘন্য পদ্ধতি ছিল যার দ্বারা সরকারি একচেটগণ ঘরঘরে সে ঘরে ঘান-চাল ক্রয় করতেন তার চেয়ে পড়করা ৮০ টাকা বেশি দরে সরকারের কাছে বিক্রি করতে সক্ষম হন। তাঁরা যে পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিল তা অনেকটা জটিল ছিল নিম্নোক্তভাবে :

সরকারের একমাত্র সার একচেট ক ২০ টাকা মণ দরে চাল ক্রয় করতো এবং তিনি সার একচেট খ-এর কাছে ২২ টাকা মণ দরে বিক্রি করতো। এভাবে একচেট ও সহযোগীদের মধ্যে খিঁচা-তুঝিরূপে চলতে থাকে এবং পের সহযোগী আর একজনের কাছে থেকে ৩৮ টাকা মণ দরে ক্রয় করে এবং তিনি নিজে সরকারি একচেটের কাছে ৪০ টাকা মণ দরে বিক্রি করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মণ প্রতি তিনি ২০ টাকা অথবা পড়করা ১০০ লাভ করছেন। ক্রয়ের ব্যাপারে সরকারি একচেট, সার-একচেট এবং তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বিশপ বিবরণ বেওয়া সত্ত্বেও। কিন্তু এ ব্যাপারে দেশে যে গুজব প্রচলিত আছে, সে সম্পর্কে জনমত হলো প্রকৃতপক্ষে সঠিক। আমদা বারবার সরকারকে জনসম্মানে আদ্য অর্থনের কথা বলেছি এবং যে পদ্ধতিতে এ সকল ক্রয় করা হচ্ছিল, ভাউচারসহ তার পূর্ণ বিবরণ প্রদান করতে বলেছি; কিন্তু সরকার ক্রমাগতভাবে আমদারের অনুরোধ উপেক্ষা করেছে। সরকার একমাত্র হেত অফিসের একচেটদের হিসেবেরে ধই পরিপূর্ণ করার সুযোগ প্রদান করেছে। কিন্তু এ ধরনের সুবিধার আমদা নীরব থাকতে অস্বীকার করলো। একজন দুর্ভেৎ একদা মুখো পাত্রে যে, প্রদান কার্যকরিতা দ্রুত খাতা মকলে অনুষ্ঠিত বরমাতেসির কোনও ইকিত মিতে পারে না। এ রকম অথবা তখনও ছিল, যখন বর্তমান মন্ত্রিসভা বিরোধী দলে ছিল এবং নিজেদের প্রকাশ না করে গোপনে তাদের পরিকল্পনা

কার্যকর করেছিল। কিন্তু ১৯৪০ সালের এপ্রিলে যখন তাঁরা কলকাতা আসে তখন তাঁরা সুযোগ বুঝে কেলে বিবে সত্যসরি ক্রয়-বিক্রয় শুরু করে এবং দেশের অর্থনীতিক অসহায় অবস্থায় নিজেপ করে। আমি যখন কবি, বর্তমান মন্ত্রিসভায় নিয়োজিত এই একচেটটো একচেটদের মাধ্যমে প্রামাণ্যকলে বেপারোটা খায়া ক্রয় নীতি অনুসরণই প্রদানত দুর্ভিক্ষের জন্য গদী। মন্ত্রীসভার নিজস্বের স্বীকৃতির ভেতর দিয়ে একদা প্রকাশ পেয়েছে। ১৯৪০ সালের মে মাসে দুবার মিঃ মোহাওয়াধী ঘোষণা করেছেন যে খাবার কোনও ঘাটতি নেই এবং ওই সময় সেখানে বেশের খাবার উচ্চ মূল্যের কারণ অর্থনৈতিক ছাড়া অন্য এবং একদা একমাত্র জনস্বাত্বিক কারণই গদী। ১৯৪০ সালের ১৫ মে স্যার আর্জিউল হক কৃজনপবে প্রবর্ত এক মান-পত্রের উত্তরে বলেছিলেন যে বাংলায় কোনও খায়া ঘাটতি নেই। ২৫ মে স্যার নাথিঘউদ্দিন হাওজর এক জনসভায় ঘোষণা করেন যে, বাংলা খায়া ঘাটতিজনিত প্রবল মত। তাহলে একদা পরিষ্কার যে দুর্ভিক্ষের সময় যে খায়া ঘাটতি প্রকাশ পেয়েছে তা মন্ত্রীসভার কার্যক্রম প্রদানের অন্তত দু'মাস পরে ঘটেছে। তাহলে এটা প্রমাণিত যে ১৯৪০ সালের দুর্ভিক্ষের জন্য বর্তমান মন্ত্রিসভাই সম্পূর্ণভাবে গদী। মন্ত্রিসভা এমন একট নীতির ওপর ঠাণ্ডিত পড়ছেন যা একদিকে চরম অশরম অনাবিতিক অর্থনীতি ও স্বাভাবিক বিক দিয়ে সুবিবেচনাগীন। তাঁরা একচেটটো ব্যবসায়ীদের প্রামাণ্যকলে খায়া ক্রয়ের অনুমতি প্রদান করে এবং বীতি কার্যকর করার জন্য জনসভার অর্থ নিষিদ্ধাবিভাবে বহুত করার অনুমতি যেন। মন্ত্রীসভা কখনও জনগণের ওপর এমনকি বিখ্যাত ব্যবসায়ীদের ওপর বিশ্বাস রাখেন নি এবং তাঁদের অনুগ্রহশুভেব বিকট অগ্রিম টাকা বেওয়া হয় এবং জনসম্মানে হিসেবে যেহিসেবি টাকার আভরজনক পরিচালন ঘটকবে সতে আট কোটি টাকা।

আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে মন্ত্রীসভার অবিবেচক কার্যকলাপের ফলে দুর্ভিক্ষ বেশা বিদেছে। আমি যখন কবি, ১৯৪০ সালের দুর্ভিক্ষ কোনও অশুপ কাণেব ঘটেনি এবং তা কেবল মানুষেরে লুট দুর্ভিক্ষ, যাব জন্য বর্তমানে মন্ত্রিসভাই গদী। আমি এখন মন্ত্রিসভার কার্যবিবরণী সম্পর্কে কিছু কথা বলবো, যাব ফলে নথিবিবরণীভাবে জনগণের আর্থিক অশচয় হয়েছ। বর্তমান মন্ত্রিসভা তাঁদের খায়া নীতি পরিচালনার জন্য নানা প্রতীক ও ছাত্তারের বেশি পথ সৃষ্টি করেছে। এর অতিক্রান্ত যাব সম্পূর্ণ অবাকিত এবং এ পথগুলো একমাত্র তাদের বহু এবং মন্ত্রিসভার সমর্থকদের পালন করার জন্য সৃষ্টি করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত মন্ত্রিসভার এই ধরনের অশচয়েব মনোবৃত্তি এমনও পূরীকৃত হয়নি। এখনও তাঁরা তাঁদের বহু ও সমর্থকদের ধনী করার জন্য কলকাতায় সরকারি সোদান প্রতিষ্ঠা করেছে। তাঁরা যাঁদের সোদান দিচ্ছেন, তাঁরা ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। লক্ষ্যতা ও তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের ভিত্তিতে নয় এবং মন্ত্রিসভার সমর্থনের অস্বীকারই বিতরণের ভিত্তি। গুজব শোনা যাচ্ছে যে, কোনও প্রয়োজন ছাড়া বিচার বিভাগে পথ সৃষ্টি করা হবে। বলা হচ্ছে যে, সারা বাংলায় মাসিক ৪০০ থেকে ৮০০ টাকা বেতনের ৮-১০ ল' ইচার ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হবে। অনেক পদই মন্ত্রিসভার সমর্থকদের বেওয়া হবে। তাদের অনেকই ম্যেজিস্ট্রেট উকিল এবং মাসে ৪০ টাকাও উপার্জন করতে অক্ষম। তাদের মধ্যে একটি বিবাত অংশ কোনও দিন আরকবের হিসেবের অধীনে আসেননি। এ নতুন পথ সৃষ্টি করার সামান্যতম ন্যায়সঙ্গত দুষ্টি নেই। কারণ যদি সতর্কতার সঙ্গে অনাবেরি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হতো, তাহলে প্রয়োজনীয় যে কোনও অতিরিক্ত বিচায়ে কত তাঁদের দ্বারা সার্বকভাবে সম্পন্ন করা যেত।



৩। সান্যাল : ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস করছে কিছু।

ফজলুল হক : থাকবে, কংগ্রেসের কথা। শ্রীযুক্ত বসু এই সভায় কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেছেন যাঁরা মুক্ত নিৰ্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে কলকাতা কর্পোরেশনে নিৰ্বাচিত হয়েছেন। তিনি এটাও বলেছেন যে আমি বিজ্ঞেও ১৯৩০ সালে কর্পোরেশনে... (শ্রীযোগেশচন্দ্র গুপ্ত : ১৯৩৬ সালে নয় তো ?)। আমি নিৰ্বাচিত হয়েছিলাম মুক্ত নিৰ্বাচন পদ্ধতিতে কিন্তু মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ডিভিডে। আসলে বাণাবটী বসি। কলকাতা কর্পোরেশনের ১৯নং ওয়ার্ডে আমি নিৰ্বাচন প্রার্থী হয়েছিলাম। মোট ভোটারদের সংখ্যা ছিল ১৫০০। তার মধ্যে ৩০০ ছিল মুসলিম আর ১২০০ হিন্দু। আপনাবা বিস্মিত হবেন শুনলে যে, এই আসনটি মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। অর্থাৎ ফেরদায়ে একজন মুসলিমই এই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন। জৈনক আবুল বাসের, তিনি পুলিশ কোর্টে ২/৩ বছর ওকালতি করতেন, আমায় বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। হিন্দু ভোটারদের সমর্থনে (যাঁরা আমার বিরুদ্ধে ছিলেন) তিনি ক্ষিতে গেলেন। আমি সেই নিৰ্বাচনে ঘাত্র ১৩টি হিন্দু ভোট পেয়েছিলাম। আমি হাইকোর্টে যাবলা করলাম। কিন্তু ব্রুনীতিমূলক কার্যকলাপের ক্ষেত্র হিসাবে এই নিৰ্বাচন ব্যতিল হয়ে গার। আমি আমার নিৰ্বাচন প্রার্থী হলাম। আবুল বাসের নিৰ্বাচন প্রার্থী

হতে পারলেন না কারণ ব্রুনীতির জন্য তাঁর উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। আমার সৌভাগ্যক্রমে আর কোনও মুসলিম এদিকে এসে আমায় বিরুদ্ধে দাঁড়াননি। ফলে আমি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জেতা হলাম। তাহলে দেখা যাবে মুক্ত নিৰ্বাচন পদ্ধতির মায়াস্তোত্র জ্ঞান আমি ভুলতে কথিনি।

আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি যে যদি যেসে হিন্দু বার্থ, মুসলিম বার্থ অথবা ইউরোপীয় বার্থের অস্তিত্ব না থাকে তবে আমার হিন্দু বহুগণ মুক্ত অথবা পৃথক নিৰ্বাচন পদ্ধতি নিয়ে এতো বিলম্বভাবে চিন্তিত কেন ?

আমি বলছিলাম যে ১৯২৭ বসু মহাশয় এই সভায় উল্লেখ করেছেন যে, কোনও কোনও ওয়ার্ডে মুসলিমদের জন্য আসন সংরক্ষণসহ মুক্ত নিৰ্বাচন পদ্ধতিতে সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোট পড়েছে। তিনি সন্তুষ্ট : যান যাদ্যদু যেমিনের সঙ্গে আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যেন বেধেই বক্তব্য বেধেছেন। যান যাদ্যদু যেমিন সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছিলেন কারণ সংখ্রিই ওয়ার্ডে ভোটারবা হিন্দুল সংখ্যায় মুসলিম। তাই সেখানে মুসলিমদের সব ভোট এবং কিছু হিন্দু ভোট তাঁর পক্ষে বিবেছিল।

আমি কিছুবর বসুকে বোঝাতে চাই যে সবকিছু মিডব করতে অসোয়া সময়ে বৈলিঙ্গ এবং সকল সম্প্রদায়ের বার্থে কর্তব্যবত কাউন্সিলারদের কর্মনিষ্ঠার উপর। হযেতা বা মুসলিম কাউন্সিলারবা তাদের মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি ঘর্থাৎব কর্তবা পালন করেননি : কিন্তু তাঁই বলে এটা প্রমাণ হয় না যে আসন সংরক্ষণসহ মুক্ত নিৰ্বাচন প্রথা অধীনেই কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের দৃষ্টত সংখ্যক প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত হয় এবং পৃথক নিৰ্বাচন প্রথাতে তা হয় না।

৩। সান্যাল : এসব তথ্য সম্পূর্ণ ভ্রান্ত

ফজলুল হক : আমি এবার আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত বসু কর্তিত মুসলিম প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালগুলিতে প্রদত্ত অনুদানের প্রসঙ্গে আসি। কর্পোরেশন কমিটি এই সংক্রান্ত ব্যাপারে কিভাবে কাজ করে তা আমি জানি। হযেতা বা একজন মুসলিম কাউন্সিলার তাঁর ত্রিঘোজন কোনও প্রতিষ্ঠানের জন্য কিছু অনুদান চান। এইজন্য তিনি দু-একজন হিন্দু কাউন্সিলারদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করেন পরস্পর পিঠি চুলকানির ডিভিডে। এইভাবে কমিটির সভাগুলিতে মুসলিম কাউন্সিলারবা হিন্দু কাউন্সিলারদের ভোট দিয়ে সাহায্য করে অথবা মুসলিম কাউন্সিলারবা হিন্দুদের। কিন্তু শত শত মুসলিম প্রতিষ্ঠান আছে যারা অনুদান পাওয়ার ফোগে হওয়া সত্ত্বেও বঞ্চিত হয়ে আছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠান সাহায্য পেয়েচির হযেতা কিন্তু শত শত প্রতিষ্ঠান সাহায্য পারনি। অনেক ক্ষেত্রেই অযোগ্য প্রতিষ্ঠানকেই সাহায্য বেওয়া হয়েছে।

(সভাসভুদার বসু : হিন্দু প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও এসব কথা ঘটে।)

ফজলুল হক : আমি এবার আসন কটনের প্রসঙ্গে আসছি। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং শ্রীশরৎচন্দ্র বসু উভয়েই অতিযোগ

করেছেন যে আমরা হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি অবিশ্বাস ও অন্যায্য করেছি এবং এই সম্প্রদায়কে এক প্রকার সংখ্যাগরিষ্ঠ পবিত্র করে রেখেছি।

(পরঃ বসু : একপ্রকার নয়, পুণ্যপুণ্ড্র)

কর্ণোৎপলেন ৯০টি আসনের মধ্যে ৪৭টি মুক্ত নির্বাচন প্রচার করা নিষিদ্ধ, ৪৩টি নিয়ন্ত্রণে বন্দিও হয়েছে। মুসলিমদের জন্য ২২টি, বিশেষ আসনের জন্য নিষিদ্ধ ১২টি, অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের জন্য ২টি, প্রমিষ্টদের জন্য ২টি ইত্যাদি।

৪৭টি আসনের সবকটিই হিন্দুরা পাবে। প্রমিষ্ট আসন ২টি অবশ্যই হিন্দুদের থাকবে। তাছাড়া কলকাতা পোর্ট কমিশনারের আসনটা তো আছেই। মোট ৫০টি আসন। এর পরেও অন্ততঃ ৩টি আসন মনোনয়নের মাধ্যমে আসবে। অর্থাৎ ৯৩ জনের সত্য ৫৩টিই হিন্দুদের দখলে থাকবে। এই সংখ্যাধিকারের জোরে তাঁরা ৫ জন নিজস্ব জলদস্যুদান নির্বাচন করতে পারবে। তাহলে বাকিদের ৯৮ জন সংসদে মধ্যে ৫৮ জন। মুক্তি অবশিষ্ট আসনকে হিসাব থেকে বাহ্য দিলেও হিন্দুরা পাবে ৫২টি আসন আর জ-হিন্দুরা ৪২টি। এই সত্যই বিচার করুক যে এই ৪২টি আসন নিয়ে কিতাবে হিন্দুদের গণি ও জালা-আলাহুজ্বালাকে পবনসিত করা যায়।

(ডঃ সান্যাল : অবশ্যই)

আপনি ঘনায় চুপ করুন তো। কি ভেবেছেন কি? (ডঃ সান্যাল : আপনি একটা প্রশ্ন করেছিলেন) না আমি কোনও প্রশ্ন করিনি। (প্রশ্ন হৈ চৈ) স্যার, এইভাবে বাহ্য পেনে আমি আর বলতে উঠবো না।

(ডঃ সান্যাল : ডাঃ শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কেও এইভাবে বাহ্য বেতারা হয়েছিল।)

পরঃ বসু : ২টি প্রমিষ্ট আসনকে মাননীয় মুখোপাধ্যায়ী কি হিন্দুদের আসন বলে ধরে নিচ্ছেন? কিন্তু এই আসন দুটি কি হিন্দু, মুসলমান এবং অন্যান্যদের নিয়ে গঠিত নয়?

কলকাতা হক : তপসীসভূক্ত জাতিসমূহ হলো হিন্দু। তারা মুসলিম নয়, খ্রীষ্টানও নয়। সুবিধা অনুযায়ী তারা কখনও যা মুসলিম। এই হলো ওদের অবস্থা। স্যার, কেবা থাকে ৪৫টি আসন নিয়ে কোনও দল নেই। এই আসনগুলির সঙ্গে পোর্ট কমিশনারের আসনটি এবং ৩টি মনোনীত আসন বিসিয়ে হব ৪৯টি আসন। অর্থাৎ ৯৩ জনের সত্য ৪৯টি অধিহিন্দু। ৪৯ জন একত্র হলেই নিজেদের ৫ জন জলদস্যুদান নির্বাচন করতে পারবে। সব নিয়ে হিন্দু গোষ্ঠী হবে ৫৪ অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ।

(পরঃ বসু : চমৎকার।)

তাই জনসংখ্যার অনুপাতে বণি হিন্দুরা আসন নাও পার ভাঙতে কি এসে যায়? যখন হিন্দু স্বার্থ বলে কিছু ভুল করার ব্যাপার নেই তখন বুদ্ধশীল বা সাম্যবুদ্ধির দ্বারা হতে সব ক্ষেত্রে বিতর্ক পেনে কোথায়? হিন্দু স্বার্থ বলে কিছুই নেই যখন, মুসলমান জাতির বিশ্বাস করতে বাবা কেন? এটা তো ভালো লজিক।

(নরেন্দ্রনাথায় চমৎকারী : এটা যুক্তিতর্ক)

এটা একই সঙ্গে লজিক এবং যুক্তিতর্ক যে হিন্দুরা মুসলিমদের বিশ্বাস করতে না কিং মুসলিমদের অবস্থা হিন্দুদের বিশ্বাস করতে হবে। কেন?

ফিলটিক পঞ্চদশগামী বলা হচ্ছে। কিন্তু কি হিসাবে এটা পঞ্চদশগামী? স্যার সুবেত্রনাথ বানার্জি তাঁর ১৯২৩ সালেই আইনেব বসড়া লেখবার সময়ে ৮৭টি বিবচিত্ত আসনযুক্ত সত্য ১২টি বিশেষ আসনের ব্যবস্থা রেখেছিলেন। আদ্য আইনবোর্ড সম্প্রদায়কে এই ১২টি আসনই দিয়েছি। কিন্তু সেটা একটা বৃহত্তর সংখ্যক সদস্যযুক্ত সভায়। কলে পুরানো আইনে তাঁরা যা ভোগ করতেন তা আমরা কেড়েই নিতেছি। সুবেত্রনাথ বানার্জি ওদের ১২টি আসন দিয়েছিল ৮৭টি আসনের মধ্যে আর আমরা দিচ্ছি ১২টি আসন ৯৩টি আসনের মধ্যে। পঞ্চদশগামী হলো কি করে?

মনোনয়ন সম্পর্কে অনেক নিষাধ করা হয়েছে। স্যার সুবেত্রনাথের বেশপ্রেম কোথায় ছিল যখন তিনি ৮২টি আসনের মধ্যে ১০টিই নিষিদ্ধ করেছিলেন মনোনয়নের জন্য? আমরা ওটা ১০ থেকে কমিয়ে ৮ করেছি। মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে তারা তপসীসী জাতিদের ১২টি আসন দেবে।

পরঃ বসু সব প্রশ্নের আমি জবাব দিলাম। এবার ডাঃ শ্যামপ্রসাদের উদ্বাপিত বিষয় নিয়ে কিছু বলবো। উনি বলেছেন কোমিশন পোর্ট জনসংখ্যার আদর্শের অস্তিত্ব কোনও বন্ধনে প্রবৃত্ত নয় এবং এই গোষ্ঠী গঠিত হয়েছে কেবলমাত্র হিন্দুদের আইনসম্মত অধিকারকে পদনসিত করার জন্য। এর চেয়ে সত্যের ডাবাঘর বিকৃতি কখনও কোনও জননেতা উচ্চারণ করেছেন কিনা জানা নেই।

যত্নুরা এই সভায় বৃষ্টি সাত্রাজবায়ের কথা তুলেছেন আদ্যদের সরকারকে ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সমর্থন বেতওয়ার প্রশ্নও তুলেছেন। ডিভিশনের ডালিকা খেলেই কোবা থাকে যে এই গোষ্ঠীর সমর্থন ঘাড়াই এই বিল পাস হয়ে যেতো। ইউরোপিয়রা একে সমর্থন করেছেন কারণ বিলটি মূলতঃ ন্যায়বিচার এবং সমতার নীতির ভিত্তিতে রচিত।

(“বিরোধী বেক থেকে “আঃ! আঃ!” জ্বনি)

যদি বিলটি কলিকাতা কর্পোরেশনের সংস্কারের পথে এই বিল প্রথম পক্ষেণ। এই হাউসে যে ডিভিশন ডাঃ হুদেছে তার একটা তাৎপর্যপূর্ণ দিকের কথা উল্লেখ না করে আমি পারছি না। সেটা হলো পূর্বক নির্বাচন প্রচার মাধ্যমে মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব। সবাই জানা আছে এই বিষয়টি নিয়ে যখন আলোচনা, বিতর্ক এবং ভোটগুটি হয় আমরা ভালো বকম সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ভুটি হয়েছিলাম। এই তো সেদিন “বি টেল” সভার কাছ পেন করা হলো (পূর্বক নির্বাচন পদ্ধতি অনুযায়ী আসন বন্টন) সব মুসলিম সদস্য সরকারী প্রস্তাব সমর্থন করলেন। এমনকি যোবন মুসলিম সদস্যরা সাধারণতঃ কংগ্রেসের পক্ষেই ভোট দিয়ে থাকেন তাঁরাও আদ্যদের পিবিরে



কক্সসহ ৪০ ও বহুদল জলী ত্রিভা

হলে এসেন। এটা এখন বলা হলে না যে দুসলির সম্প্রদায়ের একাংশ মাত্র এই বিল এবং পৃথক নির্বাচন প্রচার সমর্থক। সাময়িকভাবে দুসলির গোষ্ঠী এই প্রাণে একত্রে। একজন দুসলিদেরও সাহস হয়নি এই বিলের বিরুদ্ধে ভোট দিতে।

ইউরোপীয়ান গোষ্ঠী সম্পর্কে ডাঃ শ্যামপ্রসাদ মুখার্জি বলছেন যে এ গোষ্ঠী দাবি করছেন তাঁদের কোনও রাজনীতি নেই। আমরা মনে হয় ডাঃ মুখার্জি এই ভুল। ইউরোপীয় গোষ্ঠী বলতে চেয়েছিল যে তাঁরা কোনও রাজনৈতিক দলভুক্ত নয় এবং তাঁরা দলমত নির্বিশেষে জনসাধারণের অস্তিত্ব রক্ষা সাধনের কাজে সাহায্য করতে প্রস্তুত।

ডাঃ মুখার্জি প্রাণ ভুলেছেন যে কলকাতা কর্পোরেশনে আসন সংরক্ষণসহ মুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি বর্জন করা হচ্ছে অবশ্য ইউনিয়ন বোর্ড, স্থানীয় বোর্ড এবং ডিসিনিশিয়ালিটি ও জেলা বোর্ডের সর্বত্র সেই একই পদ্ধতি যেনে নেওয়া হচ্ছে কেন। আমরা মনে হয় আর কালবিলম্ব না করে চেম্বার ড্যা উঠিত যে এই পদ্ধতি সর্বত্র বাতিল হবে। হর পৃথক নির্বাচন প্রথা চালু থাকলে নয় তো বিনা সংরক্ষণে একটি অতিরিক্ত রেকর্ডের অনুযায়ী ভোটাভুটি হোক। সংরক্ষণসহ মুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি একটি অবিমিশ্র এবং অকল্যাণমূলক। অতীতে হিন্দু এতটা সাম্প্রদায়িক হিসেবে না কিন্তু বর্তমানে এখন বৃটিশ সরকার জনগণের হাতে কিছু ক্ষমতা প্রদান করেছেন সেই সুযোগে তাঁরা ক্ষমতার জন্য কাড়াকড়িতে মেতে উঠেছেন এবং সবটুকু ক্ষমতাই নিজেদের মাথা রাখতে চাইছেন। অন্য সম্প্রদায়ের অধিকারের কথা তাঁরা ভুলেই যাচ্ছেন। এই কারণেই অবিভাগের জয় এবং পৃথক নির্বাচন প্রচার দাবি। অনেকে কলিকাতা কর্পোরেশনের মতামত

নেওয়ার কথা বলেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের অতিমত তো সুবিধিত। তাছাড়া বর্তমান মুক্ত কর্পোরেশন অতিদুর্ভাগ্যবশত। তাই আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা আসামীর বিপক্ষে নিই নি। এটা করতে গেলে শুধু সময় নষ্ট হতো।

বোম্বারদ ৪৩: ২০২৭ ওয়ার্ডে হিন্দুদের প্রায় ত্রিংশ সংখ্যা ছিল ১০৪৮ আর মুসলমানদের ৯৯১। তবুও বার বাহাদুর মোহিন জিতে গেলেন।
কলকাতা হর: এ ওয়ার্ডে দুসলির ভোটারদের সংখ্যকতাই সবচেয়ে বড় ব্যাপার। অন্য প্রাণ বীশ। তাছাড়া এই মতামতটা নিতান্তই একটা ক্ষুদ্র ঘটনামাত্র।

আমি বিরোধীদের সব গুণিত ভাবার বিতর্কি এবং আবার বুঝতে বলতে চাই যে হুসেন না বিভিন্ন সম্প্রদায় অন্য কোনও বিতর্ক পদ্ধতি সম্পর্কে সহমত সঞ্জন করছে ততদিন পৃথক নির্বাচন প্রথাই চালু থাকতে দায়। আমি যেখানে বলতে পারি যে এই মুহুর্তে শুধু বাংলার নয় সারা ভারতে শতকরা ৯৯ জন দুসলি এই প্রথা পক্ষে। আর এই সভায় ১২০ জনের মধ্যে ১০০ জনও এই প্রথাকে সমর্থন করে। আমি ও জোট দুটির প্রতিনিধি এবং আমি এই প্রথা পক্ষে। দুসলির বাংলার পক্ষে এই কথাটাই হবে। আমি এখন পৃথক নির্বাচন প্রথা চাইছি সেটাই এই বিষয়ে শেষ কথা, আর কিছু দরকার নেই।

হিন্দুদের আসন খুব সামান্যই কমছে। আসলে আদ্যা কলকাতা কর্পোরেশন থেকে আত্মীয় কাংগ্রেসের অন্তত প্রভাব হতে করে বিতে সমর্থ হয়েছিল।

ঐতিহ্যবাহুদ্বারা বসু: কক্সসহ ৪০ এবং সুবাদীর অতিরিক্ত সত্ত্ব ও কাংগ্রেস কর্পোরেশনে অধিপত্য করে এই বিলাসি বিরোধিতায় একমাত্র কারণ কাংগ্রেসের ক্ষমতাসূতির উন্নতি। অন্য কোনও কারণ নেই। আমি পরিসংখ্যান নিয়ে প্রমাণ করছি যে হিন্দুদের চেয়ে করে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের পরিণত করা হয়নি।

স্বার পুণ্ড্রনাথ বানার্জি, বীর চেম্বার সম্পর্কে কোনও প্রসঙ্গ উঠে না, তিনি স্বয়ং মনোমত পদ্ধতির প্রচলনীয়ত অনুসরণ করেছেন।

কিত তপসীলি জাতি বার শতকরা ১০ ডাগ হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তাৎপে অন্য ১৯২০ সালের হিসেব খসড়াতে কিছু নেই কেন?

আমার কিছু ত্রীমূল ক্ষেত্রের সিংহকে মনে করিতে যিত চাই যে হাজার হাজার বছর ধরে তপসীলি জাতির উপরে উচ্চপক্ষে হিন্দুকে কি ধরনের যেহ মততা আসোমাস বর্ধিত হয়েছিল? আমরা বল, এধের জন্য বধ্যসাধন করার চেষ্টা করি। বতকাল ডাঃ শ্যামপ্রসাদ মুখার্জি যে ভর-বেধনো তরীতে বধ্য চেয়েছিলেন তা ছিল অপ্রত্যয়িত। সেখানেই যোক তিনি বাংলার সবচেয়ে সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন মানুষ হিসাবে নাম কিয়েছেন।

(ডাঃ মুখার্জি: কিন্তু আপনাব মতো নয়?)

আমি কি একজন সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন? হুঁ! বেশ, চার বছর হবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সবচেয়ে সাম্প্রদায়িক প্রাচীনতাবাদীরা অন্যতম হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জন শেষেছে।

(ডাঃ মুখার্জি: আপনি বর্তমান উপাচার্যকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করুন, উনিই ঠিকমতো জবাব দিতে পারবেন।)

আমি অনেক কিছু জানি যা বহু উপাচার্যের সম্মিলিত জ্ঞানের চেয়েও বেশি। আমার বন্ধু ডাঃ মুখার্জি কংগ্রেস দলের সমর্থনপুষ্ট হয়ে আমাকে বলতে না দিতে বন্ধপবিকল্প। কিন্তু আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আমি জানাতে চাই যে তিনি তাঁর ভাষণের দ্বারা হিন্দু মুসলিম ঐক্যের চূড়ান্ত সর্বনাশ সাধন করেছেন। তাঁর বক্তব্য, তাঁর চ্যালেঞ্জের ফলে হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায় আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে এবং দেশের মঙ্গলকাক্ষী মানুষের যে প্রচেষ্টা চলছে দুটো সম্প্রদায়কে একটা ঘকে নিয়ে আসার তা অসম্ভব হয়ে উঠবে। পরম্পরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে নয়, বরং এনিমিত্ত এসে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েই দেশের স্বাধীনতা হতে পারে। আমাদের নিজস্বের মত পার্থক্যকে বাড়িয়ে তোলার অর্থই অন্যদের কাছে হাস্যান্দ্রাজ্য হওয়া। হিন্দুকে হৈমি পন্ডিত্যান, না মুসলমানেরা, আত্মকেন্দ্র প্রভৃ তা নয় মোটেই।

(পশাভবেশ্বর সান্যাল: আপনাবা সব বাব আর সিংহ!)

এসব কথাবার্তার একমাত্র উত্তর গান্ধীগামিরা পথেরি দেওয়া চলে। কিন্তু আমি গান্ধিগামাক কবাব মোড়াই নেই। বরং আমার মানসিকতা এই মুহুর্তে ঐক্য ও হৈমিই চলা আবেদন জানানোর জন্য প্রস্তুত।

(শ্রীসত্যোজ্জ্বল বসু: আপনি আচ্ছা যেন চীনের দোকানে হাজির।)

আসলে আমার মতো আমি মুসলিম ঐক্যের একজন আন্তরিক প্রবক্তাকেই পাবেন।

(ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি: তবে আপনাকে আর একবার ২৭ বলতে হবে, এই বা!)

হ্যাঁ, আপনি যে মুহুর্তে বলাবেন, আমিও বলাবো।

আংলো ইণ্ডিয়ানদের বস্ত্র সম্প্রদায় হিসাবে রাজনৈতিক সত্তার স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পন্থকেন্দ্র হিসাবে তাঁদের দৃষ্টি আসন নিবিশি করা হয়েছে। কিন্তু এটাই শেষ কথা নয়।

ভারতীয় প্রীতানন্ডা এই বছর কলকাতা কংগ্রেসনে কোনও প্রতিনিধি পাঠাতে পারেননি, এটা সত্য ঘটনা। কিন্তু তাঁদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য সরকারের হাতে মনোনিয়নের যে ক্ষমতা রয়েছে তা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে আমার মনে হয় বর্ণিত আনুষ্ঠানিক কেন্দ্রও প্রতিক্রিয়া আদায় দিতে পারিনি তবুও আদায় চাই এমন একটা রেওয়াজ গড়ে তুলুক যাতে কলকাতা

কংগ্রেসনে মহিলাদের অধিকতর সংখ্যা প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত হয়।

ইউরোপীয় শ্রেণীদের হয়ে আমি কিছু বলতে চাই না অথবা তারা কলকাতায় নাগরিকত্বের জন্য বা সেবাদুলক কাজকর্ম করেছেন এবং কলকাতা কংগ্রেসনে তাঁদের কর্তব্য যেভাবে সম্পন্ন করেছেন সেদেবের উল্লেখ করছি না। আমার অভিজ্ঞতায় দেখছি যে তাঁরা নিঃস্বার্থভাবে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছেন। (কংগ্রেস থেকে থেকে "ওঃ, ওঃ" গিৎকার)

আপনাবা আমার সঙ্গে একমত নাও হতে পারেন। কিন্তু মনে মনে আপনাবা ভালোই জানেন যে ইউরোপিয়ানরা এখানে যাঁরা কাজ করেছেন তাহলেই তাদের কাছা, ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যসিদ্ধি নয়। যদি ইউরোপীয় প্রতিনিধিত্বের পরিমাণ তাদের সংখ্যামত নিকর তুলনার একটু বেশি হলেও তা কংগ্রেসমানের পক্ষে ভালোই। এঁরা এমন একটা অনাসক্ত জনগোষ্ঠী যাঁরা শুধু কংগ্রেসনময় সুশাসনের জন্যই দায়িত্ব নেয় না তাঁরা অন্যান্য মানুষের বিভিন্ন কার্যের সাহায্য বিধানেরও দিকে নজর রাখেন।

(মৌলিক আবু হোসেন সরকার: সেই প্রবাদপ্রতিম বানরের মতো!)

বসে পড়ার আগে আমি শেরবাবের মতো বলতে চাই যে ডাঃ মুখার্জি বা শ্রীমসুর কঠোর হিন্দু সম্প্রদায়ের মনের অবস্থা ধরনিত হতেছে বলে আমি স্বীকার করি না। হিন্দু সম্প্রদায় আমাদের বিরুদ্ধে নয়। আমাদের বিরুদ্ধে আসেন শুধু কতিপয়....

(ডঃ বলিনাক সান্যাল: একজন হিন্দুও কি এইসব বিষয়ে আপনাদের সমর্থন করেন? ঐসব হিন্দু আসলে হিন্দুই নয়।

এখানে আপনিই একমাত্র হিন্দু। আপনাবার কি সাহস আছে বলবার যে অর্থহীন আপনাকে সমর্থন করেন?)

যেসব হিন্দু আমাদের বিরোধিতা করেছেন তাঁরা তা করেছেন বর্তমান সরকারকে কেন্দ্রে থেবার জন্য যাতে তাঁরাই কমতায় আসতে পারেন। আপনাবা দৃঢ় নিবন্ধিত্বের সাহস করছেন সকল সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে নয়। আপনাবা তা করেছেন কমতা দখল করার উদ্দেশ্যে। আচ্ছা, এজন্য আপনাবা একটা গুরুত্বপূর্ণ দরখাস্ত করেন না, আমি বিবেচনা করে দেখবো (হাস্যমেল)

পতং বসু: এখানে এমন কোন অর্থহীন নেই যিনি আপনাবার কাছে এইভাবে দরখাস্ত পঠায়েন।

সত্যোজ্জ্বল বসু: আপনি শীঘ্রই দরখাস্ত দরখাস্ত পাবেন। আমি বিনা কোর্ট কি-ডেই দরখাস্ত গ্রহণ করবো। (হাস্যমেল)

শ্যামু আমার বক্তব্য এখানেই শেষ।

পুস্তিকা
পুরাণী

শুধুমাত্র মুখপত্রই নয়, অতীত-বর্তমানের
সংযোগকারী তথ্যনির্ভর পত্রিকা

পুরাণী পত্রিকা ন্যূনতম ১০ কপি এবং বই-পুস্তিকার
ক্ষেত্রে ন্যূনতম ৫ কপি নিলেই কমিশন

বেশি কিনলে বেশি কমিশন

❀ নিঃশেষিত হবার আগে দ্রুত সংগ্রহ করুন ❀

অমর্ত্য সেন বিশেষ সংখ্যা	১৫.০০
প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিশেষ সংখ্যা	১০.০০
শত্ৰু মিত্র বিশেষ সংখ্যা	১০.০০
সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি বিশেষ সংখ্যা	১০.০০
এ কে ফজলুল হক বিশেষ সংখ্যা	১০.০০

যোগাযোগ করুন

তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ

কলিকাতা পৌরসংস্থা

১ ইগ স্ট্রিট, হগ বিল্ডিং, ৪র্থ তল

কলকাতা - ৭০০ ০৮৭

নাগরিক পরিষেবা অক্ষুন্ন রাখতে বকেয়া কর
অবিলম্বে মিটিয়ে দিন

ভুলই জীবন—এর অপচয় রোধে সক্রিয়
সহযোগিতা করুন

আবর্জনা নির্দিষ্ট স্থানে সঠিক সময়ে ফেলুন

কলকাতা আমার—আপনার। এর ঐতিহ্য
বজায় রাখার দায়িত্ব আমাদের সবারই



কলিকাতা পৌরসংস্থা